গৌরবময় ৫০ বছর

সেবা প্রকাশনী

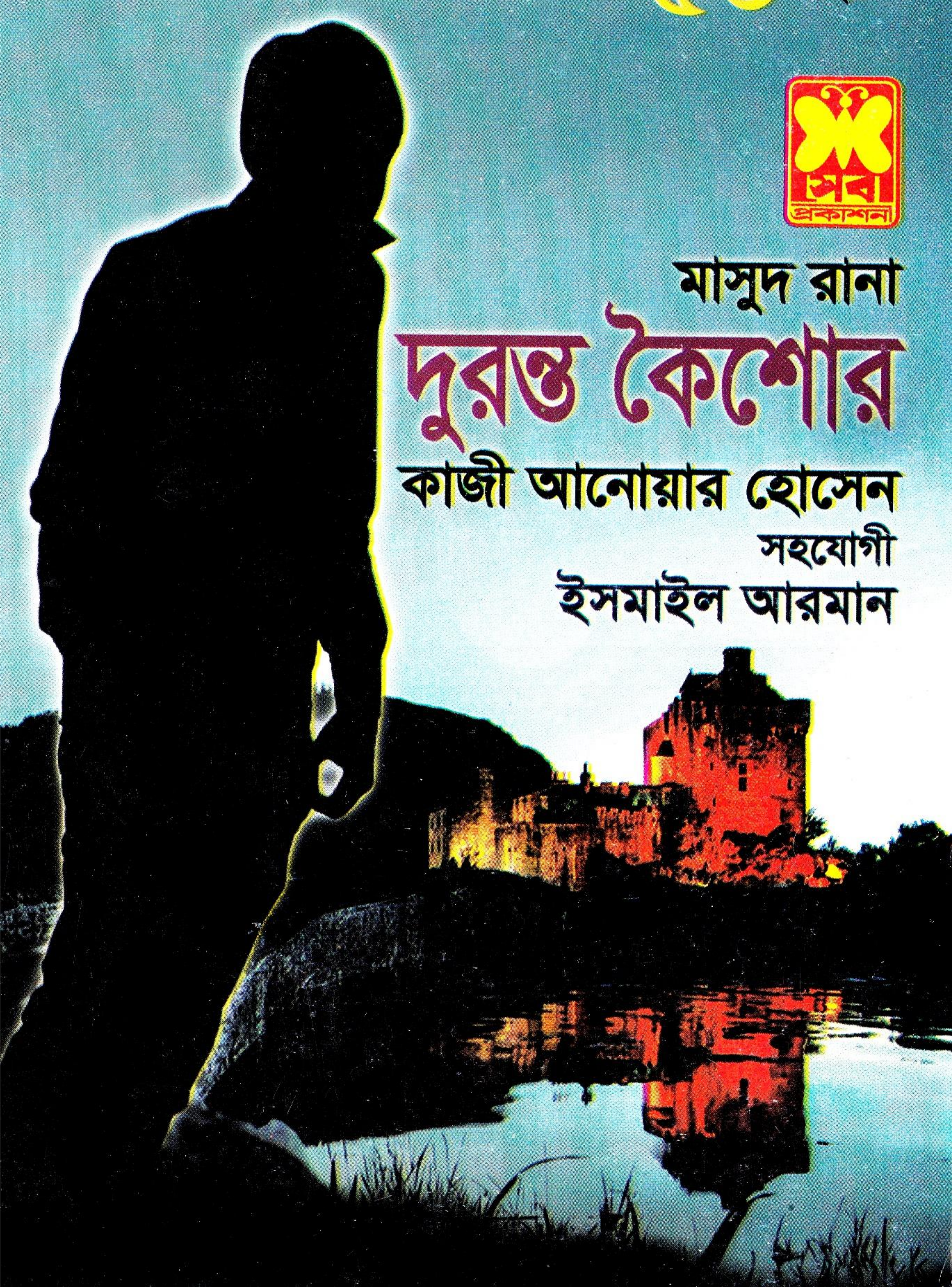
মাসুদ রানা

দুরন্ত কৈশোর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

ইসমাইল আরমান



মাসুদ রানা

দুরন্ত কৈশোর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী: ইসমাইল আরমান

লণ্ডনের এক অভিজাত ক্লাবে সমবেত হয়েছে
ভিন্ন ভিন্ন পেশার তিনজন মানুষ—দু'জন পুরুষ ও একজন নারী।
কারা এরা? এরা সবাই
আমাদের অতি-প্রিয় মাসুদ রানার ছোটবেলার বন্ধু,
আর এদেরকে জড়ো করা হয়েছে চতুর এক পরিকল্পনা
বাস্তবায়ন করবার জন্য, যার পিছনে রয়েছে
রানারই খুব কাছের দু'জন মানুষ—
সোহানা চৌধুরি ও রায়হান রশিদ।
কী চায় ওরা? ওরা জানতে চায়
রানার অজানা অতীত... ওর ছেলেবেলার কথা।
চলুন, পাঠক, আমরাও যোগ দিই সেই ষড়যন্ত্রে।
জেনে নিই রানার রোমাঞ্চকর, ভয়াল, দুরন্ত কৈশোরের কাহিনি।
সাধারণ এক কিশোরের দুর্ধর্ষ নায়কে রূপান্তরিত হবার
অসামান্য উপাখ্যান।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



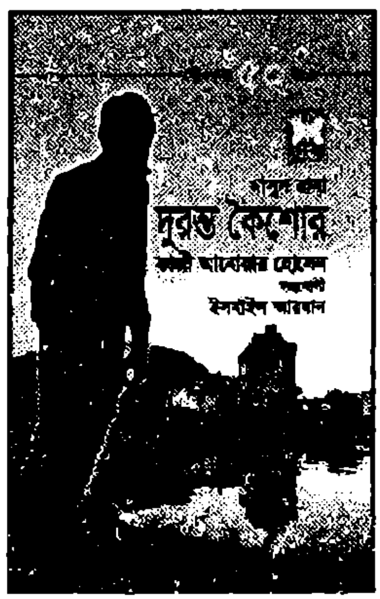
মাসুদ রানা ৪৪৭

দুরন্ত কৈশোর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

ইসমাইল আরমান



সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ISBN 984-16-7447-5

সেবা প্রকাশনী

একশ' বত্রিশ টাকা

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন ...
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪ ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial
facebook.com/rahoshya.patrika.official

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-447
DURONTO KOISHOR
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Ismail Arman

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

ভূমিকা

আবার মাসুদ রানা সিরিজের ভূমিকা লিখতে বসলাম। প্রথমবার লিখেছিলাম ধ্বংস-পাহাড় বইয়ের শুরুতে। মাঝে কেটে গেছে পঞ্চাশটি বছর। রীতিমত বিস্ময়কর একটা ব্যাপার। কারণ তখন ভাবতে পারিনি এত দীর্ঘ সময় চলবে এই সিরিজ। প্রথমটার পর দ্বিতীয় বই আদৌ লিখতে পারব কি না, পাঠক রানাকে নিয়ে আর কোনও বই চাইবেন কি না—তা-ই নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে তাঁরা যেভাবে বরণ করে নিয়েছেন রানাকে, যেভাবে ভালবাসা দিয়েছেন, তাতে লেখক হিসেবে আমি শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই জানাতে পারি।

আজ লিখতে বসে খুব মনে পড়ছে বন্ধুবর মাহবুব আমিনের কথা। তাঁর উৎসাহেই লেখা হয়েছিল রানার প্রথম বইটি। আমার লেখা কুয়াশা সিরিজের প্রথম তিনটি বই পড়তে দিয়েছিলাম তাঁকে, আমি লেখালেখি করি শুনে তিনিই চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সে-সময়ে লাহোরের আরজিএ ট্র্যানজিস্টার রেডিও কোম্পানির ঢাকা শাখার ম্যানেজার। পরদিন ফোন পেয়ে তাঁর অফিসে গেলাম। মনে আশা, খুব প্রশংসা করবেন বুঝি। কিন্তু চা খাওয়ার ফাঁকে তিনি যা বললেন তাতে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। বললেন—মন্দ না, ভালই। তবে পড়ে বোঝা যায়, আধুনিক রহস্য-সাহিত্য সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই।

আপনি জানেন না আজ কোথায় পৌঁছে গেছে বিশ্বের রহস্য-সাহিত্য। গড় গড় করে কয়েকটা নাম বলে গেলেন—এদের লেখা পড়েছেন? মাথা নাড়লাম। পড়ব কী, নামই শুনিনি কখনও।

চেহারা দেখে তিনি বুঝলেন আমার মনের অবস্থা। বললেন, কিছু মনে করবেন না। কথাগুলো আপনাকে দুঃখ দেয়ার জন্য বলিনি। নির্জলা সত্যি কথা বলেছি। না বললে নিজের কাছেই ধোঁকাবাজ, অসৎ লোক মনে হতো আমার নিজেকে। চা শেষ করে উঠছি, তিনিও উঠলেন—চলুন, আপনাকে একটা বই প্রেজেন্ট করব। ওটা পড়লেই আমার কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে আরও।

ওঁর ছোট্ট ফিয়াট সিক্স হানড্রেড গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেলেন স্টেডিয়ামের একটা বইয়ের দোকানে। আড়াই টাকা দিয়ে কিনে দিলেন তখনকার ক্রেজ ইয়ান ফ্লেমিঙের ডক্টর নো। বাসায় ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় নিয়ে গেলাম বইটা। একটানা পড়ে রাত দশটায় শেষ করলাম বই। লজ্জাই হলো। হাড়ে হাড়ে টের পেলাম মানের তারতম্য। রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যে বাঙালি লেখকেরা যে কতটা পিছিয়ে আছে, বুঝতে পারলাম। ঠিক করলাম, বাংলাতে ওই মানের থ্রিলার লিখব। শুরু হলো বিভিন্ন বিদেশি বই পড়া। কাহিনি সাজাতে মোটরসাইকেলে করে ঘুরে এলাম চট্টগ্রাম, কাপ্তাই ও রাঙামাটি। সেটা ১৯৬৫ সালের শেষদিকের কথা। এরপর কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম।

কিন্তু লিখতে গিয়ে টের পেলাম, ভাষা নেই। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র আমি। সাহিত্যের ভাষা আসে। এ-ভাষায় থ্রিল-অ্যাকশনের দৃশ্য ছবির মতো ফুটিয়ে তোলা বড়ই মুশকিল। তাই লিখছি, কাটছি, আবার লিখছি, পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলছি, আবার লিখছি। এ ধরনের লেখা বাংলা সাহিত্যে ছিল না। ভাষা ও বিষয় কোনোটিই নয়। সে জন্যই অনেক কষ্ট করতে হলো। চেষ্টা-চর্চায় তৈরি হলো

ভাষা। সেবা'র ভাষা। নায়কের নাম ঠিক করলাম আমার স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিনের সঙ্গে আলোচনা করে। গীতিকার বন্ধু মাসুদ করিমের নামের প্রথম অংশ, আর শেষ অংশ নিলাম মেবারের রাজপুত রানা প্রতাপ সিংহের কাছ থেকে; তৈরি হলো মাসুদ রানা।

একাধারে চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করে সাত মাস ধরে লিখলাম মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম বই, ধ্বংস-পাহাড়। ১৯৬৬ সালের মে মাসে বাজারে এল বইটি। প্রশংসা-সমালোচনা, নিন্দা-অভিনন্দন—সবই জুটল। তারই ফলাফল সিরিজের পরবর্তী ৪৪৬টি বই। পাঠকবৃন্দের ভালবাসাকে পাথেয় করে পঞ্চাশ বছরের অবিরাম পথচলা।

দীর্ঘ এই যাত্রায় অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে এই সিরিজ নিয়ে। পাঠকদের অকুণ্ঠ ভালবাসা যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি নিন্দুকদের নিখাদ নিন্দা। বই নিষিদ্ধ হয়েছে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য কোনও বই দ্বিতীয়বার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে লিখতে হয়েছে, মাসুদ রানার বই অবলম্বনে তৈরি হয়েছে নাটক-চলচ্চিত্র... আরও কত কী! বলে শেষ করা যাবে না। তবে ভাল-মন্দ প্রতিটি মুহূর্তে পাশে পেয়েছি আমি রানার ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের। লেখালেখিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সুহৃদ ও আপনজনদের। তাঁদেরকে শুধু ধন্যবাদ দিলে খাটো করা হয়। প্রথম বইয়ের ভূমিকায় ঠাট্টা করে লিখেছিলাম, প্রশংসা যদি কিছু জোটে, তা নিজেই নিয়ে নেব কি না। কিন্তু আজ দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করতে পারি, প্রশংসার দাবিদার আমি নই—তাঁরা সবাই।

সবশেষে হাতের বইটি নিয়ে দুটি কথা বলতে চাই। 'দুরন্ত কৈশোর' রানার ছেলেবেলার কাহিনি। সিরিজের এ-পর্যায়ে এসে হঠাৎ কেন রানার অতীত নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হলো, তার একটা

ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। এক হিসেবে এটাকে পাঠকচাহিদার ফসল বলা যেতে পারে। গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন বইয়ে রানার অতীত সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা দেয়া হলেও কখনও পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রয়ে গেছে অস্পষ্টতা, এবং বিপরীতমুখী তথ্য। রানার পুরো নাম, জন্মতারিখ, পারিবারিক বিবরণ, ইত্যাদি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে পাঠকদের মাঝে। বহুবার তাঁরা অনুরোধ করেছেন রানার অতীত নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি সূচনা-কাহিনি উপহার দেবার জন্য। দেরিতে হলেও সেটি এবার করা গেল।

তবে লিখতে বসে যে-সমস্যাটি লক্ষ করলাম, তা হলো সময়কাল নিয়ে। চিরতরুণ রানার কৈশোরকে কোনও নির্দিষ্ট সালে আবদ্ধ করা মুশকিল। সেটা এড়াবার জন্যই বিদেশি পটভূমিতে, এবং সময়কাল উহ্য রেখে রচনা করা হয়েছে এই কাহিনি। এমনভাবে লেখা হয়েছে, যাতে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে যে-কোনও টাইমফ্রেমেই মানিয়ে যায় কাহিনি।

আশা করি 'দুরন্ত কৈশোর' রানা পাঠকদের অতীত বিষয়ক অনেক কৌতূহলই মেটাতে পারবে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এই আনন্দঘন মুহূর্তে সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ।

৭ মে, ২০১৬।
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রারম্ভ

এপ্রিল মাস।

পাশ্চাত্যের মধ্য-বসন্ত, বছরের শ্রেষ্ঠ সময়; রূপ-রঙ মেলে ধরে মনোলোভা হয়ে উঠেছে লণ্ডন শহর। কচি সবুজ পাতায় সেজেছে গাছগাছালি, লাল-নীল-সোনালি-হলুদ ফুলে ঢাকা পড়েছে উদ্যান, যেন বসন্তদেবীর ফুলশয্যার আয়োজন। মেয়েরা তাদের শীতের ভারী কাপড়চোপড়ের সঙ্গেবিদায় দিয়েছে জড়তা; হাঁটাচলায় ফিরে এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য।

দুপুর সাড়ে বারোটা। পার্ক লেনে এসে থামল একটি ট্যাক্সিক্যাব। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এল সুঠামদেহী, দীর্ঘকায়, ঋজু এক যুবক—দেখতে ভারি সুদর্শন। পরনে কড়া ইস্তিরি দেয়া ধূসররঙা সুট, সাদা শার্ট, সিল্কের টাই—পায়ে চকচকে কালো অক্সফোর্ড শু। চোখ থেকে সানগ্লাস নামিয়ে বুক ভরে টেনে নিল বসন্তের তাজা বাতাস, তারপর বলিষ্ঠ পায়ে হাঁটতে শুরু করল পার্ক স্ট্রিট ধরে। গন্তব্য, ঐতিহ্যবাহী লণ্ডন ক্লাব।

সুইং ডোর ঠেলে পোর্টার'স লজে উঠে এল যুবক। শিখ ডোরম্যান, বুড়ো রঘুবীর সিং, দেখেই চিনতে পারল তাকে। স্মিত হেসে জানাল সম্ভাষণ, 'গুড আফটারনুন, মিস্টার রানা।'

পাল্টা হাসল মাসুদ রানা। 'গুড আফটারনুন, সিং। কেমন

আছেন আপনি?'

'ভাল, স্যর। অনেকদিন পরে এলেন।'

'হুঁ। ব্যস্ত থাকি, সুযোগ পেলেই চলে আসি। আজ অবশ্য আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে লাঞ্চ করার কথা। মিস সোহানা চৌধুরি।'

'জানি, স্যর। প্রাইভেট রুম বুক করেছেন মিস চৌধুরি। এখনও পৌঁছাননি। আপনি এলে ওখানে অপেক্ষা করতে মেসেজ দিয়ে রেখেছেন।'

'প্রাইভেট রুম?' একটু অবাক হলো রানা। লাঞ্চটা ডাইনিং রুমেই করা যেত, আলাদা রুম বুক করার প্রয়োজন ছিল না। কাঁধ ঝাঁকাল, সোহানা হয়তো একান্তে কিছু বলতে চায়। সিংকে জিজ্ঞেস করল, 'কত নম্বর রুম?'

'তিনশো পাঁচ। পেজ বয় আপনাকে নিয়ে যাবে, স্যর।'

ডোরম্যানের ইশারা পেয়ে এগিয়ে এল এক তরুণ পেজ বয়, রানাকে পথ দেখাল সে।

পেশায় রানা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন প্রথম সারির এজেন্ট, তবে বাইরের পৃথিবী ওকে চেনে বিশ্ববিখ্যাত *রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি*-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে। এজেন্সিটা আসলে বিসিআই-এরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের পরামর্শে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই এই এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। বিসিআই-এর কাজ করার ফাঁকে সুযোগ পেলেই এজেন্সির শাখা অফিসগুলো ভিজিট করে রানা, এবার এসেছে যেমন লণ্ডন শাখায়।

লণ্ডনে আজ ওর পঞ্চম দিন। এজেন্সির লণ্ডন শাখার ভিজিট শেষে গতকালই প্যারিস শাখায় যাবে ভেবেছিল, পরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে সোহানার অনুরোধে। অন্য এক কাজে বিসিআই-এর আই.টি. স্পেশালিস্ট রায়হান রশিদকে নিয়ে লণ্ডনে এসেছে ও, আজ লাঞ্চ করতে চেয়েছে রানার সঙ্গে। অনুরোধটা ফেলতে পারেনি ও। কাজের ব্যস্ততায় কয়েক মাস হলো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি ওদের, একসঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে ভালই লাগবে।

চওড়া সিঁড়ির ধাপ টপকে তিনতলায় উঠল রানা, লাউঞ্জ হয়ে এক কোণের প্রাইভেট এরিয়ায় পৌঁছুল। নির্দিষ্ট দরজা দেখিয়ে দিল পেজ বয়, তার হাতে কড়কড়ে পাঁচ পাউণ্ডের নোট গুঁজে বিদায় জানাল রানা। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

মাঝারি আকারের কামরা। পায়ের নিচে দামি গালিচা, জানালার মখমলের বেগুনি পর্দা মেঝে ছুঁয়েছে। দেয়ালের বাকি অংশ ঢাকা পড়েছে কারুকাজ করা কাঠের প্যানেলে। সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি। ঠিক মাঝখানটায় বড় একটা গোলটেবিল। ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। অচেনা তিনজন মানুষ বসে আছে ওখানে—দু'জন পুরুষ, একজন নারী।

অপ্রস্তুত বোধ করল রানা, পেজ বয় নির্ঘাত ভুল কামরা দেখিয়ে দিয়ে গেছে ওকে। নক না করে ঢুকেছে বলে বিব্রত হলো।

'সরি, আমি বোধহয় ভুল কামরায় ঢুকেছি। মাফ করবেন।'

উল্টো ঘুরতে গেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে উঠল একজন। 'রানা না? আরে, আরে, যাও কোথায়?'

বিস্মিত চোখে মানুষটার দিকে তাকাল রানা। চিনা এক যুবক—শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলছে খুব পরিচিত ভঙ্গিতে। তাকে চিনতে পেরে চোখ বড় হয়ে গেল ওর।

'হায়, খোদা! মিং হুলিয়াং... তুমিই তো, নাকি?'

'যাক, চিনতে পেরেছ তা হলে,' হাসল চিনা যুবক।

'আমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে, দোস্ত?' এবার কথা বলল দ্বিতীয় যুবক। শ্বেতাঙ্গ, মাথাভর্তি লাল চুল তার। পাশে বসা সুন্দরী যুবতীও অভিযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, তার চোখদুটো পান্নার মত গাঢ় সবুজ।

দু'জনকেই চিনতে পারল রানা। 'রেড রাইলি! পেনিলোপি ম্যাকিনটশ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। 'কী আশ্চর্য, তোমরা হঠাৎ কোত্থেকে?'

'শুনেছ পাগলটার কথা?' চেয়ার ছেড়ে উঠে এল রেড। 'নিমন্ত্রণ দিয়ে নিজেই ভুলে বসে আছে।'

'কীসের নিমন্ত্রণ?' রানা বিভ্রান্ত।

'আগে বুকে এসো, তারপর বলছি।' রানাকে জাপটে ধরল রেড।

তার আলিঙ্গনে হাঁসফাঁস করে উঠল ও। 'আরে, ছাড়ো, ছাড়ো! মেরে ফেলবে নাকি?'

হেসে ওকে মুক্তি দিল রেড। মিং আর পেনিও এসে সংক্ষিপ্ত আলিঙ্গন করল ওকে।

'সো নাইস টু সি ইউ, রানা,' বলল পেনি। 'কতদিন পর দেখা! খুশি হওনি আমাদেরকে দেখে?'

'অবশ্যই,' রানা বলল। বিস্ময় কাটছে না ওর। 'কিন্তু তোমরা একসঙ্গে এখানে... আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কাম অন, রানা!' বলল মিং। 'সব ভুলে বসে আছ? আজ কত তারিখ?'

'নয়...' বলতে বলতে থেমে গেল রানা। এপ্রিলের ন'তারিখ—ওর জন্মদিন! কাজের চাপে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। তা ছাড়া দিনটা কোনোদিন পালনও করে না ও। আলাদাভাবে

মনে রাখার প্রয়োজন পড়ে না তাই। 'তোমরা আমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে এসেছ?'

'নয়তো কেন?' রেড বলল। 'সরি, তুমি ঢোকামাত্র সারপ্রাইজ বলে চেঁচিয়ে ওঠা উচিত ছিল বোধহয়। কিন্তু অর্গানাইজারদের কাউকে দেখলাম না—তুমি কখন আসবে না-আসবে, কিছুই বলা হয়নি। তা ছাড়া ভেবেছিলাম আরও গেস্ট থাকবে।'

'থাক, এমনিতেই যথেষ্ট সারপ্রাইজড হয়েছি,' রানা হাত তুলল। 'কিন্তু... কে খবর দিয়েছে তোমাদেরকে?'

'কথা হয়নি কারও সঙ্গে। শুধু কার্ড পেয়েছি। এই তো।'

রানার হাতে একটা ইনভাইটেশন কার্ড দিল রেড। তাতে বড় করে লেখা:

মাসুদ রানার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সাদর আমন্ত্রণ।
তারিখ: ৯ এপ্রিল।
স্থান: লণ্ডন ক্লাব।
সময়: দুপুর সোয়া বারোটা।
আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

'এটা আমি পাঠাইনি,' রানা বলল। 'আমি কিছু জানিই না এর ব্যাপারে।'

'কে পাঠাল তা হলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মিং।

চাপা গলার হাসি ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে। কামরার দু'দিকের জানালার পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল সোহানা আর রায়হান। হাসছে দু'জনেই।

সোহানা বলল, 'যাক, এতক্ষণ কষ্ট করে লুকিয়ে থাকা সার্থক।'

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকাল রানা। 'কখন এলে তোমরা?

রঘুবীর সিং যে বলল...'

'ও এখন আমাদের দলে কাজ করছে, রানা,' বলল সোহানা। 'তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে।'

'তারমানে এসব তোমাদের কাণ্ড?'

'আর কার? মনে আছে, জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে চাও না দেখে গত বছরই তোমাকে বলেছিলাম, এমন এক অনুষ্ঠান করব, যা সারাজীবন মনে থাকবে? এই দেখো, হাজির করেছি তোমার ছোটবেলার বন্ধুদের। ফলল তো আমার কথা?'

এবার রানাও হাসল। 'হ্যাঁ, ফলেছে। কিন্তু ওদেরকে খুঁজে পেলে কী করে? ওদের বর্তমান ঠিকানা তো আমিও জানি না ঠিকমত।'

'সেক্ষেত্রে ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন হয়ে যাক,' হাত বাড়িয়ে দিল রেড। 'হ্যালো, আমি রব রাইলি—স্টকব্রোকার।'

হেসে হাত মেলাল রানা। 'লাইন তা হলে বদলাওনি? পকেটই কাটছ লোকের... একটু ভদ্রভাবে এই আর কী।'

'হা হা হা! বেড়ে বলেছ, দোস্ত।'

'বিয়ে-টিয়ে করেছ? নাকি এখনও ব্যাচেলর?'

'তুমি না করলে আমি কী করে করি, দোস্ত? পেনিও তো চান্স দিল না। আরেকজনকে বিয়ে করে বসে আছে।'

'সত্যি?' পেনির দিকে তাকাল রানা।

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে বলল পেনি। 'দুটো বাচ্চাও আছে আমার।'

'বলো কী!' রানা অবাক। 'তা হলে তোমার ঘোড়ার নেশা?'

'সবই চলছে, রানা। শুনে সুখি হবে, লণ্ডন ডার্বির বিখ্যাত দুটো ঘোড়ার মালিক আমি। ঘোড়ার খামারও চালাই, হর্স-ব্রিডিং করি সব আমি নিজের চেষ্টায় গড়ে নিয়েছি।'

'ব্রাভো!' প্রশংসা করল রানা। এবার তাকাল শেষ বন্ধুটির দিকে। 'তুমি কি এখনও আই.টি. ফার্ম চালাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' মিং মাথা ঝাঁকাল। 'তবে অন্যান্য রিলেটেড ফিল্ডেও এক্সপ্যাণ্ড করেছি। লণ্ডনেই আমার হেড অফিস। বিয়েও করেছি কিছুদিন আগে। ছানাপোনা হয়নি এখনও।'

'খুব ভাল লাগল তোমাদের খবর জেনে,' রানা বলল। 'আমারটা শুনবে?'

'তার প্রয়োজন নেই,' রেড বলল। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর, দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চারার মাসুদ রানার খবর আমরা সবাই জানি। তুমি আমাদের খোঁজ না রাখতে পারো, কিন্তু আমরা ঠিকই রাখি।'

লজ্জিত হাসি হাসল রানা। 'সরি। আসলে সময়-সুযোগের অভাবে...'

'থাক, থাক, অত বিব্রত হতে হবে না,' ওকে বাঁচাল পেনি। 'এমনটা হতেই পারে।' সোহানা আর রায়হানের দিকে ইশারা করল। 'ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করাবে না?'

'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এরা হলো সোহানা চৌধুরি আর রায়হান রশিদ। আমার কলিগ।'

এগিয়ে এসে সবার সঙ্গে হাত মেলাল সোহানা আর রায়হান।

'একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার হলো না,' বলল মিং। 'আমাদের সঙ্গে রানার কানেকশন আপনারা খুঁজে পেয়েছেন কী করে?'

'নিছক কৌতূহল থেকে,' ব্যাখ্যা করল রায়হান। 'মাসুদ ভাই ছোটবেলায় কেমন ছিলেন, সেটা জানার খুব ইচ্ছে আমাদের। অথচ সে ব্যাপারে কখনও কিছু বলেন না উনি, জিজ্ঞেস করলেও মুখে কুলুপ এঁটে রাখেন। তাই নিজেরাই মাঠে নামলাম। ওঁর ডোশিয়ে ঘেঁটে বের করেছি ছেলেবেলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধুর নাম... মানে, আপনারা। আর আজকালকার যুগে নাম জানা থাকলে আর মানুষ খুঁজে পাওয়া কী এমন কঠিন! সৌভাগ্যক্রমে

সবাই দেখলাম লণ্ডনেইথাকেন। তাই কৌশলে এমনভাবে মাসুদ ভাইয়ের শিডিউল সাজিয়ে দিয়েছি, যাতে জন্মদিনে এখানেই থাকেন তিনি। তারপর নিজেরাও চলে এসেছি কাজের বাহানায়, কার্ড পাঠিয়েছি আপনাদের।'

'এ দেখি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র,' বলল রানা। 'আমার শিডিউল ম্যানিপুলেট করেছ তুমি, রায়হান? দাঁড়াও, ঢাকায় ফিরে নিই। শাস্তি হবে তোমার। পোলার কণ্ডিশনের ট্রেনিং তো বোধহয় এখনও নাওনি। আগামী ব্যাচের সঙ্গেই যদি না পাঠিয়েছি...'

হাত জোড় করল রায়হান। 'মাফ করে দিন, গুরু। মরে যাব... নির্ঘাত মরে যাব!'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে হেসে উঠল সবাই।

দরজায় টোকা পড়ল। ট্রলি নিয়ে কামরায় ঢুকল কয়েকজন বেয়ারা। বার্থ ডে কেক, সেই সঙ্গে বিভিন্ন রকম খাবারদাবার নিয়ে এসেছে।

'আগে কেক কাটা হোক,' রেড বলল। 'তারপর জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে।'

তা-ই হলো। হাততালি আর সরু-মোটা গলায় বার্থ ডে সং-এর মাঝে কেক কাটল রানা। এরপর প্লেটে খাবার নিয়ে টেবিলে বসল সবাই।

'যে-কারণে একত্র হয়েছি,' সোহানা বলল, 'সেটা শুরু করা যাক। কী বলেন আপনারা?'

'রানা ছেলেবেলায় কেমন ছিল, ওটাই জানতে চান তো?' বলল পেনি। 'লাজুক, বোকা, অথচ...'

'না, না, ওভাবে না,' বাধা দিল রায়হান। 'গল্পের মত শুনতে চাই সব। কীভাবে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কী কী করেছিলেন আপনারা... আর ইয়ে, বিশেষ একটা ঘটনার কথাও শুনতে চাই।'

'কী ঘটনা?' ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করল রানা।

'ডোশিয়ের একটা অংশ অস্পষ্ট। ওখানে বলা হয়েছে, ছোটবেলায় কোনও একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আপনারা, ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে তার কোনও রেকর্ড রাখা হচ্ছে না ফাইলে। কী সেই ঘটনা? কেন তার রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা ও তার বন্ধুরা। হঠাৎ করেই গম্ভীর হয়ে গেছে সবাই।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'ব্যাপারটা কি খুব খারাপ কিছু?'

জবাব দিল না কেউ।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পেনি বলল, 'কী করতে চাও, রানা? সব খুলে বলবে ওদেরকে?'

'না বলাই বোধহয় ভাল,' মন্তব্য করল রেড। 'সরকার ধামাচাপা দিয়েছে বলে কথাটা বলছি না। রানার মঙ্গলের জন্যই পুরনো ক্ষত খোঁচাখুঁচি করা উচিত হবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রেড। তবে এতদিন পর আর ওসব গোপন রাখার প্রয়োজন নেই। আর ক্ষত... সে যদি খুঁচিয়ে না-ই দেখলাম তো বুঝব কী করে শুকিয়েছে কি না। তা ছাড়া অমন ক্ষত আরও কতই তো রয়েছে মানুষের জীবনে। একটাকে ঢেকে লাভ নেই, আরও দশটা মুখিয়ে থাকবে। তারচেয়ে শুনতে যখন চাইছে, শুনুক। এত আয়োজন করে আমাদের সবাইকে একত্র করেছে ওরা... তার একটা প্রতিদান তো ওদের পাওনা হয়েছে, নাকি?'

'তা হলে খুলে বলব সব?'

'অসুবিধে কী? সে-সময়টায় দুঃখ-কষ্ট যেমন ছিল, আনন্দও তো করেছি আমরা। আমাদের সবার জীবনের এক স্বর্ণালী সময় ছিল কৈশোরের ওই দিনগুলি। নাহয় স্মৃতিচারণ বলেই ভেবে

নিই। কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে যাই অতীতে।'

'ঠিক আছে, দোস্ত,' মাথা ঝাঁকাল রেড। 'যুক্তি আছে তোমার কথায়। কে শুরু করবে? তুমি, না আমি?'

'উঁহুঁ, মিং করবে,' রানা ভিন্নমত জানাল। 'শুরুটা একটু পিছন থেকে হোক। মূল ঘটনা শোনার আগে কীভাবে গ্রিফিনদের সঙ্গে শত্রুতার সূত্রপাত হয়েছিল, সেটা জানা জরুরি। মিং, শুরু করো।'

গলা খাঁকারি দিয়ে গল্পের সূচনা করল চিনা যুবক। একটু পরেই তাতে যোগ দিল রানা, রেড আর পেনি। ভাগাভাগি করে অদ্ভুত, প্রায়-অবিশ্বাস্য এক কাহিনি শোনাল ওরা সোহানা আর রায়হানকে।

পাঠকদের জন্য সে-কাহিনিই এবার উপস্থাপন করা হচ্ছে কিছুটা সাজিয়ে-গুছিয়ে।

এক

সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে ছেলেটি, সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। ওর সামনে মাথা তুলে রেখেছে কাঁটাতারের উঁচু এক ফেন্স, তার গায়ে ঝুলছে একটি সাইনবোর্ড। তাতে বড় বড় হরফে লেখা:

প্রবেশ নিষেধ!
ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তি!
অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করা হবে!

সাইনবোর্ডের দু'পাশে... যেন সতর্কবাণীর গুরুত্ব বাড়াবার জন্য... ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা মৃত প্রাণীর লাশ। সবক'টার ঘাড় ভাঙা, গলায় পিয়ানো বা গিটারের সরু তার বেঁধে ঝোলানো হয়েছে ফেন্সের মাথা থেকে।

প্রতিটা লাশই ছেলেটির চেনা, বহুবার দেখায় গেঁথে গেছে মগজে। চোখ উপড়ানো কতগুলো খরগোশ, ডানাভাঙা কয়েকটা কাক, গোটাদুই শেয়াল, কিছু ধেড়ে ইঁদুর, একটা বনবিড়াল আর একটা ভোঁদড়। এখানে নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে ওর চোখের সামনেই ধীরে ধীরে পচছে লাশগুলো... ওর সামনেই ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে শুকনো চামড়া বা পালকে মোড়া কঙ্কালে। আজ

আবার নতুন দুটো লাশ যুক্ত হয়েছে—একটা কাঠবিড়ালি আর একটা শেয়াল।

তারমানে গতকাল ও চলে যাবার পর এরা ঢুকেছিল ভেতরে!

ধূসর রঙের ভারী পোচার'স জ্যাকেট আর সুতি ট্রাউজার পরেছে ছেলেটি, ক্যামোফ্লাজ হিসেবে চমৎকার, তবু সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল। পনেরো ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া আর জ্বলজ্বল করতে থাকা সতর্কবাণীই মানুষজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে যথেষ্ট, তারপরেও রাখা হয়েছে প্রহরী। একাধিকবার শটগানহাতে দু'জন লোককে পেরিমিটারে টহল দিতে দেখেছে ও। গত কয়েকদিনে তাদের আর দেখা না মিললেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, নতুন লাশগুলো জানিয়ে দিচ্ছে—প্রহরীরা কাছেপিঠেই আছে।

তবে এ-মুহূর্তে ও সম্পূর্ণ একা।

বিকেলের রোদ মরে গিয়ে নেমে আসছে সন্ধ্যা। হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির খুঁটিনাটি, ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আঁধারের চাদরে। ফেন্সের এপাশে, জুনিপারের ঘন ঝোপ আর নিচু রোয়ান গাছের আড়ালে বেশ ভালভাবে গা ঢাকা দিতে পারছে ও; কিন্তু একটু পরেই বেড়ার তলা দিয়ে ওপাশে যাবার ইচ্ছে—সেখানে তেমন কোনও আড়াল নেই। ঘাসে ঢাকা ঢালু জমি দেখতে পাচ্ছে ছেলেটি, মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটবড় পাথর, নেমে গেছে হ্রদের ঘোলা পানির দিকে।

খুব শীঘ্রি ওই পানিতে মাছ ধরবে ও। এই প্রথমবার।

এখান পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা। চারটেয় ছুটি হয়েছে স্কুল, লাঞ্চের পর থেকে কিছুই খায়নি, খিদে পেয়েছে। ফেন্সের ওপারে যাবার পর খাওয়াদাওয়ার সময় মিলবে না, তাই কাঁধ থেকে ন্যাপস্যাক নামিয়ে বের করে আনল হ্যাম স্যাণ্ডউইচ আর একটা আপেল। দ্রুত খেয়ে নিল। চোখ পড়ল

হ্রদের ওপাশে দৈত্যের মত দাঁড়ানো পাহাড়ের উপর। কেমন যেন রুক্ষ, প্রাণহীন চেহারা ওটার। কতশত বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে, থাকবেও আরও শত শত বছর। ভীমদর্শন পাহাড়ের সামনে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র ও সামান্য মনে হলো ছেলেটির, অনুভব করল নিঃসঙ্গতা। বাতাসে হঠাৎ কেঁপে উঠল ফেন্সের কাঁটাতার, মৃদু আওয়াজ তুলল, আর তা শুনে কাঁপ ধরল ওর বুকের ভেতর। যেন গুঙিয়ে উঠেছে বেড়াটা, বারণ করছে ওর নিজ ভাষায়।

নতুন মালিক আসার আগে এখানে কোনও বেড়া ছিল না। জঙ্গল-প্রান্তর-হ্রদ... সব ছিল অবারিত। হ্রদের পানিতে সারা বছরই মাছ পাওয়া যায়, যার যখন খুশি ধরতে পারত বিনা বাধায়। পুরনো মালিক মোটেই মাথা ঘামাত না এ-নিয়ে। গ্রাম থেকে এতদূরে কষ্ট করে এসে কেউ যদি কিছু মাছ ধরে তো ধরুক না! এমন তো নয় যে, হ্রদে মাছের অভাব পড়তে চলেছে তার ফলে।

সবকিছু বদলে গেল মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে। সেটা পাঁচ বছর আগেকার কথা। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হলো কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। স্থানীয় লোকেরা হারাল হ্রদ ও তার আশপাশে পা রাখবার অধিকার। কাউকে দেখতে পেলেই দূর দূর করে তাড়ায় প্রহরীরা।

আজ তার ব্যতিক্রম ঘটতে চলেছে, মুচকি হেসে ভাবল ছেলেটি।

খাবারের উচ্ছিষ্ট ঝোপের মাঝে ছুঁড়ে ফেলল ও। ন্যাপস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ফেন্সের দিকে। একদম গোড়ায় পৌঁছে থামল। ফেন্সের তলায় একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে কয়েকদিনের চেষ্টায়, সেটার মুখ থেকে সরাল মরা ডালপাতা।

এখানকার মাটি বেশ শক্ত, বেশ কষ্টই হয়েছে গর্তটা খুঁড়তে।

খালি হাতে সম্ভব ছিল না, ব্যবহার করেছে বাড়ি থেকে আনা শাবল আর গাঁইতি। তারপরেও সময় লেগে গেছে বেশ কয়েকদিন। কাজটা শেষ হয়েছে গতকাল রাতে। বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, তখন আর ওপাশে যাবার সময় ছিল না, তাই গর্তের মুখ ঢেকে ফিরে গিয়েছিল বাড়িতে।

আজ সারাদিন কেটেছে দারুণ উত্তেজনায়। স্কুলে মন বসাতে পারেনি একদমই। সারাক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল এখানে আসার চিন্তা—হ্রদে হানা দিয়ে নতুন মালিকের নাকের ডগা থেকে মাছ চুরি করে আনবে। রোমাঞ্চে কাঁপছিল শরীর।

ন্যাপস্যাক ছাড়াও ছোট্ট আরেকটা ব্যাগ আছে ওর সঙ্গে—ওটায় এনেছে বড়শি আর টোপ। দুটোই গর্ত দিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সমস্যা হলো বাবার ছিপটা নিয়ে, বেশ লম্বা। বাঁকা গর্তে ঢুকবে না। কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে ওপাশে চালান করে দিল জিনিসটা, তারপর নেমে পড়ল গর্তে। উল্টোপাশের ডালপালা সরিয়ে চুপিসারে চলে এল ভেতরে।

নিথর হয়ে কয়েক মিনিট মাটিতে শুয়ে থাকল ছেলেটি, ওর অনুপ্রবেশ টের পেয়ে কেউ ছুটে আসে কি না দেখতে চায়। তেমন কিছু না ঘটায় উঠে দাঁড়াল। পিঠে ন্যাপস্যাক, দু'হাতে ব্যাগ আর ছিপ নিয়ে চপল পায়ে ছুটতে শুরু করল হ্রদের দিকে।

বাবার মুখে সিলভারব্যাক লেকের গল্প বহুবার শুনেছে ও। ছেলেবেলায় ওখানে মাছ ধরা ছিল তাঁর নেশা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিজের ছেলেকে সে-আনন্দের ভাগীদার করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। সেনাবাহিনীতে ছিলেন, শেল বিস্ফোরণে মারাত্মক আহত হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ। সুস্থ আর হতে পারেননি, বরং দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন বিছানায়। ছেলেকে নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়া আর হয়নি তাঁর।

বাবার কথা মনে পড়তেই চোয়াল শক্ত হলো ছেলেটির। আজকের এই দুঃসাহসিক অভিযানের পিছনে বাবার স্মৃতির ভূমিকা আছে অনেক। তাঁরই ছিপ দিয়ে... তাঁরই প্রিয় জায়গায় মাছ ধরবে ও। এক গাদা মাছ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরবে, মায়ের চেহারা কেমন হবে, ভাবতেই খুশির ঢেউ অনুভব করল হৃদয়ে। তা ছাড়া কাজটা রোমাঞ্চকর... আর ও রোমাঞ্চপ্রিয় এক কিশোর।

সিলভারব্যাক লেকের আকৃতি ঠিক যেন বিশাল এক মাছ। লম্বাটে, একটা প্রান্ত সরু, অন্য প্রান্ত মাছের লেজের মত বিভক্ত হয়ে দু'দিকে ছড়িয়ে গেছে। স্কটিশ লোক-কাহিনির এক দানবীয় মাছ—*ইটেরেয়াজিড*-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে হ্রদটার, যার আক্ষরিক অর্থ রূপালি পিঠ। মাছটার দেহ রূপালি রঙের ছিল। জাতে স্যামন হলেও সিলভারব্যাক ছিল বিশাল ও ভয়ঙ্কর; শক্তির দিক থেকে আর কোনও প্রাণী ছিল না এর ধারেকাছে। গল্পে আছে, *ক্যাশরুইড* নামে এক দৈত্য গিয়েছিল মাছটাকে ধরতে; টানা বিশদিনের তুমুল লড়াইয়ের পর দৈত্যকে গিলে নেয় সিলভারব্যাক, এক বছর পর উগরে দিয়ে আসে আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে।

লোক-কাহিনির সেই মাছ আজও সিলভারব্যাক লেকে বাস করে বলে গল্প প্রচলিত আছে, হ্রদের গভীরেই নাকি তার আস্তানা। ছেলেটি সেটা বিশ্বাস করে না। বড় মাছ যদি কিছু থেকেই থাকে, তারনাম বিভিন্ন প্রজাতির স্যামন, ট্রাউট, আর ঈল... যেগুলোকে ধরা যায়, রান্না করে খাওয়া যায়!

যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেক বড় লেকটা। পাহাড়ের তলার তীরটুকু বড় বড় পাথরে ছাওয়া, খরস্রোতা অংশ খুব কম। দূরে, যেখানটায় মাছের চোখ হবার কথা, সেখানে রয়েছে ছোট একটা দ্বীপ। কুয়াশায় ঢাকা। তার মাঝে আবছাভাবে ফুটে আছে একটা দুর্গের কাঠামো—এলাকার মালিকের বাসস্থান। এতদূর

থেকে দুর্গটাকে ও-ই ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না, ওখান থেকে কারও পক্ষে ওকে দেখতে পাওয়া তো প্রায় অসম্ভবই।

হ্রদের তীরে হাঁটতে শুরু করল ছেলেটি, ছিপ ফেলে বসবার জন্য ভাল একটা জায়গা খুঁজে নেবার ইচ্ছে। কাছাকাছি কোনও জায়গা পছন্দ হলো না। হ্রদের তীর একেবারে উন্মুক্ত, প্রহরীরা এদিকে তাকালে দূর থেকেই দেখতে পাবে ওকে।

প্রহরীদের কথা মনে পড়তেই নার্ভাস চোখে আশপাশ দেখে নিল ও। ভয় ভয় করছে। ওরা স্থানীয় লোক নয়, এখানকার মানুষদের সঙ্গেও মেশে না। থাকে সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়—দুর্গের গেটহাউসের পিছনে কংক্রিট শেডে। জমির মালিক দুর্গটাকে সামরিক স্থাপনার মত দুর্ভেদ্য করে তুলেছে, রুক্ষ-নির্দয় লোক দিয়ে বানিয়েছে নিজের বিশেষ বাহিনী। তাদের কারও সঙ্গে মোলাকাতের ইচ্ছে নেই ওর।

হাঁটতে হাঁটতে খানিক পর যখন হাল ছেড়ে দেবে ভাবছে, ঠিক তখুনি চোখে পড়ল মাছ ধরবার জন্যে নিখুঁত একটা স্পট। জায়গাটা লেকের লেজের কাছে, ওখান দিয়ে ঝরনার পানি ঢুকছে হ্রদে। দু'পাশ থেকে ওখানটা ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের উঁচু প্রাচীর। তা ছাড়া ঝরনার মুখে ট্রাউট মাছ ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় খাবারের খোঁজে—জানা আছে ছেলেটির। তীর থেকে আনুমানিক বিশ ফুট দূরে, পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে একটা বড়সড় গ্র্যানিট পাথর। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে অনায়াসে ছিপ ফেলতে পারবে, দূর থেকে দেখা যাবে না ওকে।

ঘাসে বসে দ্রুত ওয়াটারপ্রুফ ওয়েডার্স পরে নিল ও। ভারী জিনিসটা বয়ে আনতে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু শরীর ভেজাতে না চাইলে এর বিকল্প নেই। পা থেকে বুক পর্যন্ত ঢাকা পড়ল ওয়েডার্সে। কাঁধের উপর দিয়ে স্ট্র্যাপ টেনে আটকে নিল। পুরনো রাবারের গন্ধ আসছে পোশাকটা থেকে। বাবার ছিল এটা।

ছিপের সঙ্গে রিল লাগিয়ে নিল ছেলেটি, লুপের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেল লাইন। ফ্লাই লাইন সেট করা হয়ে গেলে ব্যাগ থেকে বের করল পছন্দসই একটা আর্টিফিশিয়াল টোপ—রূপালি রঙের; ওটাকে বেঁধে ফেলল লাইনের ডগায়। এরপর ছিপ হাতে এগোল পানির দিকে।

পাথরটার মুখোমুখি গিয়ে পানিতে নামল ও, ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল। হ্রদের তলদেশ পিচ্ছিল, আলগা নুড়িও আছে প্রচুর... পা হড়কালে ভিজে একসা হতে হবে। খুব সাবধানে এগোল। সরাসরি এগোনো গেল না, একটা জায়গা বেশ গভীর, হয়তো নিচে গর্ত-টর্ত আছে, তাই একটু ঘুরপথে হাঁটতে হলো। সব মিলিয়ে কয়েক মিনিট লেগে গেল পাথরের কাছে পৌঁছুতে।

পাথরের পাশে পৌঁছে মোটামুটি সমতল একটা জায়গা বেছে নিল ও। পানি এখানে হাঁটুসমান গভীর। সময় নিয়ে জরিপ করল ঝরনার স্রোত, রিল থেকে ছাড়ল বেশ খানিকটা সুতো; এক মুহূর্ত পর ছিপটা পিছনে নিয়ে এক ঝটকায় দূরে ছুঁড়ে দিল বড়শিটা। শুরু হলো অপেক্ষার পালা। দেখা যাক কিছু ধরা পড়ে কি না।

পড়ল না। একটু অপেক্ষা করে আবারও ছিপ ফেলল ও, আরেক জায়গায়... লাভ হলো না। পর পর আরও কয়েকবার ছিপ ফেলল, ভিন্ন ভিন্ন স্পটে, টোপ বদলে নিয়ে, অথচ ফলাফল একই। ইতিমধ্যে আলো কমে এসেছে, আঁধার নামতে দেরি নেই, বাড়ির পথে ফিরতে হবে ওকে খুব শীঘ্রি। অগত্যা টোপ হিসেবে কেঁচো ব্যবহার করবে বলে ঠিক করল। এত কষ্টের পর খালি হাতে ফেরা চলে না।

ছোট্ট একটা কৌটোয় কেঁচো নিয়ে এসেছে, সেখান থেকে মোটাসোটা একটাকে বেছে নিল, ওটাকে গেঁথে ফেলল বড়শিতে। টোপসহ্ বড়শিটা পানিতে ফেলতেই টান খেল সুতো। ফাৎনা ডুবল প্রায় চোখের পলকে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে, তৈরি

ছিল না ও। রিল ঘুরতে শুরু করায় টের পেল, বড়শিতে ঠোকর দিয়েছে শিকার।

মৃদু ঝাঁকি দিয়ে মাছের মুখে বড়শিটা আটকে নিল ছেলেটি, তারপর ধীরে ধীরে ছাড়তে শুরু করল সুতো। তাড়াহুড়ো করছে না, হুটোপুটি করতে দিচ্ছে শিকারকে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে শুরু হবে ওর কাজ... আস্তে আস্তে টেনে তুলবে ওটাকে। কেটে গেল কয়েক মিনিট। ততক্ষণে বুঝে গেছে, সাধারণ কোনও মাছ আটকা পড়েনি ওপাশে—বেশ তেজি, ছটফট করছে অবিরাম, সাঁতার কাটছে খুব দ্রুত, বনবন করে সুতো টেনে নিচ্ছে রিল থেকে। শক্তিশালীও বটে, সুতো না ছাড়লেই ওটার টানে বেঁকে যাচ্ছে ছিপের ডগা।

খুশি হয়ে উঠল ছেলেটি, ভাগ্যে বড়সড় একটা শিকার জুটেছে। কী মাছ ওটা? কিংবদন্তির সিলভারব্যাক নয়তো!

সময় নিয়ে মাছটাকে খেলাল ও। যতটুকু সম্ভব স্বাধীনতা দিল সুতো ছেড়ে; মনে মনে প্রার্থনা করল, যাতে বড়শিটা খুলে না আসে... সুতো ছিঁড়ে না যায়। পুরোটাই সূক্ষ্ম হিসেবের কাজ—মাছটার মতিগতি বুঝে নিতে হচ্ছে ওকে, অপ্রত্যাশিত নড়াচড়া আঁচ করে সেই অনুসারে ছাড়তে বা গুটাতে হচ্ছে সুতো। ধীরে ধীরে চলে আসছেওটা কাছে।

সুফল মিলল ধৈর্যের। অনেকক্ষণ পর ওর কাছাকাছি পানিতে উঠল আলোড়ন—সুতোর টানে ক্লান্ত শিকার চলে এসেছে নাগালের মধ্যে। আরও কয়েক মিনিট ওটাকে নাস্তানাবুদ করল ও, তারপর আচমকা এক ঝটকায় উঁচু করল ছিপ... পানি থেকে বিদ্যুৎবেগে শূন্যে তুলে আনল আটকা পড়া শিকারকে।

পরক্ষণে দমে গেল। কীসের সিলভারব্যাক... স্যামন-ট্রাউট কিচ্ছু না, শরীর মোচড়াচ্ছে বড়শিতে গাঁথা মস্ত বড় এক ঈল। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গোড়ালির সঙ্গে ঘষা খেলকী

যেন।নিচে দৃষ্টি ফেলতেই দ্বিতীয় একটা ঈলকে দেখতে পেল ছেলেটি—ওর পায়ের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে।

কাঁধ ঝাঁকাল ও। কিছুই করার নেই, অন্তত হুক আর লাইন ফেরত পেতে হলেও ছাড়িয়ে নিতে হবে ঈলটাকে। হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল ওটাকে। কাজটা সহজ হলো না। প্রাণপণে শরীর মোচড়াচ্ছে ঈল, পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে ছিপের মাথায়। এত বড় ঈল আগে কখনও দেখেনি ছেলেটি। দু'ফুট লম্বা, শরীরটা ওর বাহুর চেয়ে মোটা;মেটে মত রঙ। হাত বাড়াতেই ওটা সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল ওর বাহু।

গা ঘিনঘিন করে উঠল ঈলের পিচ্ছিল স্পর্শে। তাড়াতাড়ি অন্য হাতে ওটাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল ছেলেটি। ঈলটাও নাছোড়বান্দা, এ-হাত ছেড়ে পেঁচিয়ে ধরল ও-হাতটা। পাগলের মত খামচি দিয়ে আবারও ওটাকে ছাড়াতে চাইল ছেলেটি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তাল হারাবার উপক্রম হলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, অস্থির হয়ে লাভ নেই। পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল বড় পাথরটার দিকে। এবার হাত থেকে ঈলটাকে ছাড়িয়েই সজোরে আছাড় মারল পাথরের গায়ে। চেপে ধরল দু'হাতে। ছটফটানি একটু কমল ঈলের, তাই বলে হার মানেনি। হাতের মুঠোর তলায় শরীর মোচড়াতে থাকল ওটা। কুৎসিত চেহারা, কোটরে বসা প্রাণহীন চোখ... দেখলে অশুভ একটা অনুভূতি হয়।

এক হাতে মাথাটা চেপে ধরল ছেলেটি, সাবধানে এবার অন্য হাতে ছাড়াতে শুরু করল বড়শিটা। সহজ নয় কাজটা। বড়শিটা বেশ বড়, গেঁথেছেও খুব শক্তভাবে। বাঁকিয়ে-চুরিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হচ্ছে ঈলের মুখের ভিতর থেকে। একটু পর মুক্ত হলো ওটা। মুখ থেকে বাঁকানো বড়শিটা সবে বের করেছে, ঠিক তখুনি ঘটল বিপত্তি।

আচমকা ভীষণ এক ঝটকা দিল ঈল। কিছু বুঝে ওঠার

আগেই ঝাঁকি খেয়ে বড়শিটা গেঁথে গেল হাতের তালুতে। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটি।

ভয়াবহব্যথা!তালু থেকে শুরু হয়ে যেন হাত বেয়ে উঠে আসছে উপরদিকে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, বহু কষ্টে দাঁতে দাঁত পিষে নিজেকে সংযত করল ও। সাঁঝের এই নিস্তব্ধ পরিবেশে অনেক দূর থেকে শোনা যাবে চিৎকারের আওয়াজ... ছুটে আসবে প্রহরীরা।

হাত থেকে ছুটে গেল ঈলটা, ছপাৎ করে পানিতে আছড়ে পড়ল, তারপর শরীর বাঁকিয়ে হারিয়ে গেল পানির গভীরে। ততক্ষণে শরীর থরথর করে কাঁপছে ছেলেটির, মনে হলো জ্ঞান হারাবে। হাতের দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছে না, তাও তাকাল। তালু ফুঁড়ে বুড়ো আঙুলের গোড়ায় গেঁথে গেছে বড়শি। যেখান দিয়ে বেরিয়েছে, সেখানে সৃষ্টি হয়েছে বড়সড় একটা ক্ষত। গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে লেকের পানিতে।

একদিক থেকে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বড়শির মাথা—ব্যাপারটা এক অর্থে সৌভাগ্যই বলতে হবে। ভিতরে আটকে থাকলে ছাড়ানো আরও কঠিন হতো। টান দিয়ে খোলা যাবে না, তাই ছিপটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল ছেলেটি, ভাল হাতে ব্যাগ হাতড়ে বের করে আনল একটা কাটার।

বড় করে শ্বাস নিল ও, তারপর কাটারটা ঠেকাল তালু ফুঁড়ে আঙুলে গেঁথে থাকা বড়শির গায়ে। চাপ দিতেই কুট করে কেটে দু'টুকরো হয়ে গেল ওটা। দ্রুত এক টানে মাংসের ভেতর থেকে জিনিসটা খুলে আনল। ব্যথার নতুন একটা ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। কেঁপে উঠল পা। তাড়াতাড়ি পাথরে ঠেস দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করল কোনোমতে।

বুঝতে পারছে, আজ আর মাছ ধরা হবে না। কান্না পেল... এত কষ্টের ফলাফল কিনা এ-ই? পালিয়ে যাওয়া কুৎসিত একটা ঈল আর আহত হাত! কোনও মানে হয়? আনমনে মাথা নেড়ে নিজেকে সামলে নিল। ভেঙে পড়ে লাভ নেই, যা হবার হয়েছে। এখন বাড়ি ফেরা দরকার। আঙুলের ক্ষত থেকে এখনও ঝরছে রক্ত। হাত ডুবিয়ে ধুয়ে ফেলল ক্ষতটা, পানিতে মিশে কালচে রঙ ধারণ করল রক্তের ধারা। সোজা হয়ে বুক পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল ও, জড়িয়ে নিল হাতের তালু ও বুড়ো আঙুলে। শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, হালকা লাগছে মাথা। সাবধানে জিনিসপত্র সব তুলে নিল, তারপর লঘু পায়ে পানি ভেঙে এগোতে থাকল তীরের দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠল ও। কী যেন গুঁতো মেরেছে ওর পায়ে। থামবার সঙ্গে সঙ্গে আবারও গুঁতো। চোখ পিটপিট করে নিচে তাকাল ছেলেটি। ঈল... একটা না, কয়েকটা। ঘুরপাক খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওর পায়ে। কারণ কী? ঈল তো কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না! আগাছা খায় ওরা... বড়জোর ছোটখাট ব্যাঙ, ফড়িং বা মাছ। তা হলে?

মাথা নেড়ে ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করল ও। আবার পা বাড়াল তীরের উদ্দেশে। কিন্তু কয়েক কদম যেতে আবারও থেমে যেতে হলো। আবারও পায়ে গুঁতো দেয়া হয়েছে। হলো কী ঈলগুলোর! রাগী চোখে ওদিকে তাকিয়েই থমকে গেল। রাগ সরে গিয়ে চোখে ভর করল অবিশ্বাস ও আতঙ্ক।

দৃশ্যটা ভয় পাবার মতই বটে। না, এবার আর দু-চারটে নয়... অগণিত ঈল ভিড় করেছে ওর চারপাশে। গোধূলির শেষ আলোয় কিলবিল করছে ওগুলো, যেন উঠে এসেছে হ্রদের তলার কোনও নরকগহ্বর থেকে। ছোট-বড় নানান আকারের ঈল—কোনোটা কালো, কোনোটা মেটে-রঙা, আবার কোনোটা

সবুজাভ। একদিক থেকে সবার বৈশিষ্ট্য এক—সবগুলোই ঠোকর মারছে হিংস্র ভঙ্গিতে।

ছেলেটির পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোট-বড় ঈলের দঙ্গল। পিছাতে গিয়ে তাল হারাল ও, চিৎ হয়ে পড়ে গেল পানিতে। পরমুহূর্তে শরীরের এখানে-ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, ছেলেটিঅনুভব করল ছোট ছোট কামড়। আঙুলে বাঁধা রুমালটা টান দিয়ে নিয়ে গেল প্রাণীগুলো, যেন ওটা কোনও টোপ।

চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। সবকিছু ফেলে ছুটতে শুরু করল তীরের দিকে। কিন্তু পানিতে দ্রুত এগোনো যায় না, বরং তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আবারও ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঈলেরা। এবার আর উঠতে পারল না ও। গায়ে থাকা ওয়েডার্সটা যেন একটা মস্ত থলে... ভিতরটা ভরে গেছে পানিতে। তার ওজনে পিছলাতে শুরু করল। আতঙ্কের সঙ্গে টের পেল, গভীর পানির দিকে চলে যাচ্ছে দেহটা। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঈলদের আক্রমণ। ওয়েডার্সের ভিতরেও ঢুকে পড়েছে কয়েকটা—গায়ে কামড় বসাচ্ছে ওগুলো।

সাঁতার ভালই পারে ছেলেটি, চাইলে এখনও তার পক্ষে ভেসে থাকা সম্ভব, কিন্তু আতঙ্কের ঠেলায় ভুলে গেছে সবকিছু। কাজ করছে না মাথা। হাত-পা ছুঁড়ছে নেহায়েত আনাড়ির মত। ফ্যাসফেঁসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!!'

সাড়া দিল না কেউ। পরক্ষণে ডুবে গেল ও। ডুবন্ত শরীরটাকে ঘিরে ধরল ঝাঁকে ঝাঁকে হিংস্র ঈল। উন্মুক্ত হাত আর গলা কামড়ে ধরল বেশ ক'টা; একটা ঈল কামড়ে ধরল ওর ঠোঁট। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ওটাকে টান দিয়ে সরিয়ে ফেলল ছেলেটি, তারপর সর্বশক্তিতে হাত-পা ছুঁড়ে মাথা ভাসাল হ্রদের সারফেসে। ঈলের ঝাঁকের কারণে ওর চারদিকে ততক্ষণে যেন জ্যান্ত হয়ে খলবল করছে সিলভারব্যাক লেকের পানি।

আহত ঠোঁট থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। গলা ফাটিয়ে আবার চেঁচাল ছেলেটি। 'বাঁচান! কে আছেন... বাঁচান আমাকে!! প্লিজ!!!'

মনে হলো এবারও কেউ শুনতে পায়নি। হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল ও—দূর থেকে লেকের দিকে ছুটে আসছে। বিশালদেহী একজন মানুষ। হাত নেড়ে, চিৎকার করে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল ছেলেটি; লোকটা এখানকার পাহারাদার হলেও কিছু যায়-আসে না। হিংস্র মাছের খাবার হবার চাইতে পাহারাদারের হাতে পিট্টি খাওয়া ভাল।

কাছাকাছি এসে পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল লোকটা। চেঁচিয়ে তাকে সাবধান করতে চাইল ছেলেটি, কিন্তু সুযোগ পেল না। পানিতে তলিয়ে গেছে অচেনা সাহায্যকারী। বেশ কয়েক মুহূর্ত অদৃশ্য রইল ওভাবেই। খানিক পরে ভেসে উঠল তার মাথা। বলিষ্ঠ, শক্তিশালী দু'হাত উঠছে-নামছে... সাঁতার কেটে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। বোঝাই যাচ্ছে, হ্রদের পানি তার অতি-চেনা।

বিড়বিড় করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল ছেলেটি—বেঁচে গেছে... বেঁচে গেছে ও! এক্ষুণি ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে ওই লোক। পরমুহূর্তে নিচ থেকে টান অনুভব করল। সাপের মত ওর হাত-পা আর শরীর পেঁচিয়ে ধরতে শুরু করেছে ঈলেরা। ওজন বেড়ে যাওয়ায় ডুবে যেতে থাকল। ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে হাত-পা ঝাড়ল ও, খামচি দিয়ে সরাল যে-ক'টাকে পারে। তারপর আবার পা নেড়ে ভেসে উঠল পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল।

কোথায় লোকটা? যে-দিক থেকে আসছিল, সে-দিকে তার চিহ্নমাত্র নেই। হ্রদের পানি শান্ত, নিথর। সর্বনাশ! বেচারাকে ধরে ফেলল নাকি রাক্ষুসে মাছগুলো? টেনে নিয়ে গেছে পানির নিচে?

ব্যাকুল চোখে খুঁজল লোকটাকে। কিন্তু না, নেই সে। হারিয়ে গেছে।

ঈলেরা আবার পেঁচিয়ে ধরছে ওর শরীর। টানছে পানির নিচে। আর তখুনি বিশাল একটা ছায়া দেখতে পেল ও। অচেনা সেই সাহায্যকারী! ঈলের ভিড়ের মাঝ দিয়ে তীরের বেগে ডুবসাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। একেবারে কাছে এসে ভুস করে ভেসে উঠল। ছায়ামূর্তিটার মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে আর্তচিৎকার করে উঠল ছেলেটি।

মানুষের চেহারা নয়... ওটা এক ঈলের চেহারা! দুঃস্বপ্নের মত ভয়ঙ্কর। যেন অতিকায় একটা ঈলের মাথা বসিয়ে দেয়া হয়েছে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের ধড়ে। চুল নেই, চোয়াল নেই... নেই কোনও নাক বা কান। পিচ্ছিল, মেটে রঙের চামড়া টানটান হয়ে আছে খুলির গায়ে। চোখদুটো যেন বের হয়ে আসছে। নাকের জায়গায় রয়েছে স্রেফ দুটো ফুটো। মুখটা বিকৃত, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনে; মোটা ঠোঁটজোড়া ছড়িয়ে গেছে অনেকদূর, যেন স্পর্শ করতে চাইছে মাথার দু'পাশের অদৃশ্য দুটো কানকে। বিশাল মুখটা একটু ফাঁক করতেই ভেসে এল হিসহিসে আওয়াজ... সেইসঙ্গে বোটকা গন্ধ।

মাত্র এক পলকের জন্য সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখল ছেলেটি, তারপরেই ওকে জাপটে ধরে পানিতে ডুবিয়ে ফেলল ঈলের দল। ওর চোখের সামনে নেমে এল কালো একটা পর্দা।

দুই

ইটন কলেজ। বার্কশায়ার, ইংল্যাণ্ড।

অগণিত কিশোরের গায়ের গন্ধ আর হৈ-হট্টগোলে ভরে আছে হলওয়ে। সকাল সাড়ে সাতটায় এটাই স্বাভাবিক। ডাইনিং হলে ছুটছে সবাই, ব্রেকফাস্ট করবার জন্য। হট্টগোল তাও সহ্য করা যায়, কিন্তু গন্ধটা নয়। অনেকেই ঠিকমত মুখ ধোয়নি বা গোসল করেনি, তার সঙ্গে মিশেছে দুইশ' বছরের পুরনো এই ভবনের ফ্লোর-পলিশ আর কার্বোলিকের গন্ধ! রীতিমত ম ম করছে বাতাস।

সৌভাগ্যক্রমে অল্পবয়েসী ছেলেরা গন্ধ-টন্ধ নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের মনোযোগ থাকে অন্যদিকে। কিন্তু একটি ছেলে তার ব্যতিক্রম। প্রভাতকালীন বিশৃঙ্খলার মাঝে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সে, দু'পাশ দিয়ে ব্রেকফাস্টের জন্য তড়িঘড়ি করে ছুটে যাওয়া সমবয়সীদের প্রতি উদাসীন। বরং ভাবছে অন্য কোথাও যেতে পারলে ভাল হতো। এত ভিড় বা হট্টগোল ওর পছন্দ নয়।

ইটনের নতুন ছাত্র ও। বয়সের তুলনায় কিছুটা লম্বা, কাঠামোর তুলনায় শরীরটা রোগা। গায়ের রঙ শ্যামলা ও ফরসার মাঝামাঝি—অনেকটা পাকা জলপাইয়ের মত। বোঝা যায় ও ইংরেজ নয়। মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, কিন্তু অনভ্যস্ত বলে কাজটা নিখুঁত হয়নি... এক গোছা চুল নেমেএসেছে

কপালে। চেহারায় একাধারে কাঠিন্য ও বিষণ্নতা এত পরিষ্কার, যেন এ-বয়সেই জীবনের বহু কিছু দেখে ফেলেছে, পার হয়ে এসেছে কঠিন সবসঙ্কট, আর শোকদুঃখেও ভুগেছে খুব। দেখে ক্লান্ত মনে হয়, তবে সেটা শারীরিক অর্থে নয়, মানসিক অর্থে—তার ভিতর আবেগ যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে, জীবন সম্পর্কে যেন তার আর কোনও মোহ নেই। মায়াভরা কালো চোখদুটোবাঙ্ময়—সাদা অংশটা ঝকঝকে সাদা, উজ্জ্বল মণিদুটো কুচকুচে কালো।ওখানে শান্ত প্রকৃতির আনন্দ আছে, আর আছে অস্পষ্ট হলেও খানিকটা গর্ব।

'অ্যাই, ছেলে!'

পিছন থেকে ভারী গলার ডাক শুনে সচকিত হলো ছেলেটি। ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি হলো সুবেশী এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোকের। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখলেন তিনি।

'কী নাম তোমার?'

'মাসুদ চৌধুরি রানা।'

'স্যর বলো!' খেঁকিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

'দুঃখিত, স্যর,' ক্ষমা চাইল ছেলেটি। 'আমার নাম মাসুদ চৌধুরি রানা, স্যর।'

'মিডল্ নেম ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। বলো—মাসুদ রানা।'

চৌধুরি যে মিডল নেম নয়, ওর পারিবারিক উপাধি, সেটা বলবার আর সাহস পেল না রানা। আবারও ধমক খাবার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া বাঙালিদের ফ্যামিলি নেম কেন মাঝখানে থাকে, সেটা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছে করছে না। তাই সায় জানাল, 'ইয়েস, স্যর।'

'নাম যত ছোট হয়, তত ভাল; মনে রাখতে সুবিধে,' বললেন ভদ্রলোক। 'তোমাকে রানা ডাকলে আপত্তি নেই তো, মিস্টার মাসুদ রানা? সমস্ত কাগজপত্রেও এ-নামই থাকবে।'

'সমস্যা নেই, স্যর।'

'গুড। তো, মি. রানা... বলতে পারো আমি কে?'

ভদ্রলোককে ভাল করে দেখল রানা। মাঝারি উচ্চতা, চোখে সোনালি রিমের চশমা পরেছেন। মাথার চুল পাতলা হতে হতে টাক পড়তে শুরু করেছে। মুখভর্তি সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি-গোঁফ। বোঝাই যাচ্ছে, কড়া ধাতের মানুষ।

'মাফ করবেন, স্যর। আমি আসলে...'

'তা হলে পরিচয় হয়ে যাক,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি অ্যানড্রু সমারসেট—তোমার হাউসমাস্টার। যতদিন এই স্কুলে থাকছ, আমাকে তোমার গুরু, ধর্মপিতা বা অভিভাবক... যা খুশি ভাবতে পারো। গতকাল সন্ধ্যায়ই তোমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল, কিন্তু একটা ঝামেলায় আটকা পড়ে যাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। অসুস্থ এক স্টুডেন্টকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। যাক গে, ডেমের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'জী, স্যর।'

'বেশ, এখন তা হলে যাও। স্কুলের প্রথম দিনেই লেট কোরো না। সাপারের আগে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'ইয়েস, স্যর,' বলে ঘুরতে গেল রানা।

'দাঁড়াও!' জ্বলজ্বলে চোখে রানাকে এক মুহূর্ত দেখলেন সমারসেট। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'ইটনে স্বাগতম, মি. রানা।'

'ধন্যবাদ, স্যর।'

গতকাল সন্ধ্যায় উইণ্ডসর স্টেশনে নেমেছিল রানা। উইণ্ডসর কাসলের অভ্রভেদী টাওয়ার আর প্রাচীরগুলোর একেবারে পাশেই স্টেশন। ট্রেন থেকে নামতেই চোখে পড়েছে ব্রিটিশ রাজপরিবারের আলিশান সেই প্রাসাদ। দেখে আনমনা হয়ে গেছে

রাজা-বাদশাহদের জীবন কেমন ছিল সেটা ভাবতে গিয়ে।

ট্রেনে আরও কিছু ছেলে এসেছে, তাদের সঙ্গে স্টেশন থেকে বেরিয়েছে ও, উঠেছে স্কুল থেকে পাঠানো গাড়িতে। সেই গাড়িতে চড়ে পার হয়েছে টেমস নদীর উপরের ব্রিজ। নদীটা দু'ভাগ করেছে উইণ্ডসর শহরকে—রাজপ্রাসাদ পড়েছে একপাশে, অন্যপাশে বিশ্ববিখ্যাত ইটন কলেজ। সময় লাগেনি গন্তব্যে পৌঁছুতে।

ক্যাম্পাসে পা রেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ঢাকার যে-স্কুলে রানা এতদিন লেখাপড়া করেছে, তার সঙ্গে ইটনের কোনও মিলই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো নয়, যেন ছোটখাট শহর একটা। নদীর এপারের অর্ধেকের বেশি জমি করায়ত্ত করে রেখেছে ইটন কলেজ। ছোট-বড় নানা আকারের অগণিত ইমারত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে। ইটন সম্পূর্ণ আবাসিক স্কুল, সহস্রাধিক ছাত্র পড়ে এখানে; থাকে ক্যাম্পাসেরই বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করা আবাসিক বিল্ডিঙে—"হাউস" বলে ওগুলোকে।

নিজের হাউস খুঁজতে গিয়ে দিকভ্রান্তের মত ঘুরে মরছিল রানা। এক সময় পৌঁছে গেল জুডি'স প্যাসেজে। দীর্ঘ এক ফুটপাথ ওটা, দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চিহ্নহীন কতগুলো বিল্ডিং। ওগুলোরই কোনও একটায় যাবার কথা ওর, কিন্তু বুঝতে পারছিল না কোন্‌টা।

বোকার মত ইতি-উতি তাকাচ্ছিল, এমন সময় চাইনিজ চেহারার ওরই বয়েসী এক ছেলে উদয় হলো।

'নতুন এসেছ বুঝি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হুঁ।'

'তুমি মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' একটু অবাক হলো রানা। 'কী করে জানলে?'

'তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি যে! আমি তোমার গাইড।' হাসল ছেলেটা। হাত বাড়িয়ে দিল। 'হাই! আমি মিং হুলিয়াং।'

হাত মেলাল রানা। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

রানাকে কাছের একটা বিল্ডিঙে নিয়ে গেল মিং। সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে বলল, 'ওয়েলকাম টু ডার্নফোর্ড হাউস—ইটনের সবচেয়ে পুরনো হাউসগুলোর একটা এটা। আজ থেকে তুমি এখানকার গর্বিত বাসিন্দা।' বলেই মুখ টিপে হাসল।

'হাসছ কেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক'দিন গেলেই বুঝবে, গর্ব করবার মত কিছু আছে কি না।'

সিঁড়ি ধরে তিনতলায় উঠল ওরা। পৌঁছুল মৃদু আলোকিত এক করিডোরে। কিছুদূর এগিয়ে একটা দরজার সামনে থামল মিং।

'এটাই তোমার রুম,' বলল সে। 'পাশেরটা আমার। আমরা একসঙ্গে মেসিং করব।'

'মেসিং?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ছুঁড়ল রানা।

'একসঙ্গে চা-নাশতা বানাব আমরা। পালা করে একে অন্যের কামরায় খাব সেই চা-নাশতা। তুমি, আমি আর আরেকজন। তিনজনের গ্রুপ। এটাই এখানকার রীতি।'

'আরেকজনটা কে?'

'ব্রিটিশ এক ছেলে। ওর সঙ্গে পরে দেখা করিয়ে দেব তোমাকে। ও-ও খুশি হবে। মেসিঙের থার্ড মেম্বার হিসেবে কাকে না কাকে অ্যাসাইন করা হয়, তা নিয়ে আমরা দু'জনেই খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। কোনও আমেরিকান ছাত্রকে দিলেই সর্বনাশ... ওরা খুব বদমেজাজি হয়। আমার একদম পছন্দ না।'

'আমাকে পছন্দ হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। ভারতীয়দের আমি সবসময়েই পছন্দ করি।'

'আমি কিন্তু ভারতীয় নই। পূর্ব বাংলার মানুষ।'

'এলাকা তো একই, তাই না? এসো।'

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল দুই কিশোর। আকারে খুব বড় নয় ওটা। নীল রঙের দেয়াল; একদম ওপরতলা বলে ছাতটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে মেঝের কাছাকাছি, ওখানে ছোট্ট একটা জানালা। একপাশে ফায়ারপ্লেস। অল্প কিছু আসবাবপত্রও আছে। ঘরের কোণে পড়ে আছে রানার ট্রাঙ্কটা—দু'দিন আগেই কুরিয়ারে পাঠানো হয়েছিল ওটা, ঠিকমত এসে পৌঁছেছে।

'এ-ই তোমার নতুন ঠিকানা,' মিং বলল। 'এখন হয়তো অত ভাল দেখাচ্ছে না, তবে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে আর মন্দ লাগবে না। ওটা তোমার *বারি*।'

'বাড়ি মানে?' ভ্রূকুটি করল রানা।

'বাড়ি না, বারি (Burry),' শুধরে দিল মিং। ছোট আকারের একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার্স শোভা পাচ্ছে রুমের কোণে, উপরের অংশটা পড়ার টেবিলের মত, তার উপরে বই রাখার তাক; পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওটার। 'এটাকে *বারি* বলি আমরা। সবার একটা করে থাকে।'

কাছে গিয়ে দেখল রানা। জিনিসটা বহু পুরনো। প্রাক্তন মালিকেরা আনাড়ি হাতে খোদাই করে নিজের নাম লিখেছে বিভিন্ন জায়গায়। একজন তো আরও সরেস—ফায়ারপ্লেসের গরম পোকার ব্যবহার করেছে... কাঠের গায়ে নিজের নামকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে হয়তো।

ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের বাকি জিনিসগুলোও দেখল রানা। ছোট একটা টেবিল, একটা ওঅশস্ট্যাণ্ড, আর গদিমোড়া একটা চেয়ার। মেঝেতে পাতা হয়েছে পুরনো, বিবর্ণ একটা গালিচা—ফায়ারপ্লেসের ঠিক পাশে। খটকা লাগল রানার। সবচেয়ে জরুরি জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছে না।

'আমি ঘুমাব কোথায়?'

হেসে একপাশের দেয়ালে পর্দা দিয়ে ঢাকা বিশাল একটা আকৃতির দিকে ইশারা করল মিং। 'ওই যে তোমার বিছানা—উঠিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের ভিতরে জায়গা বাড়াবার জন্য এই কায়দা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাউস মেইড এসে ওটা নামিয়ে দিয়ে যাবে। সকালে ক্লাসে যাবার পর উঠিয়ে রাখবে ফের।'

'তারমানে অসময়ে ঘুমানোর কোনও উপায় নেই?'

'সময় পেলে তো! এখানকার রুটিন খুব টাইট। মানিয়ে নিতে হয়তো একটু সময় লাগবে তোমার। আগে রুমটা গুছিয়ে নাও। অনেক কিছুই লাগবে তোমার—টুল, আর্মচেয়ার, বুট বক্স, ব্রাশ বক্স, দেয়ালে ঝোলানোর জন্য কিছু ছবি...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' ধপ করে ফায়ারপ্লেসের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। 'এত কথা একসঙ্গে মনে থাকবে না। একটু রয়ে-সয়ে বলো।'

'সরি, বন্ধু,' মিং বলল। 'যত তাড়াতাড়ি নিজেকে মানিয়ে নেবে, ততই মঙ্গল। এই স্কুল আর হাউসই তোমার জীবন—অন্তত আগামী কয়েক বছরের জন্য।'

কথাটা শুনে উদাস হয়ে গেল রানা। সবকিছুই কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে ওর কাছে। বাবা-মা মারা যাবার পর ফুপুর কাছে ছিল এতদিন, প্রায় বছরখানেক স্কুলেই যাওয়া হয়নি। রুটিন কাকে বলে ভুলেই গিয়েছিল। আর এখন...

এমন জীবন তো ও চায়নি! ওর কাছে জীবনের অর্থ ছিল অন্যরকম—হাসিখুশি, চিন্তাহীন, বাবা-মায়ের আদর মাখা। রোজ সকালে মায়ের বকা খেয়ে ঘুম থেকে ওঠা, তারপর সারাদিন স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ, দিনশেষে নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়া। বিকেলে আবার পাড়ার মাঠে খেলাধুলা, সন্ধ্যায় পড়তে বসা।

ফাঁকে ফাঁকে খাওয়াদাওয়া... তাও সে কী বায়নাক্কা!এটা খাব না, ওটা খাব না, খিদে পায়নি, ইত্যাদি। যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মা মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন ওকে। একটা মাত্র দুর্ঘটনায় বদলে গেল সব। হারিয়ে গেল সোনালি সেই দিনগুলি। হারিয়ে গেল নিষ্পাপ শৈশব। রাতারাতি বড় হয়ে যেতে হয়েছে রানাকে—শারীরিক নয়, মানসিকভাবে। শান্তি আর নেই ওর হৃদয়ে, আছে শুধু এক বুক হাহাকার।

'চলো,' টান দিয়ে রানাকে চেয়ার থেকে ওঠাল মিং। 'বসে থাকার সময় নেই। এখুনি বেশ কিছু কাজ সেরে নিতে হবে। সবার আগে দেখা দরকার কার কবলে পড়েছ তুমি।'

'কার কবলে মানে?'

'টিচারের কথা বলছি। তোমার টিচার কে, সেটা জানতে হবে। এসো, স্কুল-ইয়ার্ডে যেতে হবে আমাদেরকে।'

মিঙের সঙ্গে হাউস থেকে বেরিয়ে এল রানা। জুডি'স প্যাসেজ ধরে হেঁটে চলল লং ওঅকের দিকে। থামল একটা কারুকাজ করা ল্যাম্পপোস্টের সামনে পৌঁছে। জিনিসটা সুন্দর—খাঁটি লোহা দিয়ে তৈরি। সারা দেহে ফুল-লতা-পাতার অলঙ্কার পরে আছে যেন। রাস্তার মাঝখানে একটা আইল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্পপোস্ট।

'এটাকে আমরা বলি *বার্নিং বুশ*,' মিং বলল। 'ইটনের বিখ্যাত এক ল্যাণ্ডমার্ক। মিটিং পয়েন্ট হিসেবেও আদর্শ। জায়গাটা ভাল করে চিনে রাখো।'

কয়েক সেকেণ্ড সময় পেল রানা আশপাশটা দেখবার জন্য, তারপরেই মিং আবার ওর বাহু ধরে টানল। বড়সড় একটা ফটক পেরিয়ে বিশাল একটা বর্গাকার বিল্ডিঙে ঢুকল দু'জনে।

'এটা আপার স্কুল,' প্যাসেজ পেরিয়ে মাঝখানের খোলামেলা আঙিনায় বেরিয়ে বলল মিং। 'ইটনের হৃৎপিণ্ড। আঙিনার

মাঝখানে যে মূর্তিটা দেখছ, সেটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—রাজা ষষ্ঠ হেনরির। পিছনে ওটা লুপটন'স টাওয়ার। টাওয়ারের ঘড়িটা দেখতে পাচ্ছ? ওই ঘড়ি তোমার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এখন থেকে।'

বাইরে খুব বেশি মানুষ দেখা না গেলেও স্কুল ইয়ার্ড লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে একপাশে ঝোলানো নোটিসবোর্ডের দিকে রানাকে নিয়ে চলল মিং। কথা বলে চলল অবিরাম, ব্যাখ্যা করল ইটনের শিক্ষা-পদ্ধতি। ছেলেটা পারেও বটে! বেশিরভাগই অনুধাবন করতে পারল না রানা। শেষ পর্যন্ত শুধু এটুকুই বুঝল, ভাল-মন্দ দু'রকম টিচারই আছে স্কুলে—ভালরা ভালর চূড়ান্ত, আর মন্দরা এক অর্থে নরক থেকে উঠে আসা পিশাচ!

নোটিসবোর্ড দেখে রানার ক্লাস টিচারের নাম উদ্ধার করল ওরা—মি. স্যালিসবারি। এঁর অধীনেই ওর বেশিরভাগ লেখাপড়া চলবে। মিঙের কাছ থেকে জানা গেল, ভদ্রলোক ভালর দলে পড়েন। স্বস্তির কথা।

নোটিসবোর্ড দেখা হলে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল দু'জনে। হাই স্ট্রিট ধরে বুক শপের দিকে এগোল বই কেনার জন্য। চলতে চলতে মিং জানাল, লোয়ার স্কুলের ছেলেদেরকে রাস্তার পূর্ব দিক ধরে হাঁটতে হয়। অন্যপাশটা আপার স্কুলের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ।

'পশ্চিম পাশের দুটো দোকান থেকে যদি কিছু কিনতে চাও, দোকানদুটো যতই কাছে হোক, প্রথম দোকান থেকে কেনাকাটার পর রাস্তার এপাশে এসে দূরত্বটুকু পার হতে হবে, তারপর আবার রাস্তা পেরিয়ে ঢুকবে দ্বিতীয় দোকানে।'

'দু-দু'বার অযথা রাস্তা পার হব?' বিস্ময় ফুটল রানার চেহারায়। 'কিন্তু কেন?'

'ওসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। এটাই এখানকার নিয়ম।'

'নিয়ম- তো অনর্থক হতে পারে না, তার পিছনে যুক্তি থাকা চাই। নইলে ব্যাপারটা পাগলামি হয়ে যায় না?'

ঠোঁট বাঁকাল মিং। 'ক'টা দিন গেলেই টের পাবে, ইটনের এমন হাজারটা ট্র্যাডিশন আছে, যার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। কেউ জানে না কেন ওসব পালন করি আমরা। কিন্তু না করেও উপায় নেই। করতেই হবে।'

বইখাতা আর টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনে ঘণ্টাখানেক পর হাউসে ফিরেছিল ওরা। সাপার সেরেছে একসঙ্গে। আর কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়নি। মিঙের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেষে নিজের কামরায় চলে এসেছিল রানা। বিছানা তৈরি পেয়ে শুয়ে পড়েছিল।

শুলেও ঘুম আসেনি। ঘরটা ভীষণ ঠাণ্ডা। খাটের পাতলা তোষক ভেদ করে স্প্রিংগুলো খোঁচা মারছিল পিঠে। তা ছাড়া নতুন, অচেনা পরিবেশ। রাতটা মোটামুটি জেগেই কাটিয়েছে রানা। কখনও তন্দ্রার ঘোরে চোখ মুদলেও দেখেছে বাবা-মায়ের মুখ, সঙ্গে সঙ্গে টুটে গেছে তন্দ্রা। শেষে দুত্তোর বলে কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়ে থেকেছে বাকি রাত।

ভোর সাড়ে ছয়টায় পড়েছে ঘুম ভাঙানোর ডাক। হাউস মেইডের নাম জ্যানেট, হাড় জিরজিরে বয়স্ক এক মহিলা, ধুমধাম করে দরজায় কিল মেরে জানিয়েছে, বাইরে গরম পানি রেখে যাচ্ছে সে। দরজা খুলে পানির পাত্রটা ভিতরে এনেছে রানা, ওঅশস্ট্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়েছে। তারপর বাকি পানি নিয়ে গেছে কমন বাথরুমে। সকাল সকাল উঠেছে বলে লাইনে পড়তে হয়নি, অল্প সময়ের মধ্যে সেরে নিতে পেরেছে প্রাতঃকৃত্য আর গোসল। কামরায় ফেরার পর করতে হয়েছে সবচেয়ে কঠিন কাজটা—স্কুলের ইউনিফর্ম পরা... দীর্ঘদিন পর।

প্রায় একটি বছর ফুপুর কাছে থাকার সময় স্কুলে যেতে হয়নি,

ইউনিফর্মও পরতে হয়নি; কিন্তু আজ... চোখ ছল ছল করে উঠেছে রানার। আগে স্কুলে যাবার আগে মা ওর শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিতেন, বেঁধে দিতেন ওর জুতোর ফিতা... এখন সেসব করবার কেউ নেই। একদম একা ও।

কষ্টটাকে যতটা পারে চাপা দিয়ে একে একে ইউনিফর্মের প্রতিটা আইটেম গায়ে চড়াল ও—খসখসে কালো ট্রাউজার্স, চওড়া কলারঅলা সাদা শার্ট, ওয়েইস্টকোট, সাদা বো-টাই আর কালো টেইলকোট। জুতো পরল, সবশেষে মাথায় দিল টপ হ্যাট। আয়নায় নিজেকে দেখে সঙের মত লাগল। এ-ধরনের সাহেবি কেতার পোশাক কখনও পরেনি আগে। ভাল্লাগছে না একদম।

পোশাক পরা হলে তাড়াতাড়ি নিচতলায় ছুটে গেল ও। ভেবেছিল ছাত্রদের ভিড় দেখতে পাবে সবখানে, কিন্তু কেউ নেই। ডাইনিং হলে উঁকি দিল, ওটাও শূন্য। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে পুরো বিল্ডিঙে। নার্ভাসভাবে ঘড়ি দেখল, সাতটা পেরিয়ে গেছে। সাড়ে সাতটা থেকে সকালের ক্লাস শুরু হবার কথা, সবাই গেল কোথায়? আগেই চলে গেছে? নাকি ওকে নতুন পেয়ে সবাই মিলে জব্দ করতে চাইছে?

করিডোরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। উপরে গিয়ে মিংকে ডাকবার কথাও ভুলে গেল। ওভাবেই কাটল কিছুক্ষণ।

সোয়া সাতটা বাজতেই বদলে গেল পরিস্থিতি। একে একে খুলতে শুরু করল দরজা। সরগরম হয়ে উঠল পুরো ভবন। খানিক পরেই শুরু হলো স্রোতের মত ছাত্রদের আসা-যাওয়া। শেষ মুহূর্তের হুড়োহুড়ি পড়েছে নাশতা সেরে ক্লাসে যাবার জন্য। হতভম্ব হয়ে তার মাঝে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল রানা, তখুনি উদয় হয়েছেন মি. সমারসেট।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে কেন?' ওর উদ্দেশে বলে উঠলেন

হাউসমাস্টার। 'যাও, যাও, ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ইয়েস, স্যর!' উল্টো ঘুরে তাড়াতাড়ি স্রোতে গা ভাসাল রানা। ঠেলাধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এল বিল্ডিং থেকে। কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানে না, বাকি ছেলেদেরকে অনুসরণ করছে শুধু। খানিক পরে সামনে মিংকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ছুটে নতুন বন্ধুটির পাশে চলে এল।

'গুড মর্নিং!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা।

'মর্নিং!' প্রত্যুত্তর দিল মিং। 'ছিলে কোথায়, বলো তো? আসার আগে তোমার রুমে উঁকি দিয়ে এলাম। পেলাম না যে?'

ঘুম থেকে উঠে কী কী করেছে, জানাল রানা। শুনে হেসে উঠল চিনা কিশোর।

'যাক, ইটনের প্রথম সবক পেয়ে গেলে,' বলল মিং। 'সাতটার আগে কক্ষনো ঘুম থেকে ওঠা যাবে না।'

রানাও হাসল। 'ভাল বলেছ। নিয়মকানুনের যা বহর দেখছি, আদৌ অভ্যস্ত হতে পারব কি না জানি না।'

'পারবে, পারবে। ক'টা দিন যাক, তারপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি পা চালাও, তোমাকে তোমার স্কুলরুম দেখিয়ে দেব।'

'থ্যাঙ্কস, মিং।'

'মোস্ট ওয়েলকাম। তোমার আগের স্কুলটা কেমন ছিল? এর চেয়ে অনেক ছোট নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, ছোট,' আবার উদাস হয়ে গেল রানা। 'কিন্তু অনেক বেশি আপন...'

উদাসীনতার কারণেই কি না কে জানে, মোড় ঘুরতেই দুটো ছেলের সঙ্গে ধাক্কা খেল ও। লক্ষ করেনি আগে, বলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের উপর।

'হোয়াট দ্য হেল!' গর্জে উঠল ওদের একজন। বয়সে রানার

চেয়ে দু-এক বছরের বড় বৈ ছোট হবে না। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, নেমে এসেছে টপ হ্যাটের তলা দিয়ে। 'দেখে চলতে পারো না, কানা কোথাকার?'

'সরি,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল রানা।

'শুকনো সরিতে কাজ হবে না,' বলল দ্বিতীয় ছেলেটা, এ-ও প্রথমজনের সমবয়সী। 'ষাঁড়ের মত গুঁতো মারলে কেন শুনি?'

'ওকে যেতে দাও, ডেনিস,' বলে উঠল মিং। 'কেন অযথা ঝামেলা করছ? ও তো ক্ষমা চাইলই।'

'চুপ, চাইনিজের বাচ্চা চাইনিজ!' গাল দিয়ে উঠল ডেনিস নামের ছেলেটি। 'ঝামেলার দেখেছিস কী! মার খেতে না চাইলে ভাগ এখান থেকে!'

'কিন্তু...'

'তুমি যাও, মিং,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এদের সঙ্গে মিটমাট করে আসছি।'

'তোমাকে ফেলে...' ইতস্তত করল মিং।

'কোনও সমস্যা নেই। আমার কিছু হবে না। তুমি যাও।'

মুঠো পাকাল ডেনিস। 'এখনও দাঁড়িয়ে কেন? ঘুষি লাগাব একটা?'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মিং। রানার দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরে গেল ওখান থেকে।

'তা হলে তুমি মিটমাট করতে চাও?' মুখ বাঁকা করে বলল ডেনিস। গলা চড়িয়ে ডাকল কাকে যেন। 'ড্যানি! দেখে যাও, নতুন এক চিড়িয়া এসেছে। আমাদের সঙ্গে মিটমাট করতে চায়।'

আরেকটা ছেলে এগিয়ে এল ওদের দিকে। লম্বা-চওড়া, তাগড়া, মাথায় সোনালি চুল... প্রথম দু'জনের সহপাঠী বোধহয়। কাছে এসে ভুরু কুঁচকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'ডেনিস, ন্যাট, কী হচ্ছে এখানে?'

'কিছু না,' বলল রানা। 'বেখেয়ালে ওদের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে আমার। সামান্য ব্যাপার।'

'তাই বুঝি?' বাঁকা সুরে বলল ড্যানি। আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলছে। 'খুব তো চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। কে তুমি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। আজই ইটনে আমার প্রথম দিন।'

'প্রথম দিনেই আমার বন্ধুদের সঙ্গে টক্কর দিতে চলে এলে? জানো আমি কে? এখানে কী আমার ক্ষমতা?'

'নতুন এসেছি, না জানাই তো স্বাভাবিক, তাই না?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'পথ ছাড়ো। ক্লাসে যেতে হবে আমাকে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সময়ের কথা শুনে বোধহয় টনক নড়ল তিন প্রতিপক্ষের। ন্যাট বলল, 'চলো, ড্যানি। এর সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় নেই এখন। পরে দেখে নেব নাহয়।'

নড়ল না ড্যানি, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানার দিকে। হিসহিসে গলায় বলল, 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়নি, রানা। আমাকে খেপিয়ে কাজটা ভালও করলে না। এর মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় চুকাতে হবে তোমাকে।'

অস্বস্তি বোধ করল রানা। তীক্ষ্ণ চোখে মাপল প্রতিপক্ষকে। বাকি সব ইংরেজ ছেলের চেয়ে অনেকটাই ব্যতিক্রম ড্যানি। স্বাস্থ্যবান, পেশিবহুল শরীর। সুদর্শন, চেহারায় মিশে আছে আভিজাত্যের ছাপ। চোখদুটো অস্বাভাবিক রকমের নীল। একেবারে আদর্শ কিশোর—ছবি-টবিতে যেমন দেখা যায়। কিন্তু নিখুঁত এই অবয়বটার পিছনে পাগলাটে, হিংস্র, বিপজ্জনক একটা সত্তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। স্কুলের আর দশটা বখাটে ছেলের মত নয় সে, তারচেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

'এখন আর বাড়িতে নেই তুমি,' হুমকির সুরে যোগ করল

ড্যানি। 'বিপদে পড়লে বাড়ি গিয়ে মায়ের আঁচলে মুখ লুকাতে পারবে না...'

মায়ের কথা শুনতেই রানার ভিতরে গর্জে উঠল কী যেন। আবেগের উচ্ছ্বাসে চোখ ভরে এল জলে। সেটার ভুল অর্থ করল ড্যানি।

'ও, মা, কেঁদে দেবে নাকি? আমাদের রানা দেখছি ছিঁচকাঁদুনে!'

হেসে উঠল ডেনিস আর বব। ঘুষি মেরে তিন বদমাশের নাক সমান করে দেবার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল রানা। প্রথম দিনেই বদনাম কুড়ানো ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরল ও, ঝড়ের বেগে তিন প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে পা বাড়াল স্কুল-বিল্ডিঙের দিকে।

ওকে আর বাধা দিল না ড্যানি বা তার সঙ্গীরা। পিছন থেকে টিটকিরি মেরে শুধু বলল, 'ক্লাসে গিয়ে আবার কান্নাকাটি কোরো না, সোনা। ওরা তোমাকে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দেবে।'

রাগে গা জ্বলছে রানার। গায়ে পড়ে ঝগড়া... কোনও মানে হয়? প্রথম সকালেই যদি এ-অবস্থা হয় তো স্কুলের বাকি দিনগুলো কীভাবে কাটাবে?

তিন

'যারা ক্রিকেট খেলে, তাদের বলে *ড্রাই বব*; আর যারা রোয়িং

করে, তারা *ওয়েট বব*।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ।'

'আর যারা দুটোর কোনোটাই করে না?'

'*স্ল্যাক বব*... মানে অলস।'

'বাব্বাহ্! সবারই খেতাব আছে দেখছি,' হেসে বলল রানা।

রীতি অনুসারে ওর কামরায় বসে বৈকালীন চা খাচ্ছে তিনজনে—ও, মিং আর দলের তৃতীয় সদস্য ডেভিড... স্থানীয় এক ইংরেজ কিশোর। ফায়ারপ্লেসের সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছে ওরা, কোলের উপর নাশতার প্লেট, আগুনের তাপ পোহাতে পোহাতে গল্প করছে। একদিন অন্তর পাওয়া যায় ফায়ারপ্লেসের জন্য কয়লা, সে-দিনটাই যা আরাম, নইলে ডিপ ফ্রিজের মত হয়ে থাকে কামরা। গরমের দেশের মানুষ রানা, এত ঠাণ্ডা সহ্য হয় না ওর।

বসে বসে আসন্ন কালার্স টেস্টের জন্য রানাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছে মিং আর ডেভিড। ইটনের ইনফর্মাল পরীক্ষা সেটা, নতুন ছাত্রদের ইন্টারভিউ দিতে হয় শিক্ষকদের সামনে; স্কুলে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ বা প্রবচনের অর্থ জানতে চাওয়া হয়। এ-থেকেই তাঁরা বুঝে নেন, ছেলেটি ইটনের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে কি না।

'এবার বলো, মেসোপটেমিয়া মানে কী?' জিজ্ঞেস করল মিং।

'এটা জানি,' তড়িৎ জবাব রানার। 'খেলার মাঠ, তাই না? ওই যে... যেখানে ক্রিকেট খেলা হয়।'

'গরমকালে ক্রিকেট, শীতকালে ফুটবল,' শুধরে দিল মিং।

'রাইট। ধন্যবাদ, মিং।'

এক সপ্তাহের বেশি পেরিয়ে গেছে প্রথম সকালের সেই ঘটনার পরে। এর মাঝে চিনা কিশোরটির সঙ্গে সখ্য আরও

বেড়েছে রানার। সহজ-সরল, দিলখোলা স্বভাবের ছেলে মিং। কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। অঙ্ক আর বিজ্ঞানে দারুণ ওর মাথা। একমাত্র দুর্বলতা খাবার। রানাকে এক রকম আগলে রেখেছে সে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। এমন ছেলেকে পছন্দ না করে পারা যায় না। ডেভিডও ভাল ছেলে। ভাল স্পোর্টসম্যান। তিনজনের মধ্যে মিলেছে চমৎকার। রানাও ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এসেছে দু'জন বন্ধু পেয়ে।

রানার কামরার চেহারাও বদলে গেছে অনেকটাই। হাতখরচের টাকা দিয়ে একটা আর্মচেয়ার কিনেছে ও। আর কিনেছে একটা অটোম্যান—চৌকোনা একটা বাক্স ওটা, উপরটা গদি মোড়া; ভিতরে জিনিসপত্র রাখা যায়, ডালা বন্ধ করে টুলের মতও ব্যবহার করা যায়। ফ্রেমসহ কিছু ছবিও জোগাড় করেছে—দেয়ালে ঝুলছে সেগুলো। সময় নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছে পুরো কামরা। জিনিসপত্র নিজের সুবিধেমত সাজিয়ে নিয়েছে। সব মিলিয়ে ঘরোয়া একটা ভাব এসেছে রুমটায়।

'*পপ* কাদেরকে বলে?' নতুন প্রশ্ন ছুঁড়ল ডেভিড।

'প্রিফেক্টদেরকে। ঠিক?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মিং। 'তবে এখানকার পরিভাষায় ওদেরকে বলতে হবে ইটন সোসাইটির সদস্য। মনে রেখো কথাটা।'

রানা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে, এই ছাত্র-সদস্যরা স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। পপের ছেলেদেরকে দেখলেই চেনা যায়—উজ্জ্বল রঙের ওয়েইস্টকোট পরে তারা... সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে ব্যতিক্রম। তা ছাড়া চালচলনে হামবড়া ভাব তো আছেই। এরা ছাড়াও প্রত্যেক হাউসের দেখাশোনার জন্য সিনিয়র কিছু ছাত্র আছে, তাদেরকে বলে *লাইব্রেরি*। তারা সবচেয়ে ক্ষমতাধর। বেয়াড়া জুনিয়রদেরকে শাস্তি দেবার অধিকার দেয়া

হয়েছে স্কুলের পক্ষ থেকে; তার জন্য কারও কাছে কৈফিয়ত বা জবাবদিহি করতে হয় না। সৌভাগ্যক্রমে এখনও সে-ধরনের শাস্তি পেতে হয়নি রানাকে।

'সবগুলো টিকেটের নাম বলতে পারবে তো?' প্রশ্নোত্তর-পর্ব চালু রাখছে মিং।

'আশা করি,' বলল রানা। না পারার কোনও কারণ নেই, টিকেট নামের চিরকুটগুলো ইটনের ছাত্রজীবনের তিক্ত, অথচ অবিচ্ছেদ্য অংশ। '*হাউস-টিকেট* হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের পরে হাউস থেকে বেরুবার অনুমতি-পত্র। *লিভ টিকেট* লাগে ছুটিতে যাবার জন্য। *হোয়াইট টিকেট* দেয়া হয় ছোটখাট কোনও ভুলত্রুটি করলে... আর *ইয়েলো টিকেট* বরাদ্দ থাকে বড় বড় অপরাধগুলোর জন্য।'

'চমৎকার!' প্রশংসা করল ডেভিড। 'একদম ঠিক বলেছ।'

মৃদু হেসে চিকেন সসেজে কামড় বসাল রানা। আজ সসেজ আর ডিম ভাজি খাচ্ছে ওরা—দুটোই রান্না করা হয়েছে হাউসের টেরাসে বসানো ইলেকট্রিক স্টোভে... মেইড জ্যানেটের কড়া নজরদারির মাঝে। বিকেলের নাশতা এমনিতে হয়তো জরুরি কিছু নয়, কিন্তু ডার্নফোর্ডের ব্যাপারটা ভিন্ন। পুরো স্কুলের সবচেয়ে জঘন্য খাবার রান্না হয় এই হাউসে। কাজেই বিকেলের নাশতায় দুটো ভালমন্দ মুখে না দিলে খিদেয় মরতে হয়। এখানকার সব ছাত্রই তাই স্কুলের স্টোর বা শহরের দোকান থেকে বাড়তি রসদ কিনে আনে নাশতা তৈরির জন্য।

'*অ্যাব্রোকাড্যাব্রা* কী?' আবার প্রশ্ন এল মিঙের কাছ থেকে।

'উমম... স্কুলের বেসিক অ্যাকাডেমিক টাইমটেবল।'

'বাহ্! কিছু দিয়েই আটকানো যাচ্ছে না দেখছি তোমাকে!' হাসল মিং। 'পাক্কা ইটনিয়ান হয়ে উঠেছ এ-ক'দিনেই।'

'আরে নাহ্,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'স্রেফ

কিছু টার্মিনোলজি শিখেছি। এখানকার নিয়মকানুন আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগবে। কোন্ নিয়ম যে কেন করা হয়েছে, সেটাইবোঝা মুশকিল।'

'সমস্যাটা তোমার একার না,' ডেভিড বলল। 'কেউই ওসব বোঝে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। এমনিতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না ওর। প্রথম দু-তিনদিন একটু কষ্ট হয়েছে ইটনের রুটিন, নিয়মকানুন আর লেখাপড়ার সিস্টেম বুঝে নিতে; তারপর থেকেই আস্তে আস্তে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে নিজেকে। বুদ্ধিমান ছেলে ও, ছাত্র হিসেবে প্রথম সারির না হলেও মন্দ নয় একেবারে। বিদেশ-বিভুঁইয়ের স্কুলেও তাই তাল মেলাতে বিশেষ সমস্যা হচ্ছে না।

এতকিছুর পরেও জায়গাটা আপন লাগছে না ওর। হ্যাঁ... এখানকার ভাষা শিখছে, এখানকার ইউনিফর্ম পরছে... তবু কেন যেন নিজেকে বহিরাগতের মত লাগে। সবচেয়ে অসহ্য লাগে ভিড়টা। যেখানে যায়, সেখানেই শত শত ছেলে। এত মানুষের জটলা ভাল লাগে না ওর। এমনিতেই একটু আত্মকেন্দ্রিক ও, অনাথ হবার পর আরও গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে, একাকী থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু ইটনে সে-সুযোগ নেই। তার ওপর রয়েছে নিয়মকানুনের বাড়াবাড়ি। যেন পায়ে শেকল পরিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে।

খাওয়া শেষ হয়েছে মিঙের। প্লেট নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'কালার্স টেস্ট নিয়ে আর চিন্তা না করলেও চলবে। আমার ধারণা, তুমি বেশ ভালমতই উৎরে যাবে, রানা।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' সায় দিল ডেভিড।

'থ্যাঙ্কস,' রানা বলল। 'তবে এখানে তাল মেলানো সহজ না। সবকিছুই আমার জন্য নতুন। এর আগে খুব সাধারণ একটা

স্কুলে পড়তাম আমি। ওখানে এতসব নিয়মকানুন বা ঐতিহ্যের বালাই ছিল না।'

'কোথায় সেটা?' জানতে চাইল মিং। 'তোমার দেশে?'

'হ্যাঁ। ঢাকা নামের চমৎকার একটা শহরে।'

'ওখান থেকে চলে এলে কেন? তোমার বাবা-মা...'

'বলবার মত কিছু না,' রানা থামিয়ে দিল মিংকে। আসলে চাইছে না পিতৃ-মাতৃহীন হবার প্রসঙ্গটা উঠে আসুক। 'ধরে নাও আরও ভালমত লেখাপড়ার জন্য ভর্তি হয়েছি এখানে। আফটার অল, ইটনের মত নামকরা জায়গায় কে না পড়তে চায়?'

'তুমি পড়ো কখন?' বিরক্ত গলায় বলল ডেভিড। 'সারাক্ষণ তো দেখি দৌড়াও। ম্যারাথনে অংশ নেবার ইচ্ছে? আর কোনও খেলাতেও তো দেখি না।'

কথাটা ভুল নয়। স্কুলে হাজারো খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকলেও রানার একমাত্র আগ্রহ দৌড়ানোতে। শুধু গেমস টাইম নয়, অবসরের সময়গুলোতেও রানিং শু পরে বেরিয়ে পড়ে ও... দৌড়ায় পুরো ক্যাম্পাসে। খেলাধুলায় আগ্রহ নেই ওর, মিশতে চায় না কারও সঙ্গে; নিঃসঙ্গ স্বভাবটার সঙ্গে খেলা জাতীয় কিছু মেলাতে গেলে দৌড়ের বিকল্প নেই।

'এত দৌড়ানোর কোনও মানে হয়?' মিং বলল। 'তোমাকে দেখেই তো ভাল স্পোর্টসম্যানের মত লাগে, রানা। আমাদের সঙ্গে ফুটবল বা ক্রিকেটে জয়েন করলেই পারো।'

'দৌড়াতে ভাল লাগে আমার,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'এমন আজব কথা জীবনে এই প্রথম শুনলাম আমি,' বোকা বোকা গলায় বলল মিং।

আর তখুনি সশব্দে টোকা পড়ল দরজায়।

'মিং হুলিয়াং! তুমি কি এখানে?'

ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল চিনা কিশোর। গলাটা চিনতে

পেরেছে। হলব্রুক—হাউসের একজন লাইব্রেরি। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজা খুলল।

'এত সময় লাগল কেন দরজা খুলতে?' কর্কশ গলায় বলল হলব্রুক।

'কই... সঙ্গে সঙ্গেই তো খুললাম...'

'চুপ! মুখে মুখে কথা বলবে না। একটা কাজ আছে তোমার জন্যে।' মিঙের হাতে একটা খাম গুঁজে দিল হলব্রুক। 'এই মেসেজটা জন হ্যালেটকে পৌঁছে দিয়ে এসো। সে এখানকার স্কলার।'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ, এখুনি। হাউস-টিকেট সই করিয়ে এনেছি, উপরে নিজের নামটা বসিয়ে এ-মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ো।'

মিংকে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল লাইব্রেরি। আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে চলে গেল। করুণ চেহারা নিয়ে বন্ধুদের দিকে ফিরল চিনা কিশোর।

'অবস্থা দেখলে? ফুট-ফরমাশ খাটাবার প্রয়োজন হলেই আমার কথা মনে পড়ে শয়তানটার। অসময়ে এসব ফালতু কাজে যেতে ভাল লাগে কারও?'

'খামটা আমাকে দাও,' হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি।'

'না, না, সে কী... তুমি যাবে কেন?'

'অসুবিধে হবে না কোনও। এমনিতেও জগিঙে যাবার কথা ভাবছিলাম। দাও তো!' মিঙের হাত থেকে খাম আর হাউস-টিকেট নিয়ে নিল রানা। চটপট নিজের নাম লিখল টিকেটে।

'থ্যাঙ্কস, রানা,' মিং বলল।

'দূর! এ আর এমন কী। খাওয়া শেষ হলে তোমরা কাপ-প্লেটগুলো গুছিয়ে রেখো। আমার ফিরতে একটু সময় লাগতে

পারে।'

বেরিয়ে পড়ল রানা। জুডি'স প্যাসেজ সুনসান, নিস্তব্ধ। ছোট ছোট কদমে দৌড়াতে শুরু করল। উপভোগ করছে সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশ। বার্নিং বুশের সামনে গিয়ে রাস্তা পেরুল। তারপর আর্চওয়ে ধরে ঢুকে পড়ল স্কুল-ইয়ার্ডে। স্কলাররা... মানে ইটনের অ্যাকাডেমিক এলিটেরা... কলেজ বিল্ডিঙে থাকে—ওটা ইটনের আদি ভবন, ১৪৪৩ সালে রাজা ষষ্ঠ হেনরির বানানো। ঠিক কোন্ এণ্ট্র্যান্স ধরে বিল্ডিংটায় ঢুকতে হয়, তা জানা নেই রানার। আশপাশে নজর বোলাল, জিজ্ঞেস করবার মত কাউকে পাওয়া যায় কি না খুঁজছে। কিন্তু নেই কেউ।

করণীয় ঠিক করতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ও। একটু পরেই শোনা গেল পায়ের আওয়াজ আর মানুষের কণ্ঠ। তিনটে ছায়ামূর্তি উদয় হলো ইয়ার্ডে। ধূসর চুল আর লম্বা আলখেল্লা দেখে ড. আর্লিংটনকে চিনতে পারল—তিনি স্কুলের হেডমাস্টার। আরও দু'জন রয়েছে তাঁর সঙ্গে। একজন স্কুলেরই ছাত্র। ড্যানি—প্রথমদিন সকালে রানাকে যে-ছেলেটি হুমকি দিয়েছিল। তৃতীয়জন অচেনা, তবে তাঁর পরিচয় আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না।

ড্যানিরই পরিণত সংস্করণ যেন ভদ্রলোক, তবে আরও নিখুঁত। অত্যন্ত সুদর্শন। ঠোঁটেখান্দানি একটা ঝোলানো গোঁফ। মাথাভরা সোনালি চুল। লম্বায় ছ'ফুটের ওপর, বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। নিঃসন্দেহে ড্যানির বাবা। ব্যক্তিত্ববান মানুষ—পুরো অবয়ব থেকে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা।

হাঁটতে হাঁটতে হেডমাস্টারের কী এক কথা শুনে উঁচু গলায় হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হলো পুরো স্কুল-ইয়ার্ডে। হেডমাস্টারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে অবাক হলো রানা। যে-মানুষটার ভয়ে পুরো স্কুল তটস্থ, তিনিই কিনা কাঁচুমাচু হয়ে

আছেন সাধারণ এক ছাত্রের পিতার সামনে। মনে হচ্ছে আচমকা তিনি ছেলেবেলার হিরোর দেখা পেয়ে গেছেন... এমনই ড্যানির বাবার ব্যক্তিত্ব। বিশালদেহী ভদ্রলোকের প্রতিটি পদক্ষেপ... প্রতিটি আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে অঢেল ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আভাস। যেন পৃথিবীকে জয় করবার জন্যই জন্ম হয়েছে তাঁর, প্রাচীন কোনও রোমান সম্রাটের মত। গায়ের পোশাকটাও যেন ক্ষমতা জাহির করছে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা কোট পরেছেন তিনি, আঁটসাঁট প্যান্টের পায়া গুঁজে রাখা হয়েছে চকচকে, কালো বুটজোড়ার মধ্যে। দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও জেনারেলের সাজ।

ছায়ার মধ্যে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হেডমাস্টার দেখে ফেললেন ওকে। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'কে ওখানে?'

ইতস্তত করে এগিয়ে এল রানা। 'আ... আমি মাসুদ চৌধুরি রানা, স্যর।'

'রানা?' ভ্রূকুটি করলেন ড. আর্লিংটন। 'ও, মনে পড়েছে। নতুন এসেছ, তাই না? তুমি তো বোধহয় জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরির ছেলে?'

'জী, স্যর।'

'ইমতিয়াজ চৌধুরি?' বলে উঠলেন ড্যানির বাবা। 'অক্সফোর্ডে আমার সঙ্গে এই নামে এক বাঙালি ছেলে পড়ত। সে নয়তো?'

'জী, স্যর,' আবার বলল রানা। 'আপনি আমার বাবার সহপাঠী ছিলেন?'

'সহপাঠী না, সমসাময়িক। ও আইন বিভাগে ছিল, আমি কেমিস্ট্রিতে। তবে আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ নিয়মিতই হতো। খেলাধুলায় আমার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ও... বিশেষ করে বক্সিঙে।'

'তা-ই?'

'হুঁ। চমৎকার মানুষ ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তাকে সম্মান করতাম আমি। খাঁটি পুরুষ ছিল তোমার বাবা। জাস্টিস... মানে বিচারপতি হয়েছে এখন? কেমন আছে?'

'ইয়ে...' বাবার মৃত্যুর খবর কীভাবে বলবে, ভেবে পেল না রানা।

ওর জবাবের জন্য অপেক্ষা করলেন না ড্যানির বাবা। বলে চললেন, 'আমি একেবারে অন্য লাইনে চলে গেছি, বুঝলে? অবশ্য তোমার বাবার সঙ্গে নীতিগত পার্থক্য সেই ছাত্রজীবন থেকেই ছিল। ও বিশ্বাস করত আইনের শাসনে, আর আমি... পেশিশক্তিতে। তাই আজ ও বিচারপতি, আর আমি দুনিয়ার প্রথম সারির একজন অস্ত্র-ব্যবসায়ী।' হেসে ফেললেন তিনি। 'এনিওয়ে, পরিচিত হয়ে ভাল লাগল। আমি লর্ড রেজিনাল্ড গ্রিফিন।' করমর্দন করলেন তিনি। 'এ হলো আমার ছেলে—ড্যানিয়েল গ্রিফিন। হয়তো চেনো ওকে।'

বাঁকা চোখে ড্যানির দিকে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছে আমাদের।'

দাঁতে দাঁত পিষল ড্যানি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রানাকে দেখছেন লর্ড গ্রিফিন। 'ভাবছি তুমিও ইমতিয়াজের মত কি না।' ঝুঁকলেন ওর দিকে। 'ওর মত দৌড়াতে পারো তুমি? সাঁতার কাটতে পারো? না লড়তে?'

তাঁর গরম নিঃশ্বাস পড়ল রানার মুখে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। মনে হলো যেন একটা বুনো সিংহ ওর উপর হামলে পড়েছে। অশুভ এক অনুভূতি। লর্ড গ্রিফিনের শ্বাস-প্রশ্বাস আর চেহারায় মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছে ও। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মানুষটা নিষ্ঠুর... এবং ভয়ঙ্কর! এত কাছে মুখ নিয়ে এসেছেন, তাঁর কালো, শীতল চোখদুটোর মণি দেখতে পাচ্ছে ও; সেখানে

দয়ামায়ার কোনও স্থান নেই। সারা শরীর থেকে উত্তাপ ছড়াচ্ছেন তিনি—ঘুমন্ত এক আগ্নেয়গিরির মত—যেন যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবেন। এই লোকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ওর বাবা; বোঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে পরাস্তও করেছেন; সেজন্যে কি চাপা কোনও ক্ষোভ রয়েছে লর্ডের মনে? এমন করছেন কেন?

অস্বস্তিকর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁটজোড়া প্রসারিত হলো লর্ড গ্রিফিনের, দেখা গেল ঝকঝকে দাঁতের সারি। হাসছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বক্সিং জানো তুমি, মি. রানা?'

'সামান্য,' নিচু গলায় বলল রানা।

'চমৎকার! তা হলে প্রমাণ করো, যোগ্য বাপের কতখানি যোগ্য ছেলে তুমি।' সোজা হয়ে বক্সারদের মত রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত তুললেন গ্রিফিন। 'এসো, ঘুষি মারো আমাকে।'

কী করবে বুঝতে পারল না রানা। পাগল নাকি লোকটা? অনুমান করল, ওর বাবার কাছে বক্সিঙে হেরেছিলেন গ্রিফিন... এখন সেই জ্বালা মেটাতে চাইছেন ওকে লজ্জা দিয়ে। মানা করে দেবে কি না ভাবল। আড়চোখে তাকাল হেডমাস্টারের দিকে, কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না।

'কই, এসো!' হুকুমের সুরে ডাকলেন গ্রিফিন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুর্বল একটা ঘুষি ছুঁড়ল রানা। অনায়াসে হাতের তালু দিয়ে সেটা ঠেকিয়ে দিলেন তিনি। খোঁচা মারা সুরে বললেন, 'ব্যস, এ-ই? এটুকুই তোমার গায়ের জোর?' হেডমাস্টারের দিকে ঘাড় ফেরালেন। 'আপনার ছাত্ররা মেয়েদের মত নাজুক হয়ে পড়ছে, ড. আর্লিংটন; মনে হয় লুকোচুরি আর গোল্লাছুট ছাড়া আর কিছু খেলতে জানে না। বক্সিঙের মত পুরুষালি খেলা তো নয়ই। ওয়েল... অবস্থাটার পরিবর্তন ঘটাব আমি।' রানার দিকে

তাকালেন আবার। 'তুলতুলে হাতের মুঠোটা শক্ত করো, বাছা। যত জোরে পারো, ঘুষি মারো আমাকে। কাম অন!'

রাগে-অপমানে চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে রানার। এক পা এগিয়ে সর্বশক্তিতে হাঁকাল ঘুষি। আর ঠিক তখুনি ড্যানিও ডেকে উঠল 'বাবা' বলে। বোধহয় পিতার কর্মকাণ্ডে বিব্রত হয়েই দিল সে ডাকটা। কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল লর্ড গ্রিফিনের। ছুটে আসা ঘুষিটা আর ঠেকাতে পারলেন না, সরাসরি রানার মুঠি আঘাত হানল তাঁর বাম চোয়ালে। ঝট করে মাথাটা ঘুরে গেল একদিকে।

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। ঘটনাটা এতই অপ্রত্যাশিত, রানা নিজেও থমকে গেছে। একই দশা ড. আর্লিংটন আর ড্যানির। ব্যথাটা সয়ে নেয়ার জন্য কয়েক সেকেণ্ড ওভাবে স্থির রইলেন লর্ড গ্রিফিন, তারপর ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। দু'চোখে আগুন জ্বলছে, যেন ভস্ম করে দেবেন ওকে। নিজের অজান্তেই দু'পা পিছিয়ে গেল রানা।

হঠাৎ হেসে উঠলেন গ্রিফিন। কৌশলে চাপা দিলেন চেহারার ক্রোধটা, যদিও তার আগেই যা দেখবার দেখে ফেলেছে রানা। সহজ সুরে বললেন, 'আমার অসতর্ক অবস্থার সুযোগ নিয়েছ তুমি, মি. রানা।' চোয়াল ডললেন। 'তবে ঘুষিটা জবরদস্ত মেরেছ। তোমার ব্যাপারে ভবিষ্যতে সাবধান থাকতে হবে!'

'আমাদের মনে হয় এবার যাওয়া উচিত, লর্ড গ্রিফিন,' তাড়াতাড়ি বললেন ড. আর্লিংটন। 'সাপারের দেরি হয়ে যাচ্ছে। মি. রানাকেও তার হাউসে ফিরতে হবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বলে সোজা হলেন গ্রিফিন। বিদায় নেবার সৌজন্যে গেলেন না। ঘুরে গটমট করে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর পিছু নিলেন হেডমাস্টার।

যাবার আগে এক মুহূর্ত স্থির রইল ড্যানি। ক্রুদ্ধ চোখে যেন

মাপল রানাকে। দৃষ্টিতে নীরব হুঁশিয়ারি। তারপর সে-ও অনুসরণ করল পিতাকে।

খানিক পরে স্কলার জন হ্যালেটকে খুঁজে বের করল রানা। তার হাতে তুলে দিল খামটা। ওটা নিয়ে মুচকি হাসল হ্যালেট। বলল, 'জানালা দিয়ে তোমাকে দেখছিলাম আমি। ঘুষি একটা মেরেছ বটে! দারুণ মজা পেয়েছি।'

'আমি পাইনি,' বলল রানা শুকনো গলায়। 'আমার ধারণা, খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছি।'

চার

'তুমি তৈরি, রানা?'

'জী, স্যর।'

'আজ কিন্তু খুব খাটাব তোমাকে।'

'অসুবিধে নেই, স্যর,' হাসল রানা। 'রোজই তো খাটান।'

'টিচারদের মুখে মুখে কথা বলা ঠিক না, রানা,' ভ্রূ কুঁচকে বললেন মি. স্যালিসবারি। 'আর কোনও টিচার হলে এতক্ষণে তোমাকে পুরো স্কুল চক্কর দিতে পাঠাত।'

'সরি, স্যর।'

'হুম... আমিই বা পাঠাই না কেন? যাও, মাঠের চারদিকে চার ল্যাপ দেবে। গো!'

'ইয়েস, স্যর!'

ছোট ছোট কদমে দৌড়াতে শুরু করল রানা। কিছু মনে করেনি, দৌড়াতে ভালই লাগে ওর। অনুভূতিটা অন্য রকম—প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে শরীরের পেশিগুলোর কম্পন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আর ফুসফুসের আকুতি। কেটে যায় শরীরের জড়তা। সত্যি বলতে কী, দৌড়ানোর সময় নিজেকে যতটা জীবন্ত মনে হয়, আর কিছুতে হয় না।

দৌড়বিদ হিসেবে কতটা ভাল রানা, তা আগে কখনও বোঝেনি; কিন্তু ইটনে আসার কয়েকদিন পরেই ওর এই গুণটি নজর কেড়েছে মি. স্যালিসবারির। এমনিতে ক্লাসিকসের শিক্ষক তিনি, পাশাপাশি রানার লেখাপড়ার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো—স্কুলের অ্যাথলেটিক্স বিষয়ক ইনচার্জ তিনি।

হাসিখুশি মানুষ মি. স্যালিসবারি। প্রশান্ত চেহারার অধিকারী। নাকটা স্বাভাবিকের চেয়ে চোখা। সবসময় পাইপ টানেন। রানা খুব পছন্দ করে তাঁকে। ছাত্রদেরকে খুব মায়া করেন ভদ্রলোক, সবসময় কড়া নজর রাখেন তাদের সুবিধে-অসুবিধের প্রতি। স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষকের মাঝেই এ-গুণটি নেই। তা ছাড়া পড়ানোর কাজটিতেও তিনি আন্তরিক; ভালবাসেন পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় নিয়ে গল্প করতে।

খেলাধুলার প্রতি মি. স্যালিসবারির রয়েছে আলাদা টান। তাঁর মুখেই রানা শুনেছে, এককালে পেশাদার অ্যাথলিট ছিলেন ভদ্রলোক; দেশের হয়ে অলিম্পিকের ম্যারাথনে অংশ নিয়ে ব্রোঞ্জ মেডেলও পেয়েছেন। একটা ছোট্ট দুর্ঘটনার শিকার হয়ে খেলোয়াড়ি জীবনের অকাল-অবসান ঘটেছে তাঁর, নতুন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতাকে। একই সঙ্গে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন স্কুলের ছাত্রদেরকে অ্যাথলেটিক্সের কোচিং করাতে। সমস্যা হলো, ইটনে আদর্শ রানিং ট্র্যাক নেই। বাৎসরিক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতার কিছু ইভেন্ট ছাড়া বাকি সব ধরনের দৌড়াদৌড়ি করতে হয় রাস্তায়। অগত্যা বিকল্প খুঁজে বের করেছেন তিনি—*ডাচম্যান'স ফার্ম* নামের এক টুকরো জমি বেছে নিয়েছেন সম্ভাবনাময় দৌড়বিদদেরকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। রানা সেটারই অংশ।

বিষণ্ন পরিবেশ বিরাজ করছে আজ। ধূসর, ভারী কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে মাঠ। সূর্যের দেখা নেই, তাপমাত্রাও অনেক কম। এ-ধরনের আবহাওয়ায় মন বিষণ্ন হয়ে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু রানার সেটা হচ্ছে না। ফুরফুরে মেজাজে ছুটে চলেছে ও, যেন সদ্য উড়তে শেখা কোনও পাখি। নিশ্চিন্ত, বন্ধনহীন।

বেশ দ্রুতই মি. স্যালিসবারির বেঁধে দেয়া চারটা ল্যাপ শেষ করল ও। কিন্তু তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলেন না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একেবারে মন্দ না, কিন্তু তোমার স্ট্যামিনা আরও বাড়াতে হবে, রানা। তা হলে, আমার ধারণা, লং ডিসট্যান্স রানিঙে খুব ভাল করবে তুমি।'

একটু কুঁজো হয়ে হাঁপাচ্ছিল রানা। বলল, 'লং ডিসট্যান্স, স্যর? স্প্রিন্ট নয়?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন স্যালিসবারি। 'স্প্রিন্ট হলো লোক-দেখানো, বাহবা কুড়ানোর খেলা। যোগ্যতার সত্যিকার মাপকাঠি হলো দূরত্ব। তুমি বেশ লম্বা, বড় বড় কদম ফেলতে পারো... এটা একটা বড় সুবিধে। এখন যদি স্রেফ স্ট্যামিনা বাড়াতে পারো, পুরো স্কুলে আর কেউ তোমার সঙ্গে লং ডিসট্যান্সে পাল্লা দিতে পারবে না।'

কী বলবে ভেবে পেল না রানা। হঠাৎ ওকে ম্যারাথনের দৌড়বিদ বানাতে চাইছেন কেন স্যালিসবারি, ঠিক বুঝতে পারছে না।

ওর দ্বিধাটুকু টের পেয়ে মুচকি হাসলেন স্যালিসবারি।

‘গোপন একটা খবর তোমাকে দিতে চাই, রানা,’ বললেন তিনি, ‘যদি কথা দাও, সেটা তুমি কারও কাছে ফাঁস করবে না।’

‘কথা দিলাম, স্যর,’ বলল রানা। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

‘গুড।’ নিভে যাওয়া পাইপটা নতুন করে ধরালেন স্যালিসবারি। ‘তা হলে শোনো... এই টার্মের শেষে বিশাল এক স্পোর্টিং ইভেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে, তাতে লং ডিসট্যান্স রানিং থাকছে। আমি চাই, তুমি সেটায় অংশ নেবে। তাই ভালমত ট্রেনিং করতে হবে তোমাকে।’

‘ঠিক কী ধরনের ইভেন্ট, স্যর?’

‘এখানকারই এক ছাত্রের বাবা নতুন একটা ইটন ট্রফির প্রবর্তন করতে চলেছেন—স্পেসিফিক্যালি লোয়ার স্কুলের জন্য। ওটায় ভাল করবার সম্ভাবনা আছে তোমার... বিশেষ করে দৌড়ে।’

‘ট্রফি জেতার জন্য দৌড়াতে হবে?’

‘শুধু দৌড় না, অল-রাউণ্ড কম্পিটিশন। ওতে শক্তি, গতি, সাহস, প্রাণশক্তি আর মার্কস্‌ম্যানশিপ... সবকিছুর পরীক্ষা নেয়া হবে।’

‘ঠিক বুঝলাম না, স্যর।’

‘এক ধরনের ট্রায়াথলন, রানা... তিনটে খেলার মিশেল। দৌড়, সাঁতার আর শুটিং। একই দিনে, পর পর অংশ নিতে হবে সবক’টায়।’

‘সাঁতার, স্যর?’ কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। ‘শীতকালে?’

শ্রাগ করলেন স্যালিসবারি। ‘হ্যাঁ, পাগলামি আর কী। প্রশ্ন হলো, ওতে তুমি শামিল হবে কি না।’

হাসল রানা। ‘চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই আমার।’

‘চেষ্টা?’ স্যালিসবারিও হাসলেন। ‘সাবাস! এ-ই তো চাই। বলা তো যায় না, গ্রিফিন কাপটা তুমিও জিতে যেতে পারো।’

'গ্রিফিন কাপ!' একটু অবাক হলো।

'হ্যাঁ। ড্যানি গ্রিফিনকে চেনো তুমি?'

'জী, চিনি,' সংক্ষেপে বলল রানা। বলল না যে আমেরিকান ছেলেটা ওর জীবনে শনিগ্রহ হয়ে উঠেছে। সেদিনের পর থেকেক্রমাগত জ্বালিয়ে মারছে বদমাশটা। টিটকিরি; আজেবাজে কথা ছড়ানো, গালিগালাজ... যখন যা পারছে করছে। একবার দুই সাগরেদকে নিয়ে ধাওয়াও করেছিল ওকে, ধরতে পারেনি। অতিষ্ঠ হয়ে যতটা পারে তাকে এড়িয়ে চলছে রানা, কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব হয় না। পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

'ট্রফির উদ্যোক্তা ওর বাবা,' বলে চলেছেন স্যালিসবারি, 'লর্ড রেজিনাল্ড গ্রিফিন। ভয়াবহ রকমের ধনী মানুষ, অস্ত্র-ব্যবসা করে কোটি কোটি পাউণ্ডের মালিক হয়েছেন। শেষে স্কটল্যাণ্ডে এসে কিনে নিয়েছেন বিশাল সম্পত্তি আর স্থানীয় লর্ডশিপ উপাধি। ওখানেই থাকেন। দরাজদিল মানুষ, বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মোটা অঙ্কের ডোনেশন দেন। সেটা ভালমানুষি, নাকি লোক-দেখানো, কে জানে! কেন যেন লোকটাকে পছন্দ হয় না আমার।'

অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। সেদিন সন্ধ্যায় স্কুল-ইয়ার্ডে পুরুষালি খেলা প্রচলনের কথা বলছিলেন লর্ড গ্রিফিন। নিশ্চয়ই এই ট্রায়াথলনের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তিনি। হেডমাস্টার কেন তাঁকে অত তোয়াজ করছিলেন, তাও পরিষ্কার। নিশ্চয়ই নতুন ট্রফি প্রবর্তন বাবদ স্কুলে মোটাসোটা ডোনেশন দিচ্ছেন গ্রিফিন।

'ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েকদিন আগে দেখা হয়েছে আমার, স্যর,' রানা বলল। 'আমারও ওঁকে খুব একটা সুবিধের লোক বলে মনে হয়নি।'

'এ-ধরনের মানুষের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে,'

স্যালিসবারি উপদেশ দিলেন। 'কখনও যেচে মিশতে বা লাগতে যেয়ো না।' গলা খাঁকারি দিলেন তিনি। 'যাক গে, যথেষ্ট বিশ্রাম কি হয়েছে তোমার? তা হলে আবার দৌড়াও। মাঠের চারদিকে... এবার ছ'টা চক্কর দেয়া চাই।' টাইমারে চাপ দিলেন তিনি।

মিংকে নিয়ে পরদিন বিকেলে ইটনের সুইমিং স্পটগুলো দেখতে বেরুল রানা। প্রথমে যে-জায়গাটায় গেল, সেটার নাম রাখা হয়েছে *অ্যাথেন্স*। উইণ্ডসর রেসকোর্সের উল্টোপাশে, টেমস নদীর তীরে স্পটটা। কংক্রিটের ছোট একটা মঞ্চ আছে ওখানে ডাইভ দেবার জন্যে।

'এই মঞ্চের নাম অ্যাক্রোপলিস,' মিং জানাল। 'বিতিকিচ্ছি এক তাল কংক্রিটের জন্য বড্ড শানদার নাম, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে রেখেছে,' বলল রানা। মঞ্চের কিনারে গিয়ে উঁকি দিল নদীতে। পানিটা লালচে, দুধছাড়া চায়ের মত... বেশ ঘন। স্রোত আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। এই শীতকালে পানি কী পরিমাণ ঠাণ্ডা হতে পারে, ভেবে আতঙ্ক অনুভব করল রানা। ইটনে কোনও সুইমিং পুলও নেই। নদীতেই নাকি সাঁতার কাটে সবাই।

বন্ধুর মনের কথা পড়তে পেরে হাসল মিং। বলল, 'শুধু শক্তি আর স্ট্যামিনা থাকলে হবে না, রানা। ঠাণ্ডা পানি সইবার জন্য গণ্ডারের চামড়াও থাকা চাই—মি. স্যালিসবারি বোধহয় কথাটা বলেননি তোমাকে।'

গতকাল রাতেই ট্রফির কথা ওকে খুলে বলেছে রানা। মি. স্যালিসবারি মানা করে দিলেও ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারেনি, ওর বয়সী ছেলের জন্য চেপে রাখা কঠিনই... অন্তত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে। তা ছাড়া বিষয়টা খুব সিরিয়াস কিছুও নয়। তবে বলবার আগে মিঙের কাছ থেকে কথা আদায় করেছে—সে যেন কাউকে

খবরটা না বলে। সব শোনার পর মিং নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে, সুইমিং স্পটগুলো দেখিয়ে দেবে রানাকে, যাতে ও প্র্যাকটিস শুরু করতে পারে।

অ্যাথেন্স থেকে ছোট একটা খাঁড়ির মত জায়গায় গেল দু'জনে, ওটার নাম *ওয়ার্ড'স মিড*। এখানে সাঁতারের আয়োজন মোটামুটি ভাল—ডাইভিং বোর্ড আর প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে নদীর তীরে। ওয়ার্ড'স মিড থেকে কিছুদূর গেলে *কাকু ওয়েয়্যার*। ওটা অভিজ্ঞ সাঁতারুদের জন্য। স্রোত ওখানে কিছুটা শক্তিশালী, অভিজ্ঞ হলেও ছাত্রদেরকে সাঁতার কাটতে হয় একজন ওয়াচম্যানের তত্ত্বাবধানে।

'আরেকটা স্পট আছে *রমনি ওয়েয়্যার* নামে,' নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল মিং। 'তবে সেটা একেবারে সেরা সাঁতারুদের জন্য।'

'ট্রফিতে আদৌ অংশ নেব কি না সেটাই ভাবছি,' রানা বলল। 'নদীর অবস্থা দেখে ভয়ই করছে।'

'গ্রীষ্মকাল হলে অসুবিধে ছিল না, তখন পানিতে দাপাদাপি করতে ভালই লাগে আমাদের। শীতকাল বলেই...'

'প্রতিযোগিতাটাই আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে।' লাথি দিয়ে নদীতে এক টুকরো পাথর ফেলল রানা। 'দৌড়, সাঁতার আর শুটিং... ট্রায়াথলন হলে সাইক্লিং থাকার কথা, শুটিং না।'

'এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই,' মন্তব্য করল মিং।

'মানে?'

'এমন তিনটে ইভেন্ট নির্বাচন করা হয়েছে, যেগুলোয় ড্যানি গ্রিফিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ট্রফিটা যাতে ও পায়, সেটাই নিশ্চিত করা হচ্ছে আসলে।'

ভ্রূকুটি করল রানা। 'ড্যানি ভাল সাঁতারু। ভাল দৌড়ায় এটাও শুনেছি। কিন্তু শুটিং?'

‘ওতেও ওর হাতের টিপ নাকি অসাধারণ। ছুটির পুরো সময়টাই শুনেছি ওদের স্কটল্যাণ্ডের এস্টেটে পাখি শিকার করে বেড়ায়। তোমার টিপ কেমন? কখনও বন্দুক চালিয়েছ?’

‘একবার। বাবার সঙ্গে বুনোহাঁস শিকারে গিয়েছিলাম। তবে একটাও মারতে পারিনি।’

‘তা হলে তো কিছুই পারো না।’

হাসল রানা। ‘উড়ন্ত হাঁসের গায়ে লাগাতে পারিনি; তাই বলে স্থির একটা টার্গেটে লাগাতে পারব না... নিশানা অত খারাপ না আমার।’

‘তা হলে তো ভালই।’

একটা বাঁক পেরিয়ে এল দু'বন্ধু। দেখা পেল নদীর তীরে উবু হয়ে বসে থাকা একজন মানুষের। মাছ ধরছে। মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হলো না—বুড়ো জ্যাকারি। ইটনেরই এক বয়স্ক কর্মচারী; স্কুলের কিছু বোট আছে, সেগুলোর দেখাশোনা করে। শীতকালে নদী-সংশ্লিষ্ট রুটিন কম থাকায় এখন তার হাতে অফুরন্ত অবসর, সময় কাটাচ্ছে মাছ ধরে।

ছোটখাট গড়নের মানুষ জ্যাকারি, হাড় জিরজিরে শরীর। নাকের নিচে পেল্লায় এক গোঁফ। একটু পাগলাটে স্বভাবের হলেও খুব ভালমানুষ, সবাই তাকে পছন্দ করে। বুড়োর বয়স কত কেউ জানে না। রানা শুনেছে, বেশ ক'জন সহপাঠীর বাবারাও নাকি ছাত্রাবস্থায় তাকে দেখে গেছে এখানে... তখনও ঠিক একই চেহারা ছিল বুড়োর।

‘কী ধরছ, জ্যাকারি?’ কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মিং।

‘এখুনি দেখতে পাবে,’ ওদের দিকে না তাকিয়ে বলল বুড়ো। দু'হাত ব্যস্ত পানিতে ফেলে রাখা সুতো টানায়।

একটু পরেই টোপটা তুলে আনল সে। না, সাধারণ কোনও টোপ বা বড়শি নয়। উল পেঁচিয়ে কীভাবে যেন একটা বল

বানিয়েছে সে, সেটায় আটকে গিয়ে অসহায়ভাবে ঝুলছে কতগুলো ঈল মাছ! বিচ্ছিরি চেহারা সবক'টার, রানার গা শিরশির করে উঠল।

'অদ্ভুত তো!' বিস্ময়ের সুরে বলল মিং। 'বড়শি ছাড়া একসঙ্গে এতগুলো মাছ ধরলে কী করে?'

'আমার নিজস্ব কৌশল,' গর্বের সুরে জানাল জ্যাকারি। 'এক তাল কেঁচো নিয়ে চারপাশে উল দিয়ে জাল বুনি। লোভ সামলাতে পারে না ঈলেরা। কেঁচো খেতে এসে উলের জালে আটকে যায়।' ধরা পড়া মাছগুলো দেখল সে। 'আজ বেশ ভাল সাইজের পেয়েছি দেখা যাচ্ছে! খেতে ভালই লাগবে।'

রানার চেহারায় মেঘ জমেছে। 'তারমানে শুধু ঠাণ্ডা বা নোংরা পানিতে সাঁতার কাটব না আমি? সাঁতার কাটব এই জঘন্য চেহারার মাছগুলোর মাঝেও?'

'ঈলেরা কারও ক্ষতি করে না,' জ্যাকারি বলল। মাছগুলো একটা ছোট বালতিতে রাখছে এক এক করে। 'একদম নিরীহ। ওদেরকে ভয় পাবার কিছুই নেই।'

'চেহারা দেখলেই তো ভক্তি উঠে যায়। আপনি এগুলো খাবেন?'

'অবশ্যই। ঝোল দিয়ে রান্না করলে খেতে খুব মজা। এসো, দেখাই।'

কাছেই জ্যাকারির কুঁড়েঘর। বুড়োর পিছু পিছু সেখানে গেল দু'বন্ধু। অবাক হয়ে দেখল, হাতুড়ি আর পেরেক নিচ্ছে লোকটা। বালতি থেকে মোটাসোটা একটা মাছ তুলে ওটার মাথায় পেরেক ঠুকে ঝুলিয়ে দিল ঘরের দেয়ালে। এরপর ছুরি দিয়ে ঝুলন্ত ঈলের গলার চারপাশটা একটু কেটে নিল। সবশেষে একটা প্লায়ার্স দিয়ে এক ঝটকায় খোসার মত ছাড়িয়ে আনল চামড়াটা। বেরিয়ে এল ঈলের চকচকে মাংস।

'সুন্দর না?' এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করল জ্যাকারি।

কথা বেরুল না রানা বা মিঙের গলা দিয়ে, শুধু মাথা ঝাঁকাল দু'জনে।

'একটু অপেক্ষা করো, এখুনি চুলোয় চড়াচ্ছি মাছটা। সবাই মিলে মজা করে খাব।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। হাউসে ফিরতে হবে। পরে নাহয় কখনও খাব।'

বিদায় নিয়ে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'বন্ধু।

'কী ভাবছ?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল মিং। 'এরপরেও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে?'

ঢোক গিলল রানা। খুব যে ইচ্ছে করছে তা নয়, কিন্তু পিছিয়ে যাবার পাত্র ও নয়। বলল, 'কেন নয়? আগামীকাল থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করব আমি।'

পাঁচ

পরদিন বিকেল।

কাঁপছে রানা। কাঁটা দিচ্ছে সারা শরীর, যেন জ্যাকারির ঈলের মত ওরও চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে কেউ। দু'হাত ঘষল কাঁধ আর বুকে—যতটা পারে গরম করে নিতে চায়। সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে থাকায় মনে হলো যেন শিরিষ কাগজে ঘষা খেল হাতের তালু। এখনও পানিতে নামেনি, তাতেই এই অবস্থা...

নামলে কী হবে ভাবতেও ভয় করছে।

ওয়ার্ড'স মিডের একটা নিচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে ও। তাকিয়ে আছে পানির দিকে। পানি তো নয়, যেন ডার্নফোর্ড হাউসের ডাইনিং হলে পরিবেশন করা সুপ... বরফশীতল সুপ!

'এতকিছু না ভেবে ঝাঁপ দাও, বাপু,' বিড়বিড় করে নিজেকে বলল ও। 'ভাবতে থাকলে আর পারবে না।'

প্ল্যাটফর্মের ডগায় গিয়ে কুঁজো হলো ও, দু'হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল পায়ের পাতা। শ্বাস নেবার জন্য অপেক্ষা করল এক মুহূর্ত, তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে। ফুলঝুরি ছিটিয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে। ঠাণ্ডা পানি যেন একটা গদার মত আঘাত করল ওকে, জমে যেতে চাইল শরীর। তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠল সারফেসে। একেবারে হাড়-মজ্জায় গিয়ে হামলা করছে ঠাণ্ডাটা, শরীরের প্রতিটা জয়েন্ট টনটন করে উঠছে। পানি ছেড়ে উঠে পড়ার তীব্র তাড়নাটা গলা টিপে মারল; বুঝতে পারছে, টিকে থাকার একমাত্র উপায় হলো সাঁতার শুরু করা।

তা-ই করল রানা। ধীরে ধীরে নাড়তে শুরু করল হাত-পা, সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতরে চলল মিডের অন্য তীর লক্ষ্য করে। ওখানে পৌঁছে থামল না, তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরল, ফিরে এল প্ল্যাটফর্মের কিনারায়। পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকল।

আকাশে মেঘ জমেছে। তার ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্যের কিরণ। গতকালকের তুলনায় আজ তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে, তবে এটাও সাঁতার কাটবার জন্য উপযুক্ত নয়। তবু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিন সপ্তাহ বাকি প্রতিযোগিতার, এর মাঝে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে এই পরিবেশের সঙ্গে, নইলে জিতবার কোনও আশা নেই।

তিনটে ল্যাপ দেবার পর অনেকটাই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল রানা। পানির সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রা মানিয়ে গেছে। আরামদায়ক বলা

যাবে না, তবে ঠাণ্ডাজনিত অসাড়তা আর নেই। আরও কয়েকটা ল্যাপ দিল ও। শেষে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এল পাড়ের দিকে। উঠে পড়বে।

দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরের অর্ধেকটা ওঠাল ও, আর তখুনি কে যেন ওর বুকে পা ঠেকিয়ে দিল প্রচণ্ড এক ধাক্কা। চিৎ হয়ে ঝপাস করে পানিতে পড়ল ও। এক দফা হাবুডুবু খেয়ে ভেসে উঠল, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল আক্রমণকারীর দিকে।

ড্যানি গ্রিফিন। দাঁত বের করে কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসছে মিডের পাড়ে দাঁড়িয়ে।

'কালো চামড়া দেখে ভাবছিলাম বুঝি ঈল,' বলল সে। 'এখন দেখছি স্কুলের বাঙালি ভূতটা! হাই, ম্যাসাড রানা চন্দ্রি!'

'হ্যালো, ড্যানি,' রাগ চাপা দিয়ে শান্ত গলায় প্রত্যুত্তর দিল রানা। এগোল পাড়ের দিকে।

পা তুলে আবারও ধাক্কা দেবার ভঙ্গি করল ড্যানি। জিজ্ঞেস করল, 'যাচ্ছ কোথায়?'

'আমাকে হাউসে ফিরতে হবে। পথ ছাড়ো।'

'সবকিছুতেই তোমার তাড়া, রানা। এসব ভাল নয়। মাত্র তো এলাম। একটু থাকো। গল্পগুজব হোক।'

'আমার শীত করছে। গল্প করবার মুড নেই। আমি উঠব।'

'তা হলে তো ওঠাই উচিত। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আজ আমি এখানকার ইনচার্জ। আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমাকে পানিতে থাকতে হবে।' হাঁটু গেড়ে বসল ড্যানি। রানার দিকে বকের মত গলা বাড়িয়ে ফিসফিস করল, 'আর অনুমতি পাবার জন্য তোমাকে ছোট্ট একটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।'

ছেলেটার নীল দু'চোখে শয়তানি খেলা করছে। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর কড়া গলায় বলল, 'বাজে

কথা রাখো, ড্যানি। তুমি মোটেই এখানকার ইনচার্জ নও। অমন কোনও নিয়ম নেই।'

'আমিই নিয়ম, আমিই আইন!' উদ্ধত গলায় বলল ড্যানি। 'বলেছি যখন, আমিই এখানকার ইনচার্জ। যদি পারো তো চ্যালেঞ্জ করো।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে সামলাল রানা। ড্যানি একা নয়, পিছনে দেখা যাচ্ছে তার তিন সাগরেদকে—ডেনিস, ন্যাট আর পারকার... শেষেরজন নতুন জুটেছে এই দলে। একের বিরুদ্ধে চার, মারামারি লাগলে নির্ঘাত পিটিয়ে তক্তা বানাবে। অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও জানতে চাইল, 'কী করতে হবে আমাকে?'

'নিজেকে ভাল সাঁতারু ভাবো তুমি, তাই না, রানা?' বাঁকা সুরে বলল ড্যানি। 'কিন্তু এই মড়ার স্কুলে আমার মত একটা সাঁতারুও দেখিনি আজ পর্যন্ত। সাঁতারু না, চাইলে আমাকে মাছও বলতে পারো। এক অর্থে পানিতেই বড় হয়েছি আমি।'

'অত বড়াই না করলেও চলবে,' দাঁতের ঠোকাঠুকি যতটা পারে ঠেকিয়ে বলল রানা। 'সবাই জানে, তুমি খুব ভাল সাঁতারু।'

'ভাল? হাহ্!' অবজ্ঞা প্রকাশ পেল ড্যানির কণ্ঠে। 'সেরা সাঁতারু, রানা। সবার সেরা! রেস করে দেখতে চাও?'

'এখন না, ড্যানি।'

'কিন্তু ওটাই যে তোমার পরীক্ষা, রানা! তোমাকে একটা সুইমিং রেসে জিততে হবে।'

'তোমার সঙ্গে রেসে নামার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

'আমার কথা তো বলিনি। আমার লেভেলে আসতে আরও তিন জনম লাগবে তোমার। না, আমি না... তোমার জন্যে অন্য প্রতিযোগী আনা হয়েছে।' ঘাড় ফিরিয়ে শিস বাজাল ড্যানি।

ঝোপের আড়াল থেকে সুইমিং ট্রাঙ্ক পরা নতুন এক কিশোর

বেরিয়ে এল। ওকে চেনে রানা। জিম বুচার—মোটাসোটা, হাসিখুশি এক ছেলে... স্কুলের ব্রাস ব্যাণ্ডে ট্রাম্পেট বাজায়। ক'দিন আগে স্কুল হলে মিউজিক সোসাইটির একটা কনসার্ট ছিল, সেখানেই ওকে দেখেছে রানা, পরিচয়ও হয়েছে।

'হ্যালো, রানা,' মিনমিন করে বলল জিম। বোঝা গেল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে আসতে হয়েছে তাকে।

'হ্যালো, জিম,' সম্ভাষণ জানাল রানাও।

'কুশল বিনিময় পরে করলেও চলবে,' বেরসিকের মত বলে উঠল ড্যানি। 'কাজের কথায় আসি। বুচারের সঙ্গে রেসে নামতে হবে তোমাকে, রানা।'

ভ্রূকুটি করল রানা। মোটাসোটা জিমকে দেখে মোটেই ভাল সাঁতারু বলে মনে হয় না। তা হলে? মতলব কী ড্যানির?

'কী, রাজি?' বলে জিমের পিঠে সজোরে চাপড় মারল ড্যানি। ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল বেচারার। 'বুচার বনাম রানা। যে হারবে...' একটু বিরতি নিল ড্যানি, ...সে তার ইউনিফর্মের হ্যাট খোয়াবে।'

জিমকে দেখল রানা, ছেলেটা মাথা নিচু করে রেখেছে। রেসে নামবার কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে, কিন্তু ভয়ে ড্যানিকে কিছু বলতেও পারছে না।

'দুর্দান্ত একটা রেস হবে, বুঝলে?' ড্যানি বলে চলল। 'তবে তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, রানা, এই মোটুরামকে আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। ব্যাটা ঘাগু সাঁতারু।'

'এত জ্ঞান দেবার প্রয়োজন নেই,' রানা বলল। 'আমি রাজি নই তোমার প্রস্তাবে।'

যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ড্যানির শরীরে। সাপের মত ছোবল দিল তার হাত, মুঠো করে ধরল রানার চুল, ওর মাথা চেপে ধরল পানির নিচে। অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না

রানা, হাঁ করে থাকা মুখে ঢুকে পড়ল নদী তীরের কাদাগোলা পানি। যখন মুক্তি পেল, তখন কাশছে বেদম। নোংরা পানি পেটে ঢোকায় বমি হয়ে যাবার দশা।

'সাঁতার তোমাকে কাটতেই হবে, রানা!' হুকুমের সুরে বলল ড্যানি। 'নইলে আমি ও আমার বন্ধুরা তোমার মাথাটাকে ফুটবল বানিয়ে খেলব। বোঝা গেছে?'

রাগে মাথায় আগুন জ্বলছে রানার, কিন্তু এখন সেই রাগ প্রকাশ করে লাভ হবে না। দাঁতে দাঁত পিষে ও বলল, 'ঠিক আছে, আমি সাঁতরাব।'

'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে!' হাততালি দিল ড্যানি। 'উঠে এসো পানি থেকে। পজিশন নাও।'

প্ল্যাটফর্মে উঠল রানা আর জিম। দাঁড়াল পাশাপাশি। ঠাণ্ডা অনেকটাই সয়ে এসেছে রানার, কিন্তু জিম রীতিমত কাঁপছে। কৌতূহল অনুভব করল রানা, কীসের হুমকি দিয়েছে ওকে ড্যানি? মারধরের, নাকি অন্য কিছু?

'তৈরি তোমরা?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ড্যানি। ইতিবাচক জবাব পেয়ে বলল, 'একটাই ল্যাপ দেবে—এপার থেকে ওপারে যাবে আর আসবে। যে-হারবে, তাকে জরিমানা গুনতে হবে। ক্লিয়ার?'

মন খুঁতখুঁত করছে রানার। সোজাসাপ্টা রেস হবার কথা না, কারণ অনায়াসেই জিমকে হারাতে পারবে ও। নিশ্চয়ই কোনও প্যাঁচ আছে এর মাঝে। কিন্তু কী সেটা?

'অন ইয়োর মার্কস!' চেঁচাল ড্যানি। 'গেট সেট...'

পরেরটুকু আর বলল না সে, থেমে গেল আচমকা। জিম পুরোটা শোনার অপেক্ষা করেনি, ঝাঁপ দিল পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল ড্যানি ও তার সাগরেদরা। পানি থেকে বোকার মত ইতি-উতি চাইল জিম। তারপর অপরাধীর মত উঠে

এল।

'তুমি কি সত্যিই রেস করাতে চাও, নাকি ঠাট্টা-মশকরার জন্য দাঁড় করিয়েছ আমাদেরকে?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'আয়্যাম ড্যাম সিরিয়াস, রানা,' বলল ড্যানি। 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম কিনা...'

'কী কথা?'

'পানির তলা দিয়ে এগোতে হবে তোমাকে, ভাসতে পারবে না।'

'মানে?'

'মানে রেসটা ডুবসাঁতারের। যখনই মাথা তুলবে পানি থেকে, ধরে নেবে রেস খতম।'

'আর যদি দু'জনেই মাথা তুলি?'

'যে-এগিয়ে থাকবে, সে জিতবে। সিম্পল।'

জিমের দিকে তাকাল রানা, ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে নিল। তারমানে আগে থেকেই জানত ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই ভাল ডুবসাঁতার পারে সে—এটাই ড্যানির প্যাঁচ।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। দুশ্চিন্তা করল না। ও নিজেও অনেকটা সময় দম ধরে রাখতে পারে। ড্যানি যদি ভেবে থাকে ও ডুবসাঁতারে কাঁচা, তা হলে মস্ত ভুল করছে।

'রেডি... সেট... গো!'

ড্যানির কাউন্টডাউনের সঙ্গে সঙ্গে একত্রে নদীতে ঝাঁপ দিল রানা আর জিম। ঠাণ্ডাটার জন্য তৈরি ছিল রানা, কিন্তু ডুবসাঁতার দিতে গিয়ে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলো। ঘোলা পানিতে প্রায় অন্ধের মত এগোতে হচ্ছে ওকে, যেন ঘন কুয়াশার ভিতর হাতড়ে বেড়াচ্ছে পথ। খসখসে কিছু ঘষা খেল গায়ে—পানির তলার আগাছা, নাকি ঈল? কাঁটা দিয়ে উঠল চামড়ায়।

কিছু সময় কাটল। কতদূর এগিয়েছে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না রানা। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, ওপারে পৌঁছুনোই কঠিন হতে চলেছে ওর জন্য, উল্টো ঘুরে ফিরে আসা তো অনেক পরের কথা। দম ইতিমধ্যে ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। জিম কোথায় কে জানে, শুরুতে আবছাভাবে ওর অবয়ব দেখেছিল, তারপর থেকে আর সাড়া নেই।

অবস্থা ধীরে ধীরে সঙ্গীন হয়ে উঠছে রানার। মনে হচ্ছে নাক-কান দিয়ে তরল লোহা ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ, ভারী হয়ে উঠেছে মাথা। ইচ্ছে করছে ভেসে উঠতে... বুক ভরে বাতাস টেনে নিতে। স্রেফ গোয়ার্তুমি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখছে ইচ্ছেটা। হাত-পা নাড়ছে দ্রুত, ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে তীরবেগে ছুটছে। দম ফুরোবার আগেই যতটা পারে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাড়তি খাটুনির কারণে অচিরেই ফুরিয়ে গেল ফুসফুসে ধরে রাখা সব অক্সিজেন। শুরু হলো অসহ্য জ্বালাপোড়া, সেই সঙ্গে মাথায় দপদপে ব্যথা। সবকিছু অগ্রাহ্য করে আরও কিছুটা এগোল রানা, তারপর আর সম্ভব হলো না। আর এক বিন্দু বাতাস নেই ফুসফুসে। সারা শরীর বিদ্রোহ করছে, নাড়তে পারছে না হাত-পা। নিজের অজান্তেই গিলে ফেলল কয়েক ঢোক পানি। সঙ্গে সঙ্গে খিঁচুনি উঠল দেহে।

কাশতে কাশতে ভুস করে ভেসে উঠল রানা। প্রথম কয়েক মুহূর্ত বাহ্যিক জ্ঞান বলতে কিছু রইল না। হাঁপানির রোগীর মত জোরে জোরে শ্বাস টানছে ও। একটু ধাতস্থ হয়ে চারপাশে চোখ বোলাল। সঙ্গে সঙ্গে দমে গেল হৃদয়। দিক হারিয়ে ট্র্যাক ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছে ও, উল্টোদিকের পাড়ের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু জিম কোথায়? চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল নদীর বুকে।

ওই তো... তীরের কাছে পানি ছিটকাচ্ছে ছেলেটার পায়ের

আঘাতে। তবে ভেসে ওঠেনি, এখনও ডুবসাঁতার কাটছে। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর পৌঁছে গেল পাড়ের কাছে। তাও মাথা তুলল না। পানির তলা দিয়েই উল্টো ঘুরল, ফিরে চলল স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। যত দেখল ততই মুগ্ধ হলো রানা। ভুলে গেল আশু-পরাজয়ের কথা, শুনতে পেল না ওকে উদ্দেশ্য করে ড্যানি ও তার সঙ্গীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ... দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে পানির সারফেসে আলোড়নের দিকে। আশ্চর্য জিমের দম! পারছে কীভাবে এতক্ষণ শ্বাস না নিয়ে থাকতে। ছেলেটা মানুষ, নাকি মৎস্যপুত্র!

মনে হলো পুরোটাই ডুবসাঁতার দিয়ে পাড়ি দেবে জিম, তবে শেষ পর্যন্ত সেটা হলো না। স্টার্টিং পয়েন্টের ছ'গজ দূরে ভেসে উঠল সে। দমে কুলোয়নি। তারপরেও যা দেখিয়েছে তা প্রশংসার দাবিদার।

'ওয়েল ডান, বুচার!' বলে উঠল ড্যানি। 'খেলা দেখালে বটে! ব্রাভো।'

সাঁতার কেটে ওদের দিকে এগোল রানা। হেরেছে তাতে দুঃখ নেই, তাড়াতাড়ি পানি থেকে উঠতে পারলে বাঁচে। ঠাণ্ডাটা আর সহ্য হচ্ছে না। কিনারে গিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই ফের ওর মাথার চুল খামচে ধরল ড্যানি। বলল, 'এত তাড়া কীসের? হেরেছ যখন, তার মাশুল একটু গুনতে হবে না?'

বাধা দেবার সময় পেল না রানা। আবার ওর মাথা পানির নিচে চেপে ধরল ছেলেটা। আগেরবার চুবিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল, এবার আর ছাড়ল না। মাথাটা ধরে রাখল পানির তলায়।

অস্থির হলো না রানা। মুক্তি পাবার জন্য তড়পালে খুশি হবে ড্যানি, আনন্দ পাবে ওর দুরবস্থা দেখে। তারচেয়ে শান্ত থাকা ভাল। এক সময় হাল ছেড়ে দেবে ড্যানি। ওকে তো আর ডুবিয়ে মারবে না!

সত্যিই কি তা-ই? কয়েক মুহূর্ত কাটল। রানাকে ছাড়ল না

ড্যানি। পেরুল আরও কয়েকটা মুহূর্ত। না, পাথরের মত অটল ড্যানির হাত। আর চুপ করে থাকা সম্ভব না, দম নেই রানার বুকে। শরীর মোচড়াল খানিকটা। সুবিধে করতে পারল না। ড্যানির হাতের জোর অনেক বেশি। উপরে মাথা তোলা সম্ভব না। একটাই বিকল্প দেখল রানা, সেটাই বেছে নিল অগত্যা।

খপ করে দু'হাতে ড্যানির কবজি চেপে ধরল ও। টান দিল নিজের দিকে। তাল হারিয়ে ঝপাস করে পানিতে আছড়ে পড়ল ড্যানি। হাসির রোল পড়ল সবার মধ্যে, তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য। ড্যানি ভেসে উঠতেই নেমে এল পিনপতন নীরবতা। ততক্ষণে ডাঙায় উঠে এসেছে রানা, কাশছে। ঘাড় কাত করে দেখল, ভাঁটার মত জ্বলছে ড্যানির দু'চোখ। অপমানে মাথায় রক্ত চড়ে গেছে তার।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল সে সাগরেদ-বাহিনীর উদ্দেশে। 'ধর্ ওই বাঙালি কুত্তাটাকে! আজ ওর একদিন কি আমার একদিন।'

কিছুই করবার সুযোগ পেল না রানা, দু'পাশ থেকে ওকে চেপে ধরল ডেনিস, ন্যাট আর পারকার। টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাল ওকে। একটু যুঝল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। তিনজনের বিরুদ্ধে ও একা পারবে কী করে?

পানি থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে এল ড্যানি। সুদর্শন মুখ বিকৃত হয়ে গেছে ঘৃণায়। একটু ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁটজোড়া, দেখা যাচ্ছে দাঁত। ভদ্রতার খোলস ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে হিংস্র এক জানোয়ার।

'কাজটা ঠিক করোনি, রানা,' কাছে এসে হিসিয়ে উঠল সে।

'আর তুমি যেটা করছিলে, সেটা বুঝি খুব ঠিক ছিল?' রাগী গলায় বলল রানা।

'এত বড় সাহস!' দাঁত কিড়মিড় করল ড্যানি। 'আবার মুখে মুখে কথা?'

হাত চালাল সে। গায়ের সব শক্তি দিয়ে ঘুষি মারল রানার তলপেটে। ককিয়ে উঠল রানা, দম আটকে এল। ড্যানির সাগরেদরা ওকে ছেড়ে দিতেই উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। শঙ্কিত চোখে দেখল, দু'পা পিছিয়ে গেছে ড্যানি... ফুটবলের মত ওকে লাথি মারবে এখুনি।

'অ্যাই, কী হচ্ছে ওখানে?' হঠাৎ ভেসে এল একটা নতুন কণ্ঠ।

একযোগে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ছেলেরা। কোত্থেকে যেন উদয় হয়েছে বুড়ো জ্যাকারি। ভুরু কুঁচকে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল ড্যানি, এই প্রথমবারের মত তার চোখে ভয় ফুটতে দেখল রানা। ভাবছে ও নালিশ করবে। জ্যাকারি এখানকার টিচার না হলেও অফিশিয়াল স্টাফ। শৃঙ্খলাভঙ্গের রিপোর্ট দিতে পারে কর্তৃপক্ষের কাছে। সেক্ষেত্রে ঘাড় ধরে ড্যানিকে বের করে দেয়া হবে ইটন থেকে।

মুচকি হাসল রানা, অভয় দিল ড্যানিকে। আর যা-ই হোক, নালিশ করার বান্দা নয় ও। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

'শরীর ভেজা কেন তোমাদের?' কাছে এসে পালা করে রানা, জিম আর ড্যানির দিকে তাকাল জ্যাকারি। 'পানিতে নেমেছিলে?'

'সামনে একটা কম্পিটিশন আছে, জ্যাকারি,' রানা বলল। 'তাই প্র্যাকটিস করছিলাম।'

'তুমিও?' ভ্রূকুটি করে ড্যানির ভেজা ইউনিফর্মের দিকে তাকাচ্ছে জ্যাকারি। 'এই পোশাকে?'

'না... মানে...' আমতা আমতা করল ড্যানি।

'দোষটা আমার,' বলে উঠল রানা। 'রগে টান পড়েছিল। ড্যানি পানিতে লাফিয়ে পড়ে আমাকে উঠিয়ে এনেছে। কাপড় খোলার সময় ছিল না।'

'সত্যি?' জ্যাকারির কণ্ঠে সন্দেহ।

'ইয়ে... হ্যাঁ,' গলা খাঁকারি দিয়ে সুর মেলাল ড্যানি।

সন্দেহ দূর হলো না জ্যাকারির, কিন্তু বিষয়টা নিয়ে আর ঘাঁটালও না। শুধু বলল, 'বেশ, খুব ভাল। এখন যাও, ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল ড্যানি। তাকে অনুসরণ করল ন্যাট, ডেনিস আর পারকার।

'তোমরা যাবে না?' রানা আর জিমকে জিজ্ঞেস করল জ্যাকারি।

'আমাদের কাপড় এখানেই আছে,' রানা জানাল।

'হুম। কী ঘটেছিল আসলে, আমাকে বলা যায়?'

'যা বলেছি তা-ই।'

শান্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জ্যাকারি। তারপর শ্রাগ করে উল্টো ঘুরে চলে গেল।

প্ল্যাটফর্মের পাশে রাখা নিজের ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে গা মুছল রানা। তারপর ওটা বাড়িয়ে ধরল জিমের দিকে।

'কিছু বললে না কেন?' জিম জানতে চাইল।

'নিজের ঝামেলা নিজেই সামলাতে চাই আমি,' রানা বলল। 'অন্য কাউকে টানতে চাই না এসবের মাঝে।'

'আমি দুঃখিত, রানা,' ইতস্তত করে বলল জিম। 'আমি আসলে তোমার সঙ্গে রেস দিতে চাইনি। ড্যানিই...'

'আমি সেটা বুঝতে পেরেছি,' রানা বাধা দিল। 'কিন্তু একটা কথা বলো তো... তুমি এত সময় দম ধরে রাখলে কীভাবে?'

'ট্রাম্পেট আর টিউবা বাজাই আমি,' ব্যাখ্যা করল জিম। 'তার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে হয়... ফুসফুসেরও জোর লাগে। স্পেশাল এক্সারসাইজ করি আমি।'

'বলো কী! এসবের এক্সারসাইজও আছে?'

'হ্যাঁ। আমার বাবাও মিউজিশিয়ান। বলতে গেলে জ্ঞান হবার

পর থেকেই নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখেছি আমি। দুর্ভাগ্য যে, ড্যানি সেটা জেনে গেছে। তোমার মত আমাকেও একদিন সাঁতারের সময় পানির তলায় ঠেসে ধরেছিল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরেও আমার কিছু না হওয়ায় ও বুঝে ফেলে, আমি অনেকটা সময় দম ধরে রাখতে পারি। সেই থেকে আমাকে এখানে-সেখানে নিয়ে গিয়ে নানা রকম বাজি ধরে। কী যে যন্ত্রণায় আছি, বলে বোঝাতে পারব না।'

'ব্যাটা পাক্কা বদমাশ!' সখেদে বলল রানা। 'ওকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'পারবে না। কখনও একা থাকে না, সবসময় দু-তিনটে চামচা নিয়ে ঘোরাফেরা করে। ওকে বাগে পাওয়া এক কথায় অসম্ভব।'

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না। তক্কে তক্কে থাকলে একটা না একটা সুযোগ পাবই।'

গা মুছে ইউনিফর্ম পরল দু'জনে। তারপর নদীর ধার ধরে ফিরে চলল হাউসের দিকে।

'জিম, যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, আমাকে তোমার ওই দম ধরে রাখার কৌশল শেখাবে?' একসময় বলে উঠল রানা।

'এর মধ্যে কোনও কৌশল নেই,' জিম বলল। 'পুরোটাই চর্চার ব্যাপার... ফুসফুসের এক ধরনের ব্যায়াম।'

'ওই ব্যায়ামই শেখাও না। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমার দৌড়াদৌড়িতেও উন্নতি হবে।'

'বেশ, শেখাব,' মাথা ঝাঁকাল জিম। 'কিন্তু রাতারাতি কোনও উন্নতি আশা কোরো না, সময় লাগবে।'

'আমার কোনও তাড়া নেই।'

পরদিন ক্লাসের ফাঁকে মি. স্যালিসবারির সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে

আলোচনা করল রানা।

'এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি দেখছি না,' বললেন তিনি। 'ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়াতে পারলে নিশ্চয়ই কম্পিটিশনে ভাল করবে তুমি। কীভাবে, আন্দাজ করতে পারো?'

'পারি, স্যর,' রানা বলল। 'অক্সিজেন হলো শরীরের কোষ আর পেশির জ্বালানি। বুকের ভিতর যখন বাতাস ঢোকে, ফুসফুস সেখান থেকে অক্সিজেন আলাদা করে নেয়, পাঠিয়ে দেয় রক্তনালীতে। রক্ত সেই অক্সিজেনকে নিয়ে যায় শরীরের বিভিন্ন কোষে এবং পেশিতে।'

'রাইট। তবে ভুলে যেয়ো না, অক্সিজেন সঞ্চালনের পাশাপাশি রক্ত থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডও টেনে নেয় ফুসফুস, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় শরীর থেকে। দুটোর মাঝে সমতা খুঁজে নেয়া জরুরি। ঘন ঘন শ্বাস টানলে বেশি অক্সিজেন যায় রক্তে, আবার কম টানলে ঘাটতি দেখা দেয়। দুটোই খারাপ... দুটোই কর্মক্ষমতা কমায় পেশির। অ্যাথলিটকে তাই শ্বাস নিতে হয় খুব হিসেব করে। যে-যত ভাল ব্রিদিং কন্ট্রোল পারে, তার পারফর্মেন্স ততই ভাল হয়। জিম বুচারের কাছ থেকে যদি কিছু শিখতে পারো তো শিখে নাও। কাজে দেবে।'

'জী, স্যর।'

'এবার তা হলে যাও। আগামীকাল প্র্যাকটিসের মাঠে দেখা হবে।'

নড়ল না রানা। ইতস্তত করে বলল, 'ইয়ে... স্যর...'

'আরও কিছু বলতে চাও?'

'না... মানে... ট্রফির ব্যাপারে একটা গুজব শুনছি, স্যর।'

'কী গুজব?'

'কম্পিটিশনটা নাকি ড্যানি গ্রিফিনকে জেতানোর জন্য আয়োজন করা হচ্ছে।'

‘কার কাছে শুনলে?’

‘স্কুলের ছেলেরাই বলাবলি করছে।’

হাসলেন স্যালিসবারি। ‘তোমার কি গুজবটা বিশ্বাস হচ্ছে না?’

জবাব দিল না রানা। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, ‘ওকে হারাবার মত কেউই কি নেই, স্যর?’

কাঁধ ঝাঁকালেন স্যালিসবারি। ‘থাকলেও আমার জানা নেই। ভাল দৌড়বিদ ও। লং ডিসট্যান্সে একটু সমস্যা আছে, তবে নতুন ক্রস-কান্ট্রি কোর্সটা মাত্র পাঁচ মাইলের। ওটুকুতে সবাইকে পিছে ফেলতে পারবে সহজেই। আর সাঁতারে ও আসলেই খুব ভাল। শুটিঙের খবর জানি না, তবে আমার অনেস্ট অপিনিয়ন হলো—ট্রফিটা জেতার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ওরই।’

‘এ তো অন্যায়!’ ফস করে বলে বসল রানা। ‘সাজানো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবে ও!’

‘বোকা ছেলে!’ নরম সুরে বললেন স্যালিসবারি। ‘দুনিয়ার হালচাল কিছুই জানো না তুমি। দুনিয়ার বেশিরভাগ প্রতিযোগিতাই সাজানো। দক্ষতা বা গুণ দিয়ে নয়, মানুষ ওতে জেতে টাকা আর ক্ষমতার জোরে। আর এই স্কুলে লর্ড গ্রিফিনের মত টাকাঅলা এবং ক্ষমতাবান অভিভাবক দ্বিতীয়টি নেই।’

‘তাই বলে...’

রানার মুখের কথা কেড়ে নিলেন স্যালিসবারি। ‘তাই বলে কী? সামান্য একটা ট্রফিই তো জেতাতে চাইছেন ছেলেকে? বিনিময়ে কত টাকা ডোনেশন দিচ্ছেন স্কুলে, জানো? আমি এতে খুব বড় কোনও সমস্যা দেখি না। তা ছাড়া প্রথমবারের মত ট্রায়াথলন চালু হচ্ছে স্কুলে... শুটিংটা না থাকলে ভাল হতো... তারপরেও নতুন ইভেন্টের সূচনা হিসেবে দেখছি পুরো প্রতিযোগিতাকে! স্কুলের রীতিনীতির পরিপন্থী কিছু তো ঘটছে না

এখানে।'

'তারমানে ভদ্রলোক ধোয়া তুলসীপাতা, স্যর?' মনঃক্ষুণ্ণ গলায় বলল রানা।

'তা বলছি না,' স্যালিসবারি হাসলেন। 'আফটার অল, আপাদমস্তক খাঁটি আমেরিকান লোকটা। সমস্যা তো আছেই।'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যর। আমেরিকানদের সমস্যা কোথায়?'

'গোঁয়ার এক জাত। পরাজয় সহ্য করতে পারে না। ছলে-বলে-কৌশলে... যেভাবে হোক জেতা চাই।'

'কথা তো একই দাঁড়াল, তাই না, স্যর? ট্রফিটা ড্যানির। আমরা বাকিরা খামোকাই কষ্ট করব।'

'খামোকা হতে যাবে কেন? ট্রফি তো এখনও জেতেনি ড্যানি। সমান সুযোগ থাকছে তোমার সামনে।'

'সাঁতার আর শুটিঙে আমার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়।'

'সেক্ষেত্রে দৌড়ের দিকে মনোযোগ বাড়াও। ওটায় তো ভাল ফাইট দিতে পারবে, তাই না?'

'চেষ্টার কোনও ত্রুটি করব না, স্যর।'

মৃদু হাসলেন স্যালিসবারি। 'চেষ্টা? উঁহুঁ। রেসটা তোমাকে জিততে হবে, রানা। বুঝেছ?'

ছয়

'আমি এমন এক দেশের মানুষ, যেখানে কেউ ক্রিকেট খেলে না,'

উদাত্ত গলায় বললেন লর্ড গ্রিফিন। নাটকীয়তার জন্য বিরতি নিলেন একটু। 'সত্যি বলতে কী... তিক্ত কথার জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি... ক্রিকেটকে আমরা খুবই নাজুক একটা খেলা বলে মনে করি। ওতে না প্রয়োজন শক্তি... না স্ট্যামিনা।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল ক্রিকেটপ্রেমী ছাত্রদের মাঝে। প্রিয় খেলা সম্পর্কে এমন কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় কেউ।

পাশ থেকে রানাকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে মিং বলল, 'এই নাজুক খেলা খেলতে গিয়েই ওঁর গুণধর পুত্রের খবর হয়ে গেছে। প্রথম দিনেই বল লেগে এমন ব্যথা পেয়েছে যে ভয়ে আর কোনোদিন ক্রিকেটের মাঠমুখো হয়নি ড্যানি।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। ওরা দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের রাইফেল রেঞ্জে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে বহু-প্রতীক্ষিত গ্রিফিন কাপ। শেষ মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে ভাষণ শুরু করেছেন লর্ড গ্রিফিন।

'খেলাধুলাকে আমি দেখি সত্যিকার পুরুষ গড়বার পন্থা হিসেবে,' বলে চলেছেন তিনি। 'খেলার মাধ্যমে শক্তিশালী হয় ছেলেরা, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। বলা হয়ে থাকে, এককালে এই ইটনের মাঠ ছিল ওয়াটারলুর যুদ্ধ-ময়দান। সেই যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু সামনে আরও বহু যুদ্ধ অপেক্ষা করছেতোমাদের জন্য। তার জন্য চাই শক্তিশালী, লড়াকু পুরুষ। এখানেই তৈরি করে নিতে হবে তাদেরকে।' পায়চারি শুরু করলেন লর্ড। 'বাইরের পৃথিবী অত্যন্ত কঠিন, সেখানে লড়তে হবে তোমাদেরকে। যদি না লড়ো, মরতে হবে! হ্যাঁ, আমি সত্যিকার মৃত্যুর কথাই বলছি। নিজ চোখে দেখেছি আমি সেসব মৃত্যু। দেখেছি কীভাবে পড়ে থাকে বেওয়ারিশ লাশ। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সেগুলোকে। পচে-গলে গন্ধ ছড়ায়, অথচ সৎকার করবার জন্য কাউকে পাওয়া যায় না...'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা আর মিং। কী বলছেন এসব লর্ড গ্রিফিন। স্কুলপড়ুয়া অল্পবয়সী ছেলেদের এমন বীভৎস বর্ণনা শোনানোর মানে কী!

লর্ড গ্রিফিনের ভাষণ তখনও শেষ হয়নি। তিনি বললেন, 'ভয়ঙ্কর সেসব দৃশ্য দেখে অনেকেই পাগল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি হইনি...'

'উনি কি শিওর?' নিচু গলায় ফিসফিসাল ডেভিড।

আর ঠেকানো গেল না, ফিক করে হেসে ফেলল রানা। ক্ষণিকের জন্য থেমে ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন গ্রিফিন, তারপর ফিরে গেলেন ভাষণে।

'ওসব দেখে জীবনের কঠিন এক সত্য অনুধাবন করেছি আমি। বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে কেউ কারও নয়। এখানে টিকে থাকতে হলে নিজের চেষ্টায় থাকতে হবে... যে-কোনও ধরনের সাফল্য পেতে হলেও নিজেকেই যা করার করতে হবে। কাজেই যোগ্য করে তুলতে হবে নিজেকে—শক্তির দিক দিয়ে, দক্ষতার দিক দিয়ে। অন্যথায় পড়ে থাকতে হবে সেই সব অচেনা লাশের মাঝে। আজকের এই প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে যোগ্য করে তুলবার প্রথম ধাপ। শুভকামনা রইল তোমাদের সবার জন্য। আমি গ্রিফিন কাপের উদ্বোধন ঘোষণা করছি!'

হাততালির ঝড় বয়ে গেল।

গত ক'দিনে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে বেশ। আকাশে ঝলমল করছে সূর্য, ঠাণ্ডাও কেটে গেছে অনেকটা। আজ শনিবার; প্রতিযোগিতা উপলক্ষে উৎসবমুখর হয়ে আছে পরিবেশ। শুধু অংশগ্রহণকারীরা নয়, দর্শক হিসেবেও এসেছে অনেক ছেলে। শুটিং রেঞ্জের একপাশে জমায়েত হয়েছে সবাই। মিং আর ডেভিড এসেছে রানাকে উৎসাহ দেবার জন্য। ওদের ক্লাসের আর কোনও প্রতিযোগী নেই। ট্রফিতে যারা অংশ নিচ্ছে, সবাই রানার চেয়ে

অন্তত দু-বছরের সিনিয়র।

প্রতিযোগিতার প্রথম ইভেন্ট শুটিং। নির্ধারিত পজিশন থেকে দূরে ঝোলানো কাগজের টার্গেটে গুলি ছুঁড়তে হবে। উদ্বোধনী ঘোষণা শেষ হতেই শুটিং রেঞ্জের ইনচার্জ, রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন উইলকিন্স একে একে নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন প্রতিযোগীদের। গুলির আওয়াজে ভরে গেল রেঞ্জের বাতাস।

একটু পরেই এল রানার পালা। শুটিং পজিশনে যেতেই ওর হাতে একটা পয়েন্ট টু-টু বোরের রাইফেল তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন উইলকিন্স। ওটা নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও।

নার্ভাসভাবে শুরু করল রানা। তবে খানিক পরেই মজা পেয়ে গেল, অভ্যস্ত হয়ে গেল রাইফেলের আচরণে। ট্রিগার চাপলেই পিছনদিকেমৃদু একটা ধাক্কা দেয় অস্ত্রটা, গুলির আওয়াজ আর কর্ডাইটের গন্ধ রীতিমত উপভোগ করতে লাগল ও। জায়গামত লাগাতে পারলে উত্তেজনা অনুভব করছে... না পারলে অনুভব করছে হতাশা।

শুটিং শেষ হলে প্রশংসা করলেন ক্যাপ্টেন উইলকিন্স। 'ভাল শুটিং করেছ, মি. রানা। চমৎকার স্কোর।' টার্গেট-শিটটা ওর হাতে তুলে দিলেন তিনি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানা। আসলেই ভাল হয়েছে শুটিং—বুলস-আই-এ লেগেছে তিনটে গুলি, বাকিগুলোও রয়েছে কাছাকাছি। মিস করেনি বললেই চলে। এত ভাল করবে নিজেও আশা করেনি।

'নিশানা চমৎকার তোমার,' উইলকিন্স বললেন। 'সহজাত দক্ষতার ছাপ দেখতে পাচ্ছি।'

'ওসব কিছু না,' বিব্রত গলায় বলল রানা। 'ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছি।'

'উঁহুঁ। শুধু ভাগ্য নয়, তুমি জাত শুটার। চর্চা করলে অনেক

ভাল করবে। শুটিং ক্লাবে তোমাকে পেলে খুশি হব আমি।'

হৈচৈ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে রাজনৈতিক নেতার মত এগিয়ে আসছে ড্যানি গ্রিফিন। এবার ওর পালা। সাগরেদরা স্লোগান দিচ্ছে তার নামে।

ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ করালেন ক্যাপ্টেন উইলকিন্স। তারপর এগিয়ে গিয়ে রাইফেল ইস্যু করলেন ড্যানির হাতে। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দক্ষ ভঙ্গিতে চেক করে দেখল ড্যানি, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নির্ধারিত জায়গায়। রাইফেলের বাট কাঁধে ঠেকিয়ে টার্গেটের দিকে তুলল। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ব্যারেলের উপর দিয়ে। পুরোদস্তুর পেশাদার সৈনিকের মত ভাবভঙ্গি। তার স্থির, আত্মবিশ্বাসী আচরণ দেখে একটু অস্বস্তি অনুভব করল রানা। বাপের এস্টেটে কত নিরীহ প্রাণী যে খুন হয়েছে ছেলেটার হাতে, কে জানে!

পায়ে পায়ে একটা পিলারের আড়ালে সরে গেল রানা। ওয়ার্ড'স মিডের ঘটনার পর থেকে ড্যানিকে এড়িয়ে চলছে ও। কী দরকার সেধে ঝামেলা কাঁধে নেবার! ওকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কোনও না কোনও ছুতো খুঁজে নির্ঘাত ঝগড়া বাধাবে।

কড়াৎ করে আওয়াজ হলো—প্রথম গুলিটা করেছে ড্যানি। বোল্ট টেনে খালি শেল-কেসিং বের করে আনল, চেম্বারে ভরল নতুন বুলেট। সময় নিয়ে নিশানা করল, তারপর ট্রিগার চাপল দ্বিতীয়বারের মত। একে একে আরও আটটা গুলি করবার পর শেষ হলো তার শুটিং। ধীর-স্থির আর শান্তভাবে ছুঁড়েছে প্রতিটা গুলি, নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে। মনে মনে তার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো রানা।

টার্গেট-শিট খুলে আনলেন ক্যাপ্টেন উইলকিন্স। ড্যানি ও তার সঙ্গীরা ঘিরে ধরল তাঁকে। ফলাফল দেখতে পেল না রানা,

শুধু দেখল, হুল্লোড় করে উঠেছে ছেলেরা। পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে ড্যানির। নিশ্চয়ই খুব ভাল স্কোর করেছে।

যেভাবে নিয়ে এসেছিল, সেভাবেই স্লোগান দিতে দিতে ড্যানিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল সাগরেদরা। সাফল্যের আনন্দে মুখ ঝলমল করছে তার। এক পলকের জন্য চোখাচোখি হলো রানার সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য। পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল নিজের বাপের দিকে। কোমরে হাত রেখে অনড় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড গ্রিফিন—স্পনসরশিপের পাশাপাশি টুর্নামেন্ট কমিটিরও সদস্য তিনি। সঙ্গীদের ফেলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ড্যানি। স্কোর শোনার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন লর্ড, তারপরেই গর্বিত ভঙ্গিতে হাত রাখলেন ছেলের কাঁধে। বোঝা গেল, ছেলের সাফল্যে খুব খুশি হয়েছেন।

'এরচেয়ে ভাল শুটিং আর দেখব বলে মনে হয় না,' রানার কাছে এসে বললেন ক্যাপ্টেন উইলকিন্স। হাতে ধরা ক্লিপবোর্ডে স্কোর টুকছেন। 'ড্যানি স্কুলের সেরা শুটার।' তালিকা দেখলেন। 'আছেও বাকি আর মাত্র একজন। জ্যাকব অ্যাশটন। কেমন করবে কে জানে। আগে ভাল শুটিং করত, কিন্তু রোয়িং টিমে যাবার পর থেকে একেবারেই প্র্যাকটিস করতে দেখিনি ওকে।'

জ্যাকবকে চেনে রানা—ড্যানির সহপাঠী, এবং ওয়েট বব। স্কুলের রোয়িং টিমের ক্যাপ্টেন সে, ডাঙার চেয়ে পানিতেই বেশি সময় কাটায়। খেলাধুলায় খুব ভাল, চাইলে অল-রাউণ্ডার স্পোর্টসম্যান হতে পারত, কিন্তু রোয়িং ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহ নেই ছেলেটার। রানা শুনেছে, ছাত্রাবস্থায় ওর বাবাও নাকি ইটনের রোয়িং টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন, প্রচুর পুরস্কার জিতেছেন। জ্যাকব সম্ভবত সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে চায়।

উইলকিন্সের ডাক শুনে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকব। পাশ দিয়ে যাবার সময় রানা ওকে শুভকামনা জানাল, 'বেস্ট অভ

লাক, জ্যাকব।'

ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল জ্যাকব। 'থ্যাঙ্কস। ভাগ্যের সহায়তা সত্যিই দরকার। ট্রফিতে অংশই নেবার ইচ্ছে ছিল না, বন্ধুরা ধরে-বেঁধে শেষ মুহূর্তে নাম এণ্ট্রি করিয়েছে। তোমার শুটিং আমি দেখেছি, রানা। জুনিয়র ক্লাসের ছাত্র হিসেবে মন্দ করোনি।'

'দূর! কিচ্ছু হয়নি।'

হেসে চলে গেল জ্যাকব। উইলকিন্সের কাছ থেকে রাইফেল সংগ্রহ করে পজিশন নিল। শুরু করল শুটিং। প্রথম দুটো গুলি দেখেই বোঝা গেল, সে আনাড়ি নয়। প্রায় ড্যানির সমান দক্ষতায় একটার পর একটা গুলি ছুঁড়ছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছিল রানা, হঠাৎ আড়চোখে ভিড় ঠেলে ড্যানিকে বেরিয়ে আসতে দেখল। চেহারায় মেঘ জমেছে। বোধহয় কল্পনাও করেনি আর কেউ ওর মত গুলি ছুঁড়তে পারে। ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল জ্যাকবের দিকে।

শেষ গুলিটা ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাকব। টার্গেট-শিট খুলে আনলেন উইলকিন্স। জাজরা এগিয়ে গেলেন স্কোরকার্ড পর্যালোচনার জন্য। নিচু গলায় আলোচনা হলো, তারপর ঘোষণা করা হলো ফলাফল।

প্রথম পাঁচের ভিতর নেই রানা, সপ্তম হয়েছে। অনভিজ্ঞ শুটার হিসেবে সেটাও অবশ্য কম নয়। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো, যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে ড্যানি গ্রিফিন আর জ্যাকব অ্যাশটন। দু'জনেরই পয়েন্ট সমান।

লর্ড গ্রিফিনের দিকে তাকাল রানা। পাথরের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটছে না। ড্যানি ঠিক তার ব্যতিক্রম। অসন্তোষ চাপা দিতে না পেরে জ্যাকবের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাঁতারে তোমাকে দেখে নেব,

অ্যাশটন!'

কথাটা হালকা সুরে বলবার চেষ্টা করলেও অন্তর্নিহিত ভাবটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। হুমকি দেয়া হলো জ্যাকবকে।

হাতছানি দিয়ে ছেলেকে ভিড় থেকে একটু দূরে নিয়ে গেলেন লর্ড গ্রিফিন। কৌতূহলের বশে ওদিকে এগোল রানা, নিরাপদ দূরত্ব থেকে চোখ রাখল বাপ-ছেলের উপর। রাগী ভঙ্গিতে ড্যানিকে কী যেন বলছেন লর্ড গ্রিফিন। ভয়ে প্রায় কুঁকড়ে যাবার দশা ড্যানির। মাথা নিচু করে রেখেছে। শেষে এক হাতে খপ করে ওর থুতনি উঁচু করলেন গ্রিফিন, মুখ নিয়ে গেলেন ছেলের মুখের কাছে। হিসিয়ে উঠে কী যেন বললেন। অত কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখবার সৌভাগ্য রানারও হয়েছে প্রথম পরিচয়ের রাতে। মনে পড়ে গেল লোকটার নির্দয় দৃষ্টি আর অদৃশ্য উত্তাপের কথা। ড্যানির জন্য একটু মায়াই হলো—শুটিঙে অ্যাশটনকে হারাতে পারেনি বলে বাপের রোষানলে পড়েছে বেচারা।

এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঁচের শিশি বের করলেন লর্ড গ্রিফিন। চকিতে তাকালেন এদিক-সেদিক, বুঝতে চাইছেন কেউ তাঁকে দেখছে কি না। তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে গেল রানা। উঁকি দিল ওখান থেকে। শিশির মুখ খুলে হাতের তালুতে কয়েকটা ট্যাবলেট ঢাললেন গ্রিফিন, বাড়িয়ে ধরলেন ছেলের দিকে।

ড্যানিকে মাথা নাড়তে দেখল রানা, কিন্তু পরক্ষণে ধমক খেয়ে মিইয়ে গেল। একরকম জোর করেই ওর হাতে ট্যাবলেটগুলো গুঁজে দিলেন গ্রিফিন। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে ওগুলো মুখে গুঁজল ড্যানি, পানির বোতল থেকে এক ঢোক নিয়ে গিলে ফেলল। তারপর ফিরে এল সঙ্গীদের কাছে।

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেল না রানা। বাঁশি বেজে উঠেছে, প্রতিযোগীদের ডাক পড়েছে দ্বিতীয়

ইভেন্ট—সাঁতারের জন্য। তাড়াতাড়ি ছুটতে হলো নদীর ধারে।

পথে জ্যাকবকে পেয়ে গেল ও। দ্রুত পা চালিয়ে পাশে গিয়ে বলল, 'কংগ্রাচুলেশন্স!'

'শুটিঙের জন্য?' বলল জ্যাকব। 'ও কিছু না। আমার বাবা আর্মি অফিসার। ছুটিতে গেলে ক্যান্টনমেন্টের শুটিং রেঞ্জে শখের বশে প্র্যাকটিস করি। ওখানে রোয়িঙের ব্যবস্থা নেই কিনা! তাই হাত পেকেছে। অবশ্য এত ভাল করব ভাবিনি।'

'ড্যানি বেশ ভালই ধাক্কা খেয়েছে।'

'সাময়িক,' কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকব। 'মনে হয় না সাঁতারে ওকে হারাতে পারব।'

নদীর ধারে তাঁবু খাটানো হয়েছে, ওখানেই দুজনে একসঙ্গে পোশাক বদলাল। সে-সময় জ্যাকবের পেশিবহুল ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখল রানা। যারা নিয়মিত রোয়িং করে, তাদের শরীর এমনই হয়—পাকানো, শক্তিশালী। জ্যাকব নিশ্চয়ই সাঁতারও ভাল পারে... ভাল সাঁতারু না হলে কেউ রোয়িং টিমে সুযোগ পায় না; কোনও কারণে নৌকা উল্টে গেলে সাঁতার কেটে তীরে উঠতে হবে কিনা। প্রশ্ন হলো, জ্যাকব কতটা ভাল সাঁতারু?

ভাসমান কতগুলো প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়েছে নদীতে, ওখান থেকে পানিতে ঝাঁপ দেবে প্রতিযোগীরা। সাঁতার কেটে ভাটিতে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে, ঘুরে আসতে হবে একটা মার্কার, তারপর উজানের স্রোত ঠেলে পৌঁছুতে হবে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত। কোর্সটা কঠিন, দেখামাত্র প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল দু'জন ছাত্র।

জাজদের পক্ষ থেকে জানানো হলো, দুটো হিট হবে শুরুতে। যারা টিকবে, তারা অংশ নেবে মূল রেসে। রানার নাম পড়ল প্রথম গ্রুপে। চিন্তা না করে সবার সঙ্গে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। নদীর পানি আগের চেয়ে উষ্ণ হয়ে উঠেছে, স্রোতের ঠেলায়

ভাটির দিকে এগোতেও পারছে অনায়াসে। মার্কার ঘুরে আসতে একটুও কষ্ট হলো না। কিন্তু তারপরেই শুরু হলো আসল পরীক্ষা। স্রোতের বিপরীতে এগোনো যে এত কঠিন, সেটা ভাবতে পারেনি ও। সর্বশক্তিতে হাত-পা ছুঁড়েও বিশেষ কাজ হচ্ছে না। এগোতেই পারছে না বলতে গেলে। অন্যান্য প্রতিযোগীদেরও কমবেশি একই দশা। যেন অনন্তকাল পর, নদীর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে প্ল্যাটফর্মের কাছে পৌঁছুল সাঁতারুরা।

জ্যাকব যথারীতি প্রথম হয়েছে, দশ ফুটের ব্যবধানে হারিয়েছে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কিন্তু দ্বিতীয় হিটে দ্বিগুণ ব্যবধানে জিতল ড্যানি। সময়ও নিয়েছে জ্যাকবের চেয়ে কম। রানার রেজাল্ট উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। চতুর্থ হয়েছে ও।

হিটের ফলাফল ঘোষণা করা হলো একটু পর। চূড়ান্ত রেসের জন্য নির্বাচিত হয়েছে আটজন। তার মাঝে রানা নেই, টাইমিঙে বাদ পড়ে গেছে।

'ব্যাড লাক,' ওকে সান্ত্বনা দিল মিং। 'মন খারাপ কোরো না।'

'করছি না তো!' রানা বলল। 'সাঁতারেও যে পারব না ড্যানির সঙ্গে, তা তো জানি। ওর মোকাবেলা করব আমি ক্রস-কাণ্ট্রিতে।'

চূড়ান্ত রেসের প্রতিযোগীদের উপর চোখ বোলাল ও। ড্যানি আর জ্যাকব ছাড়া আরও দু'জন সম্ভাবনাময় সাঁতারু আছে নির্বাচিতদের মাঝে। গ্যালার্ড—ছিপছিপে দেহের এক কিশোর, ফুটবল দলের স্ট্রাইকার; আর ফস্টার—স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়র ক্লাসের ছাত্র, দৈহিক আকার ছোটখাট একটা গরিলার মত।

প্ল্যাটফর্মে উঠে পাশাপাশি লাইন ধরে দাঁড়াল আট সাঁতারু। নদীতীর থেকে হৈ-হল্লা করে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে সমর্থকরা। ইভেন্ট পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে বুড়ো জ্যাকারির ওপর; বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলল সে, লাভ হলো না।

প্রতিযোগিতা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে দর্শকরা। অগত্যা প্রতিযোগীদের দিকে ফিরল জ্যাকারি। চেঁচিয়ে উঠল:

'অন ইয়োর মার্কস... গেট সেট...'

বাঁশি বাজাবার সুযোগ পেল না সে, তার আগেই ভিড়ের মাঝ থেকে কে যেন চড়া সুরে অন্য একটা বাঁশি বাজাল... হয়তো বা দুষ্টুমি করেই। কিন্তু প্রতিযোগীদের মাঝ থেকে তিনজন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল পানিতে। হো হো করে হাসির রোল পড়ল দর্শকদের মাঝে। বিরক্ত গলায় কিছু বলে উঠল জ্যাকারি, কিন্তু হাসির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল তার গলা। টিচাররাও হাসছেন সবকিছু ভুলে গিয়ে, মজা পেয়েছেন ঘটনাটাতে। হাসছেন না কেবল লর্ড গ্রিফিন। তাঁকে সম্মান দেখাতে গিয়ে বহু কষ্টে নিজেকে গম্ভীর রেখেছেন ড. আর্লিংটন—স্কুলের হেডমাস্টার।

ঘন ঘন বাঁশি বাজিয়ে ঝাঁপ দেয়া তিন সাঁতারুকে ফিরিয়ে আনল জ্যাকারি, তাদের মাঝে ড্যানিও আছে। ওরাও হাসতে হাসতে প্ল্যাটফর্মে উঠল, তবে ড্যানির হাসিতে প্রাণ নেই। ঘটনাটা মজার হলেও অফিশিয়ালি একবার ফলস স্টার্ট করে ফেলেছে ও।

'এখানে ফাজলামি হচ্ছে নাকি?' আচমকা গর্জে উঠলেন লর্ড গ্রিফিন। 'এত হাসাহাসি কীসের? সিরিয়াস একটা কম্পিটিশন চলছে... আপনার ছেলেরা কি সেটা বুঝতে পারছে না, ড. আর্লিংটন?'

নিচু গলায় কিছু বলে তাঁকে শান্ত করলেন হেডমাস্টার। এরপর দর্শকদেরকে সতর্ক করে দিলেন, ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তি দেয়া হবে দোষীকে। পিনপতন নীরবতা নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে। উৎসবমুখর পরিবেশটায় হঠাৎ করে যেন পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে।

পালা করে জ্যাকব আর ড্যানির দিকে তাকাল রানা। শান্ত, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকব; দুশ্চিন্তার কোনও ছাপ

নেই। জিতবার জন্য অংশ নিচ্ছে না প্রতিযোগিতায়, স্রেফ উপভোগ করতে চাইছে। কিন্তু ড্যানিকে নার্ভাস দেখাল, যেন এর উপরেই নির্ভর করছে ওর সবকিছু। পজিশন নিয়ে ফেলেছে সে, টান টান হয়ে আছে শরীরের সব পেশি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নদীর ঘোলা পানির দিকে। একটু যেন কাঁপতেও দেখল ওকে রানা। ট্যাবলেটগুলোর কথা মনে পড়ল... কী খাইয়েছেন ওকে লর্ড গ্রিফিন?

গলা খাঁকারি দিয়ে আবার চেঁচাল জ্যাকারি, 'সুইমার্স, অন ইয়োর মার্কস... গেট সেট...'

ঝপাস!

একযোগে হাহাকারের মত আওয়াজ করে উঠল দর্শকেরা—ড্যানি আবারও ফলস স্টার্ট করেছে! উত্তেজনায় নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি সে, জ্যাকারি বাঁশি দেবার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে পানিতে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় বয়ে গেল। খ্যাপাটে ভঙ্গিতে পানি থেকে উঠে এল ড্যানি। লর্ড গ্রিফিনকে অপ্রস্তুত দেখাল, এবার আর কাউকে দোষারোপ করতে পারছেন না।

'মি. গ্রিফিন, মনোযোগ দাও রেসে,' ড্যানির উদ্দেশে বললেন ড. আর্লিংটন। 'দু-দু'বার ফল্স স্টার্ট করেছ... আরেকবার ভুল করলে কিন্তু তুমি ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যাবে।'

দাঁতমুখ খিঁচাল ড্যানি। রাগটা কার উপর, বোঝা গেল না।

থমথমে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে উপস্থিত সবার মাঝে। রানার নিজের বুকই ঢিব ঢিব করছে। ড্যানির কী অবস্থা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

'অন ইয়োর মার্কস... গেট সেট...

ঝপাস!

এবার আর কেউ কোনও আওয়াজ করল না। ঘটনার

আকস্মিকতায় চোয়াল ঝুলে পড়েছে দর্শকদের। অবিশ্বাস্য... আবারও কাউন্টডাউন শেষ হবার আগে ঝাঁপ দিয়েছে ড্যানি! ভুস করে ভেসে উঠেই ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পানি ছিটাল। বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল কাকে যেন। ছেলেটার জন্য একটু খারাপই লাগল এবার রানার। জেতার জন্য এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল নিজেই।

ততক্ষণে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন লর্ড গ্রিফিন। ড্যানিকে জ্যাকারি তীরে উঠে আসার জন্য ইশারা করছে দেখে ফেটে পড়লেন রাগে। জাজদের টেবিলের সামনে গিয়ে শুরু করলেন চিৎকার। ড. আর্লিংটন বোঝাতে চেষ্টা করলেন তাঁকে, কিন্তু লর্ড কারও কথা শুনবেন না। হুমকির সুরে কী কী যেন বলে ধড়াম করে একটা কিল বসিয়ে দিলেন টেবিলে। মনে হলো রায় দিয়েছেন কোনও মামলার। এরপর গটমট করে হেঁটে ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে।

কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ড. আর্লিংটন। তারপর নিচু গলায় শলাপরামর্শ করে নিলেন জাজদের সঙ্গে। সব শেষে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে ভাষণের সুরে বললেন, 'গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। যদিও টেকনিক্যালি তিনটে ফলস স্টার্টের জন্য মি. ড্যানি গ্রিফিন এই রেসের জন্য অযোগ্য, তারপরেও প্রথম ঘটনাটিতে তার সরাসরি কোনও হাত ছিল না বলে মনে হচ্ছে আমাদের। অতি-উৎসাহী কোনও দর্শকের দুষ্টুমির কারণে তাকে চরম শাস্তি দেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু...' একটু বিরতি নিলেন তিনি, '...যারা একবারও ভুল করেনি, তাদের কথা ভেবে লঘু শাস্তির বিনিময়ে মি. গ্রিফিনকে এই রেসে অংশ নিতে দেয়া হবে। শাস্তিটা হলো, দশ সেকেণ্ডের জরিমানা। অর্থাৎ, অন্যেরা রেস শুরু করবার দশ সেকেণ্ড পর, দ্বিতীয় একটি বাঁশির আওয়াজ পেয়ে রেস শুরু করবে সে।'

গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল ভিড়ের মাঝে। সিদ্ধান্তটার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক করছে সবাই। কড়া গলায় ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ করালেন হেডমাস্টার—জানিয়ে দিলেন, কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জ্যাকারিকে ইশারা দিলেন রেস আরম্ভ করবার জন্য। আবারও কাউন্টডাউন শুরু করল জ্যাকারি।

এবার আর কোনও ঘাপলা হলো না। প্রতিযোগীরা সতর্ক হয়ে গেছে, বাঁশির শব্দ হবার পরেই কেবল ঝাঁপ দিল পানিতে। ঘড়ি ধরে ঠিক দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল জ্যাকারি, তারপর বাজাল দ্বিতীয়বারের মত। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ঝাঁপ দিল ড্যানি, তীব্র গতিতে পিছু নিল প্রতিদ্বন্দ্বীদের।

সত্যিই অসাধারণ সাঁতারু ড্যানি, স্বীকার না করে পারল না রানা। পানি ভেদ করে টর্পেডোর মত এগোচ্ছে। দশ সেকেণ্ড পরে শুরু করলেও অল্পক্ষণে অতিক্রম করল দু-দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মার্কারে পৌঁছুনোর আগে ওভারটেক করল আরও একজনকে। মার্কার যখন ঘুরল, তখন প্রায় ধরে ফেলেছে সামনের গ্রুপটাকে। সন্দেহ নেই, দশ সেকেণ্ডের শাস্তিটা না পেলে অনায়াসে প্রথম হতো সে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেছে। তারপরেও তৃতীয় আর চতুর্থ স্থানে থাকা দুই সাঁতারুকে পিছে ফেলতে অসুবিধে হলো না তার, বাকি রইল শুধু জ্যাকব আর ফস্টার। তিনজনেই টেমস নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে এখন প্রাণপণে লড়ছে।

'এগিয়ে যাও, জ্যাকব!'

'সাবাস, ড্যানি! আরও জোরে... আরও জোরে!'

'ফস্টার... ফস্টার!'

সমর্থকদের হৈ-হল্লায় কানে তালা লাগবার জোগাড়। রানাও যোগ দিল তাতে—জ্যাকবকে উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জ্যাকব, কমতে শুরু করেছে গতি। ড্যানি তার পাশে চলে

এল। সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে দু'জনে। সামনে রয়েছে শুধু ফস্টার। আরেকটু সময় পেলে তাকেও ধরে ফেলত ড্যানি, কিন্তু বিপদ টের পেয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ল ফস্টার, সবার আগে হাত ছোঁয়াল প্ল্যাটফর্মে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ড্যানি আর জ্যাকবও পৌঁছুল, কিন্তু পানির আলোড়নে বোঝা গেল না কে আগে স্পর্শ করেছে প্ল্যাটফর্ম।

দু'জন জাজ রয়েছেন নদীর ধারে, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে লক্ষ রাখছিলেন ফিনিশিং পয়েন্টে। সবাই পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তাঁরা, এরপর বিনকিউলার নামিয়ে আলোচনা করে নিলেন, সবশেষে টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন তাঁদের অবজারভেশনের।

ড. আর্লিংটনের চেহারায় বিব্রত ভাব ফুটতে দেখল রানা। ইতস্তত করে তিনি ঘোষণা করলেন ফলাফল।

'সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে মি. লরেন্স ফস্টার। দ্বিতীয়... জ্যাকব অ্যাশটন...'

হুল্লোড় করে উঠল দর্শকেরা। বাকি ফলাফল ঘোষণার আর সুযোগ দিল না হেডমাস্টারকে। কল্পনাতীত একটা ব্যাপার—ড্যানি হেরে গেছে সাঁতারে! নতুন তারকা হিসেবে উদয় হয়েছে ফস্টার আর জ্যাকব।

এবার আর লর্ড গ্রিফিনের প্রতিক্রিয়া দেখবার সুযোগ পেল না রানা। লাঞ্চের জন্য ছুটতে হলো সবার সঙ্গে। প্রতিযোগিতায় এখন সাময়িক বিরতি। বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে শেষ ইভেন্ট—ক্রস-কান্ট্রি, অর্থাৎ দূরপাল্লার দৌড়।

লাঞ্চটাইমে সবাই ব্যস্ত রইল আলাপ-আলোচনা আর জল্পনা-কল্পনা নিয়ে। শুটিঙে জ্যাকবের চমক, সাঁতারে ড্যানির ফলস স্টার্ট আর ফস্টারের জিতে যাওয়া... সব মিলিয়ে বেশ ঘটনাবহুল একটা দিন কেটেছে। ক্রস-কান্ট্রিতে কী ঘটবে, সেটা নিয়ে চলছে

এখন তর্ক-বিতর্ক।

শেষ হওয়া দুই ইভেন্টের স্কোর টুকে রেখেছে মিং। লাঞ্চের পরে সেগুলো স্টাডি করে রানাকে জানাল, 'ঘটনা পুরো প্যাঁচ খেয়ে গেছে, বুঝলে?'

'কী রকম?'

'সাঁতারে থার্ড হয়ে ড্যানির অবস্থা কেরোসিন। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে এক কথায় কেরামতি দেখাতে হবে ওকে।'

'ফস্টার আর জ্যাকবেরও সুযোগ আছে বলতে চাইছ?'

'ফস্টারের নেই। শুটিঙে অনেক কম স্কোর করেছে ও। ট্রফির লড়াই এখন ড্যানি আর জ্যাকবের মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

'তা হলে আর প্যাঁচ খেল কোথায়?'

'জ্যাকবের জন্য প্যাঁচ নেই। ক্রস-কান্ট্রিতে ড্যানিকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হবে ও, যে-পজিশনেই আসুক না কেন। কিন্তু ড্যানির হিসেব আলাদা। জ্যাকবকে শুধু হারালেই চলবে না... জ্যাকব যদি ওর পিছনে থেকেও প্রথম তিনের মাঝে দৌড় শেষ করে, ড্যানিকে ফার্স্ট হতে হবে।'

'মানে ড্যানি সেকেণ্ড, আর জ্যাকব থার্ড হলে জ্যাকবই চ্যাম্পিয়ন হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাইট,' মাথা ঝাঁকাল মিং, 'এবং আমার ধারণা, তিনের মধ্যে আসার যোগ্যতা আছে জ্যাকবের। তারমানে ট্রফি জিততে হলে ফার্স্ট হতেই হবে ড্যানিকে। জ্যাকব ওকে ঠেকাতে পারবে বলে মনে হয় না। বাকি রইলে তুমি। কী... পারবে ফার্স্ট হতে?'

ড্যানির জন্য কোনও সহানুভূতি নেই রানার মনে। প্রথম দিন থেকে শত্রুতা করছে ওর সঙ্গে। বড়লোক বাপের বখে যাওয়া ছেলে—পুরো স্কুল ওর অত্যাচারে তটস্থ। বাপটাও কম যায় না। দাপট দেখিয়ে ছেলেকে ট্রফি জেতাতে চায়। দু'জনকেই একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।

'পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করব আমি,' বলল রানা শান্ত গলায়। 'ড্যানিকে শায়েস্তা করার এটাই মোক্ষম সুযোগ।'

সাত

গ্রিফিন কাপের চল্লিশজন প্রতিযোগী জমায়েত হয়েছে ক্রস-কাণ্ট্রির জন্য। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে ইতিমধ্যে, আবহাওয়া উষ্ণ। লাঞ্চ এখনও হজম হয়নি, তাই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জগিং করে নিল রানা। রক্ত-চলাচল বাড়িয়ে শরীর গরম করল, কাটাল পেশির আড়ষ্টতা। তর সইছে না ওর, মুখিয়ে আছে দৌড় শুরু করবার জন্য... ড্যানি গ্রিফিনকে হারাবার জন্য।

ড্যানির কথা মনে পড়তেই মনে মনে একটু হেসে নিল। হিসেবের ছক পুরোপুরি ওলট-পালট হয়ে গেছে বেচারার। শুটিং আর সাঁতারে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে বলে ভেবেছিল, ক্রস-কাণ্ট্রি নিয়ে একদমই ভাববার প্রয়োজন ছিল না আর, মোটামুটি একটা পজিশন পেলেই অনায়াসে জিতে যেত ট্রফি। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে এখন তাকে প্রথম হতেই হবে এ-রেসে।

আরেকটু ওয়ার্ম-আপ করবে বলে ভাবল রানা। ভিড়ের মাঝে সেটা সম্ভব নয় বলে বেরিয়ে এল জটলা থেকে। বেরিয়েই ধাক্কা খেল লর্ড গ্রিফিনের সঙ্গে।

'এত তাড়া কীসের, ছেলে?' গম্ভীর গলায় বললেন লর্ড। 'দেখে চলতে পারো না?'

'মাফ করবেন, স্যর,' বিব্রত গলায় বলল রানা। 'আমি আপনাকে খেয়াল করিনি।'

চোখ পিটপিট করলেন লর্ড গ্রিফিন। 'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে...'

'আমি মাসুদ রানা, স্যর,' উশখুশ করে উঠল রানা। আবারও যেন উত্তাপ অনুভব করছে লর্ডের অবয়ব থেকে। 'জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরির ছেলে। কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় স্কুল-ইয়ার্ডে দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গ্রিফিনের, পরমুহূর্তে ফের মেঘ জমল। 'তুমি আমাকে ঘুষি মেরেছিলে।'

'জী... না, মানে... আপনিই বলেছিলেন...'

বিনা নোটিসে ঘুষি ছুঁড়লেন লর্ড। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রানার, আঘাতের ভয়ে আঁতকে উঠল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন গ্রিফিন, ওর মুখের দু'ইঞ্চি দূরে থামিয়ে নিলেন মুঠি। হেসে উঠলেন হো হো করে।

'ভয় পেয়েছ?' বললেন তিনি। 'ভয়ের কিছু নেই, আমি দুষ্টুমি করেছি।'

কথাটা বিশ্বাস হলো না রানার। ঘুষি ছোঁড়ার সময় পলকের জন্য হিংস্রতা ফুটতে দেখেছে সুবেশী লর্ডের চেহারায়—সেটা দুষ্টুমি বা অভিনয় ছিল না... ছিল নিখাদ ঘৃণা আর আক্রোশ। তবে নিজেকে সামলে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই লোকের। মুহূর্তেই হাসি ফুটিয়ে স্বাভাবিক করে নিয়েছেন পরিস্থিতি। যদি না করতেন? ভদ্রতার খোলস থেকে ভিতরের পশুটাকে যদি মুক্ত করে দিতেন গ্রিফিন, কী ঘটত তা হলে?

'এভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না,' রানাকে বললেন লর্ড। 'এখুনি রেস শুরু হবে। যাও, পজিশন নাও।'

প্রতিযোগীদের ভিড়ে ফিরে গেল রানা। দেখা হলো জ্যাকবের

সঙ্গে। সে বলল, 'খবর শুনেছ?'

'কী খবর?'

'লাঞ্চ ব্রেকে মার্শাল বদলানো হয়েছে।'

কিছু ছাত্রকে মার্শাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল ক্রস-কান্ট্রি রেসের জন্য—পুরো রুট তদারক করবে তারা, প্রতিযোগীরা ঠিকমত ট্র্যাক অনুসরণ করে দৌড়াচ্ছে কি না দেখবে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সাহায্য করবে। ওদের কথাই বলছে জ্যাকব।

'বদলানো মানে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

'কয়েকজনকে রিপ্লেস করা হয়েছে, তাদের জায়গা নিয়েছে ড্যানির বন্ধুরা।'

'সত্যি?' চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা, বুঝতে চাইছে রহস্যটা। 'কতজন?'

'সঠিক বলতে পারব না, তবে শুনেছি নতুন মার্শালদের মাঝে ড্যানির খাস তিন সাগরেদ... মানে ডেনিস, ন্যাট আর পারকার আছে।'

'লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না,' রানা বলল। 'ড্যানি কি চিট করে জিততে চাইছে?'

'তেমন কিছু ঘটলে অবাক হব না,' জ্যাকব কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওর পক্ষে সবই সম্ভব। বাপটাও একটা পাষাণ, হেরে গেলে কী করবে ড্যানির কে জানে। লোকটাকে ভীষণ ভয় পায় ড্যানি।'

ঘাড় ফিরিয়ে লর্ড গ্রিফিনের দিকে তাকাল রানা, তাঁর বুনো দৃষ্টির কথা ভাবল। ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। মানুষটার ভিতরে দয়ামায়া বা পুত্রস্নেহ বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। কঠিন প্রকৃতির পিতৃত্ব রানাও দেখেছে। ওর বাবা ইমতিয়াজ চৌধুরি খুব রাশভারী ধরনের মানুষ ছিলেন, কখনও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতেন না রানার প্রতি, বরং কড়া শাসন করতেন ওকে। কিন্তু তারপরেও রেজিনাল্ড গ্রিফিনের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না।

শাসনের মাঝেও বাবার আদর-স্নেহ ঠিকই টের পেত রানা... লর্ড গ্রিফিনের মাঝে সেসবের কিচ্ছু নেই।

মি. স্যালিসবারি ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রতিযোগীদের মাঝে, উৎসাহ দিচ্ছেন সবাইকে। রানার সামনে এসে বললেন, 'তুমি তৈরি, রানা?'

'জী, স্যর। যতটা তৈরি থাকা যায় আর কী।'

'তুমি তোমার স্বাভাবিক গতিতে দৌড়ালেই চলবে,' পরামর্শ দিলেন স্যালিসবারি। 'তাড়াহুড়ো কোরো না। লম্বা রেস... দম ধরে রাখবার চেষ্টা করবে। দম ফুরালেই শেষ।'

'জানি, স্যর।'

'খুব ভাল। বেস্ট অভ লাক।'

চলে গেলেন স্যালিসবারি।

প্রথমবারের মত উইণ্ডসর গ্রেট পার্কে হতে চলেছে ইটনের ক্রস-কান্ট্রি রেস। স্টার্টিং পয়েন্টে উৎসাহী দর্শকদের বিশাল ভিড় জমেছে, কিন্তু রানা জানে, দৌড় শুরু হবার খানিক পরেই তাদের দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাবে প্রতিযোগীরা। পাঁচ মাইল দীর্ঘ কোর্স, শুরু এবং শেষ হবে পার্কের উন্মুক্ত জায়গায়, বাকিটুকু পুরোটাই গাছগাছালিতে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড় ও টিলায় ভরা। মোটামুটি দুর্গম সেই পথ ধরে দৌড়াতে হবে ওদেরকে।

সেধে রেস শুরু করাবার দায়িত্ব নিয়েছেন লর্ড গ্রিফিন, তার আগে ভাষণ দেবার লোভ ছাড়তে পারলেন না। প্রতিযোগীদের সামনে গিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন পর্বে এবার অংশ নিতে চলেছ তোমরা। এই রেসের মাধ্যমেই তোমাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসবে সত্যিকার পুরুষ। কাজেই দৌড়াতে হবে শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে। দুর্গম পথে একসময় ক্লান্তি ছেঁকে ধরতে চাইবে তোমাদের, মনে হবে পা-দুটো আর দেহের ওজন বইতে পারছে না। তখন স্রেফ মনের জোরে

এগোতে হবে, দিতে হবে কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের পরীক্ষা। তা হলেই কেবল জয়ী হতে পারবে। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল প্রতিযোগীরা। এই সুযোগে ড্যানিকে দেখে নিল রানা। ঠোঁটের কোণে বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটে আছে তার। ছেলের দিকে এক পলক তাকালেন লর্ড গ্রিফিন, তাঁকেও খুশি খুশি দেখাচ্ছে। ব্যাপার কী? কী মতলব এঁটেছে এরা?

'রানার্স! টেক পজিশন!' জলদগম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন গ্রিফিন। 'অন ইয়োর মার্কস... গেট সেট...'

হাতে ধরা স্টার্টিং পিস্তলের ট্রিগার চাপলেন তিনি। গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি করে ছুটল প্রতিযোগীরা। হৈ-হৈ করে উঠল দর্শকেরা। চিৎকার, চেঁচামেচি আর শিস দিয়ে উৎসাহ জোগাচ্ছে। চরম হট্টগোল। তবে প্রতিযোগীরা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই কমে এল সে-আওয়াজ।

ঠেলাঠেলি করে ছুটছে সবাই, বিশৃঙ্খলভাবে। কে কাকে পিছে ফেলতে পারে সে-চেষ্টায় মত্ত। গোলমাল এড়িয়ে একপাশ দিয়ে ছোট ছোট কদমে দৌড়াচ্ছে রানা। তাড়াহুড়ো করছে না, তাড়াহুড়ো করলে খুব শীঘ্রি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আস্তে আস্তে দৌড়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে, প্র্যাকটিস সেশনের সঙ্গে সত্যিকার রেসের অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্র্যাকটিসের সময় একা দৌড়েছে; তাও আবার স্কুলের মাঠে। পার্কের পরিবেশ ভিন্ন। গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার বৃষ্টি হওয়ায় মাটি ভেজা... আজ একটু গরমও পড়েছে। এসব ছাড়াও কম্পিটিশনের নার্ভাসনেস তো আছেই।

কয়েক মিনিট যেতেই দুর্বল প্রতিযোগীরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করল, ছোট হয়ে এল সামনের দলটা। গতি একটু বাড়িয়ে তাদের পিছনে চলে এল রানা। জ্যাকব আর ড্যানি রয়েছে সবার আগে...

রয়েছে গ্যালার্ড আর ফস্টারসহ আরও কয়েকজন সিনিয়র ক্লাসের ছেলে। ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তারা, হাঁপাচ্ছে। নিজের অবস্থা যাচাই করল রানা—ও একটুও ক্লান্ত হয়নি, যেন বাতাসে ভেসে এগোচ্ছে। আরও অনেকক্ষণ এগোতে পারবে এভাবে। খুশি হয়ে উঠল... যেভাবে চেয়েছিল, সেভাবেই ঘটছে সবকিছু।

প্রথম পাহাড়টায় পৌঁছুতেই আরও কয়েকজন পিছিয়ে পড়ল। ঢাল ধরে উল্কার মত উঠে গেল রানা তাদেরকে পাশ কাটিয়ে। উল্টোপাশের ঢাল বেয়ে নামার পর লিডিং গ্রুপটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এখন আর জটলা করে নয়, সবাই ছুটছে যার যার মত, এক সারিতে। মাপা কদমে দৌড়ে চলল রানা, নিশ্চিন্তে। ওয়ার্ড'স মিডের সেই সাঁতার প্রতিযোগিতার পর থেকে বুচারের কাছে নিয়মিত তালিম নিয়েছে ও, শিখে নিয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কায়দাকানুন। দম নিচ্ছে নির্দিষ্ট ছন্দে, যাতে ফুসফুসের উপর বাড়তি চাপ না পড়ে। ক্লান্ত যে একেবারে হচ্ছে না তা নয়—গলা শুকিয়ে গেছে, ব্যথা শুরু হয়েছে পায়ের পেশিতে... কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। বরং সেসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে ভালই লাগছে ওর।

দ্বিতীয় পাহাড়ের কাছে পৌঁছুল ওরা, ঘটনাহীনভাবে পেরিয়ে এল ওটা। তৃতীয়টা সবচেয়ে বড়—*পারসন'স হিল*—ঢালও সবচেয়ে খাড়া, ঘন গাছপালায় ছাওয়া। দৌড়ের কদম কমিয়ে আনল রানা, এই প্রথম সত্যিকার অর্থে শারীরিক কষ্ট অনুভব করল। দেহের প্রতিটা পেশি বিদ্রোহ করছে খাড়া ঢাল বাইতে গিয়ে। তাই বলে থামল না, কষ্টটা সইবার ক্ষমতাআছে ওর। গ্যালার্ডের পিছু পিছু ছুটছিল, ছেলেটা ঢালের অর্ধেক উঠেই থেমে গেল, কোমরে হাত রেখে উবু হয়ে গেল হাঁপাতে হাঁপাতে। তাকে পেরিয়ে গেল রানা, গতি বাড়িয়ে পৌঁছে গেল পরেরজনের কাছাকাছি।

পাহাড়ের চূড়াটা সমতল, চওড়া। যেখান দিয়ে উল্টোপাশের ঢালে নামতে হবে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন মার্শাল—ন্যাট আর পারকার। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাল না রানা, নেমে পড়ল ঢালে। এপাশটা আরও দুর্গম—ধুলো আর পাথরে ভরা। মুহূর্তের অসতর্কতায় পা হড়কাতে পারে। রানার চোখের সামনেই একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল, গড়াতে গড়াতে চলে গেল নিচে। জনাতিনেক মার্শাল ছুটে গেল তাকে উদ্ধার করতে।

সামনে-পিছে কে আছে আর দেখবার চেষ্টা করল না রানা,দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ঢালে। পা ফেলছে সাবধানে, যাতে দুর্ঘটনায় না পড়ে। অন্যান্য প্রতিযোগীরাও তা-ই করছে।

পাহাড় থেকে নেমে আবারও গতি বাড়াল রানা, ধরে ফেলল রেসে লিড নেয়া গ্রুপটাকে। জ্যাকব আর ফস্টারকে দেখতে পেল, কিন্তু ড্যানি কোথায়? পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করেছে, নাকি পিছিয়ে পড়েছে কোনও কারণে? ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখে নিল। গ্যালার্ড আসছে কয়েকজনের সঙ্গে, তার ভিতর ড্যানি আছে কি? নাকি সবাইকে পিছে ফেলে অনেক সামনে চলে গেছে? চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা।

কোর্সের সবচেয়ে কঠিন অংশটা পার হয়ে এসেছে, এবার একটু ঝুঁকি নেয়া যায়। দ্রুত পা ফেলে লিড নেয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওভারটেক করল ও, পাশে চলে এল জ্যাকবের। রানাকে দেখতে পেয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল সে। বলল, 'আছ এখনও? অনেকেই কিন্তু ঝরে গেছে।'

'ড্যানিকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল জ্যাকব।

'আমাদের সামনে আর কেউ আছে?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'কী জানি,' বলল জ্যাকব। 'মনে তো হয় না।'

নিশ্চিত হবার একটাই উপায়। স্প্রিন্ট দেবার মত আগে বাড়ল

রানা। পিছে ফেলে এল সবাইকে। ফার্স্ট পজিশনে চলে এসেছে, কিন্তু রেসের এ-পর্যায়ে এত জোরে দৌড়াবার কথা ছিল না। সব ড্যানির জন্য। কোথায় বদমাশটা? পারসন'স হিল থেকে নামবার সময় ওর দিকে খেয়াল রাখেনি বলে নিজেকে অভিসম্পাত দিল রানা।

ছোট্ট আরেকটা পাহাড় পেরুল ও, অপেক্ষাকৃত সহজভাবে। ওপাশে নেমে বড় একটা বাঁক ঘুরতেই চোখের কোণে ধরা পড়ল কী যেন। ডানদিকে... ঝোপের আড়ালে নড়ছে। পলকের জন্য সাদা রঙ চোখে পড়ল, পরক্ষণে হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। ভাল করে তাকাল রানা। পারসন'স হিল থেকে সরাসরি রাস্তা ধরলে ট্র্যাকের এই অংশটা খুব দূর নয়, ঘোরানো পথ ধরে দৌড়াচ্ছে বলে সময় বেশি লেগেছে। ওপাশ দিয়ে কেউ দৌড়াচ্ছে না তো? কী দেখল তা হলে?

আরেকটা বাঁক ঘুরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। ওই তো ড্যানি! দৌড়াচ্ছে ঠিক ওর সামনে। এতক্ষণ তাকে দেখেনি কেন বুঝতে অসুবিধে হলো না একটুও। ওপাশের রাস্তাটা ধরে ড্যানিই আসছিল... তার গায়ের সাদা পোশাকের ঝলকই দেখেছে রানা। অর্থটা পরিষ্কার—বেআইনি পন্থা ব্যবহার করেছে সে... শর্টকাট নিয়ে চলে এসেছে সবার সামনে!

শুকনো পাতায় পা পড়ল রানার, আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল ড্যানি। চেহারায় বিস্ময় ফুটল ওকে দেখতে পেয়ে।

একটু দূরেই একজন মার্শাল দাঁড়ানো। ড্যানি শর্টকাট নিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে সে। অ্যাকশন নিতে বাধ্য। কিন্তু কাছে যেতেই ছেলেটাকে চিনতে পারল রানা—ডেনিস, ড্যানির ডান হাত। মনটা দমে গেল, শয়তানটা কিচ্ছু করবে না। বরং রানাকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

ড্যানিকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখল রানা। কাছে গিয়ে ও-ও

থামল। জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না, বুকে ব্যথা,' বলল ড্যানি। 'তুমি এগোও।'

দ্বিতীয় কোনও কথা না বলে আবারও ছুটতে শুরু করল রানা। চোরামি করেও লাভ হয়নি ড্যানির, বোঝো এবার ঠ্যালা। মনে মনে হাসল ও। কিন্তু হাসিটা টিকল না বেশিক্ষণ। ড্যানিকে খুঁজতে গিয়ে বড় বেশি শক্তি খরচ করে ফেলেছে, তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে এখন। ছেঁকে ধরেছে ক্লান্তি। শুরুতে পালকের মত হালকা লাগছিল শরীর, এখন লাগছে জগদ্দল পাথরের মত। তাই বলে হতাশ হলো না। জানে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে আছে ও; ড্যানিও বুকে ব্যথা নিয়ে থেমে গেছে। কাজেই একটু আস্তে দৌড়ালে ক্ষতি নেই। বিশ্রাম পাবে পেশিগুলো।

গাছপালার আচ্ছাদন পেরিয়ে একটু পরেই খোলা এক টুকরো জমিতে পৌঁছুল ও। রোদ পড়ছে গায়ে। চারপাশের গাছপালা যেন হেসে উঠেছে সূর্যের আলোয়, মাথার উপর নির্মেঘ আকাশ। চমৎকার পরিবেশ। খুশি হয়ে উঠতে চলেছিল, কিন্তু মনোযোগ টুটে গেল পায়ের শব্দে। ওদিকে মুখ ঘোরাতেই আবারও সাদা ঝলক দেখল রানা।

ড্যানি! আবারও শর্টকাট নিয়েছে। সামনে বড় একটা টিলা, সেটার পাশ ঘুরে যাবার কথা, কিন্তু তা না করে ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে কোনাকুনি যাচ্ছে সে। বুকে ব্যথা না কচু, রানাকে এগোতে দিয়েছে যাতে ওর অলক্ষে ট্র্যাক ছাড়তে পারে। দাঁতে দাঁত পিষল রানা, কী করবে বুঝতে পারছে না। ড্যানির নামে অভিযোগ এনে লাভ হবে না। একমাত্র সাক্ষী ডেনিস, সে মরে গেলেও ড্যানির অপকর্ম ফাঁস করবে না।

ব্যাপারটা অন্যদেরকে জানানো দরকার। উল্টো ঘুরে ফিরতি পথে ছুটল রানা। মিনিটদুই যেতেই দেখা পেল জ্যাকবের। ওকে দেখে থামল সে। হাঁপাচ্ছে। ভাঙা গলায় জানতে চাইল, 'কী

ব্যাপার, রানা? উল্টোপথে ছুটছ কেন?'

'ড্যানি...' বলল রানা, 'চুরি করছে রেসে। ওকে আমি শর্টকাট নিতে দেখে এসেছি।'

'আর কী-ই বা আশা করা যায় ওর কাছে? ফেয়ার ফাইট বলে কিছু নেই ওর অভিধানে। যেভাবে পারে জিতবে। চুরি যে করছে, সেটা প্রমাণ করতে পারবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তাই বলে ছেড়ে দেব?'

'না ছেড়েই বা উপায় কী? ওকে তো আর ধরতে পারব না দৌড়ে।'

'আমি পারব,' রানা বলল। 'কিন্তু তার জন্য আমাকেও শর্টকাট নিতে হবে। সেটা ঠিক হবে না।'

'কে বলেছে?' হাসল জ্যাকব। 'এমনিতেও তুমি রেসে চ্যাম্পিয়ন হতে, যেভাবে দৌড়াচ্ছ তাতে কেউ তোমাকে ধরতে পারত না। একটা চোরের কাছে হার মানবে কেন? তারচেয়ে ওর ওষুধ ওকেই দেয়া উচিত না?'

'তুমি শিয়োর?'

'অবশ্যই! কিচ্ছু ভেবো না, এদিকটা আমি সামলে নেব... দেখব কেউ যাতে কিছু না বলে। যাও তুমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পাশ ফিরল রানা। ট্র্যাক ছেড়ে ঢুকে পড়ল ঝোপঝাড়ের মাঝে। শুরু করল দৌড়। দুর্গম পথ—পাথর, মরা ডালপালা, লতাপাতা আর কাদায় ভরা। ঝোপের ঘষায় হাত-মুখের চামড়ায় আঁচড় পড়ল, লতায় পা বেধে পড়ে যাবার উপক্রমও হলো একবার, কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে ছুটতে থাকল ও। যেভাবেই হোক, ড্যানির নাগাল পেতে চায়।

একটু পরেই পেল। বনভূমির শেষ প্রান্তে ছেলেটাকে দেখতে পেল ও, ছুটছে পাগলের মত। বনের সীমানা পেরুলেই ট্র্যাকের শেষাংশ, ওটা ধরে বেরিয়ে যাবে খোলা ময়দানে... পৌঁছুবে

ফিনিশিং লাইনে। কিন্তু রানা সেটা হতে দিতে পারে না। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল ও, দু'জনের মাঝের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে চায়।

সহজ নয় কাজটা—দুর্বল ও পরিশ্রান্ত বোধ করছে রানা। ওর চেয়ে অনেক কম দৌড়েছে ড্যানি, তা ছাড়া উল্টো ঘুরে জ্যাকবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মূল্যবান সময় আর শক্তির অপচয় করেছে ও। তাই বলে ছাড় দেয়া যায় না, ক্রোধ ভর করেছে রানার মাঝে। স্রেফ দুর্মর ইচ্ছেশক্তির জোরে পা-দুটোকে ছুটতে বাধ্য করল ও।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। পুরো শরীর প্রতিবাদ জানাচ্ছে... বলছে ওকে থেমে যেতে। কিন্তু মন বলছে ঠিক বিপরীত কথা। দ্বিমুখী টানাপোড়েনের মাঝে একরোখার মত দৌড়ে চলা। চেতনা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শরীর থেকে। না, হার মানবে না রানা। পারতেই হবে ওকে।

গাছপালার সারির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ড্যানি, কিন্তু সে-ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কমিয়ে ফেলেছে গতি। আর ঠিক তখুনি একটু ঢালু জমি পেয়ে নতুন উদ্যম অনুভব করল রানা। দাঁতে দাঁত পিষে ছিটকে আগে বাড়ল ও, ঢালু জমি জোগাল বাড়তি গতি... উল্কার মত দৌড়াচ্ছে এখন। ড্যানিকে অতিক্রম করা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

অনেক দেরিতে ওর উপস্থিতি টের পেল ড্যানি। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে চমকে উঠল। পরমুহূর্তে রাগে লাল হয়ে উঠল চেহারা। কিন্তু সেসবের পরোয়া করল না রানা, ধরে ফেলল ওকে। পাশাপাশি ছুটছে এখন দু'জন। শুধু তা-ই না, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়েও যাচ্ছে রানা।

কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে মাথা খারাপ হয়ে গেল ড্যানির। ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চাইল রানাকে। কিন্তু তৈরি ছিল ও, লাফ দিয়ে এড়াল ড্যানির পা। লক্ষ্যে আঘাত হানতে না পেরে

হোঁচট খেল ড্যানি, হারাল ভারসাম্য। তালগোল পাকিয়ে আছড়ে পড়ল পথের পাশের কাদায়। ছপাৎ আওয়াজ শুনল রানা, কিন্তু সেদিকে তাকাল না। মনোযোগ নষ্ট করবে না... রেস এখনও শেষ হয়নি।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই খোলা ময়দানে বেরিয়ে এল ও। চোখে পড়ল অপেক্ষমাণ দর্শকদের জটলা। ওকে দেখতে পেয়েই হল্লা করে উঠল তারা, তবে রানা সেটা শুনতে পেল না। আচ্ছন্নের মত লাগছে ওর, দৃষ্টি ঘোলা। ঘামে সপসপ করছে শরীর, নোনা ঘামের স্পর্শে জ্বলছে চোখ। টলমল পায়ে কিছুদূর গিয়েই থেমে গেল। আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে, পড়ে যাচ্ছে।

'কাম অন, রানা! থেমো না! গড ড্যাম ইট!'

পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেয়ে আচমকা সিধে হলো ও। চোখ পিটপিট করতেই দেখতে পেল মি. স্যালিসবারিকে। ফিনিশিং লাইনের ওপারে, ফিতার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দু'পাশে মিং আর ডেভিড। ওরাও চিৎকার করছে ওর উদ্দেশে।

'চলে এসো, রানা! আর একটু! আর কেউ তোমার ধারেকাছে নেই!'

কষ্ট করে ঘাড় ফেরাল রানা, ড্যানিকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের পথ ফাঁকা। বড় করে শ্বাস নিয়ে শরীরে শেষ শক্তিটুকু একত্র করল ও। টলমল পায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছুল ফিনিশিং লাইনে। ফিতাটা জড়িয়ে গেল বুকের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শকেরা।

হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল রানা। এতক্ষণ চেপে রাখা সমস্ত ব্যথা-বেদনা হামলা চালাল সঙ্গে সঙ্গে। চোখের সামনে আতশবাজির মত জ্বলে উঠল লাল-নীল ফুলকি। মনে হলো বিস্ফোরিত হবে খুলির ভিতরটা। হাড়গোড়, পেশি... সব কাতরে উঠল যন্ত্রণায়। দম আটকে আসার জোগাড়। ককিয়ে উঠল ও।

কে যেন ধরাধরি করে দাঁড় করাল ওকে। চোখ খুলতেই মি. স্যালিসবারিকে দেখতে পেল।

‘শুয়ে থেকো না,’ বললেন তিনি। ‘সারা শরীর অসাড় হয়ে যাবে। হাঁটাচলা করো।’

‘জী, স্যর। সরি, খেয়াল ছিল না।’

‘সরি বলার কিছু নেই,’ হাসলেন স্যালিসবারি। ‘তুমি তো জিতেছ! আমি জানতাম তুমি পারবে।’

‘সেকেণ্ড কে হয়েছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘এখনও হয়নি, হতে চলেছে। ওই তো... পৌঁছুল এইমাত্র।’

জ্যাকবকে ফিনিশিং লাইন পেরুতে দেখল রানা। তার ঠিক পিছনেই দেখা গেল ড্যানির কাদামাখা মূর্তি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তৃতীয় হিসেবে দৌড় শেষ করল সে। হৈচৈ করে এগিয়ে এল দর্শকদের একাংশ—পাঁজাকোলা করে জ্যাকবকে তুলে ফেলল ঘাড়ে-মাথায়—ড্যানিকে হারানোয় ট্রফি জিতে গেছে সে। একা হয়ে গেল ড্যানি, সাগরেদরা সবাই মার্শালের দায়িত্ব পালন করতে গেছে, তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল সে, মুখ ঢাকল দু'হাতে। পিতার দিকে তাকাতে পারছে না

গটমট করে হেঁটে ছেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন লর্ড গ্রিফিন, দু'চোখে তীব্র ঘৃণা। এতকিছুর পরেও তাঁর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি ড্যানি, ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছেন না কিছুতেই। মনে হচ্ছে থুতু দেবেন ছেলের গায়ে। দৃশ্যটা অস্বস্তিকর।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বাবার দিকে মাথা তুলল ড্যানি। ওর কাদামাখা গাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। ভাঙা গলায় বলল, ‘আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি, বাবা...’

‘হুঁহ্!’ ক্রুদ্ধ একটা আওয়াজ করলেন লর্ড গ্রিফিন, কৈফিয়ত শুনতে চান না। ঝট করে ঘুরে গিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। ফিরে তাকালেন না ছেলের দিকে।

চোখ মুছতে গিয়ে রানার উপর দৃষ্টি পড়ল ড্যানির। ফুঁসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি! তুমিই সব নষ্টের গোড়া!'

'বাদ দাও, ড্যানি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'তোমার খেল খতম।'

'কিছুই খতম হয়নি।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওর কাছে এল ড্যানি। 'ভান কোরো না। আমাকে কোনোদিনই ধরতে পারার কথা না তোমার, যদি না...'

'যদি না কী, ড্যানি?' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল রানা। 'যদি না রেসে চুরি করে থাকি আমি? যদি না বেআইনি কোনও পন্থা খাটিয়ে থাকি?' গলা চড়াল ও। 'তা হলে তুমি কীভাবে তৃতীয় হয়েছ, সেটাও যাচাই করা হোক। ক'জন তোমাকে পুরো ট্র্যাকে দৌড়াতে দেখেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। কোথায় কাদায় গড়াগড়ি খেয়েছ, সেটাও নাহয় দেখে আসুক সবাই।'

ভিড় জমতে শুরু করেছে চারপাশে। মি. স্যালিসবারিও তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছেন। সাহস হারাল ড্যানি। নেতিয়ে গেল। মিনমিন করে বলল, 'না, ওসবের কোনও দরকার নেই।'

ভিড় ঠেলে চলে গেল সে। ওর পিছনে হেসে উঠল সবাই। টিপ্পনী কাটতেও ছাড়ল না কেউ কেউ।

কিন্তু সেই হাসিতে শামিল হতে পারল না রানা। তেতো ঠেকছে মুখের ভিতরটা। বুঝতে পারছে, কিছুই শেষ হয়নি। ড্যানির সঙ্গে শত্রুতা গাঢ় হলো আরও। এর ফল শুভ হতে পারে না।

আট

প্রিয় রানা,

কেমন আছ তুমি? স্কুলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? ইস্টারের ছুটি তো ঘনিয়ে এল, তাই চিঠি লিখতে বসলাম। তোমার চাচার শরীর হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে, ডাক্তারের পরামর্শে স্কটল্যাণ্ডের কিথলি-তে ওকে নিয়ে এসেছি, তাজা আলো-বাতাসে স্বাস্থ্যের যদি উন্নতি হয়! এ-জায়গার কথা আগেই বলেছি তোমাকে—তোমার মরহুম ফুপার বাড়ি রয়েছে কিথলিতে। খুব ভাল হয় তুমিও যদি ছুটি কাটাতে এখানে চলে আসো। লণ্ডনের বাড়িতে আপাতত কেউ নেই। আমাদেরও খুব ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখতে। চিঠির সঙ্গে টিকেট আর হাতখরচ পাঠালাম। আশা করি শীঘ্রি তোমার দেখা পাব। ভাল থেকো। আদর আর শুভকামনা রইল।

তোমার ফুপু,
ইসমাত আরা।

ট্রেনের কামরায় বসে চিঠিটা আবার পড়ছে রানা, মন বিষণ্ন চাচার অসুস্থতার খবর পেয়ে। পৃথিবীতে এ-মুহূর্তে আপনজন বলতে এরফান চাচা আর ইসমাত ফুপু ছাড়া আর কেউ নেই ওর। তাঁদের কারও যদি কিছু হয়ে যায় তো সে-আঘাত সহ্য করা

অসুস্থ হয়ে পড়বে ওর জন্য। এমনিতেই মানসিকভাবে যথেষ্ট পর্যুদস্ত ও। সাজানো গোছানো জীবন তছনছ হয়ে গেছে বছরখানেক আগে বাবা-মা'র অকালমৃত্যুতে। সরকারি একটি অনুষ্ঠান অ্যাটেণ্ড করতে সস্ত্রীক চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরি। অনুষ্ঠানশেষে সড়কপথে ফিরে আসছিলেন ঢাকায়, তখুনি বেপরোয়া এক ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে তাঁদের সরকারি গাড়ির। ঘটনাস্থলেই মারা যান ইমতিয়াজ চৌধুরি ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা। অনাথ হয়ে যায় তাঁদের একমাত্র সন্তান রানা। স্কুল খোলা থাকায় চট্টগ্রাম যাওয়া হয়নি ওর, নইলে ওরও হয়তো একই পরিণতি হতো। কে জানে, সেটাই বুঝি ভাল ছিল। পিতামাতা হারাবার দুঃসহ যন্ত্রণা তাহলে সইতে হতো না ওকে!

সে এক ভয়ানক দুঃসময় গেছে। পাগল হবার দশা হয়েছিল রানার। দেশে আত্মীয়স্বজন বলতে কেউই ছিল না—দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাই পৃথিবীর মায়া ছেড়েছেন বহুদিন আগে, মামা-খালাও ছিল না কোনও। ছিলেন শুধু এরফান চাচা আর ইসমাত ফুপু—ইমতিয়াজ চৌধুরির ব্রিটেন-প্রবাসী সহোদর ও সহোদরা। লেখাপড়া শেষ করে লণ্ডনে ব্যবসা করছেন এরফান চৌধুরি, ইসমাত আরাও স্কটিশ এক সহপাঠীকে ভালবেসে বিয়ে করে থিতু হয়েছেন ইংল্যাণ্ডে। ভাই ও ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর খবর শুনে তাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন দেশে, দাফন-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি শেষে রানাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ইংল্যাণ্ডে। কাঁধে তুলে নিয়েছেন ওর সমস্ত দায়দায়িত্ব।

আদর-স্নেহে রানাকে আগলে রেখেছেন দু'জনে। ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন বাবা-মা হারানোর বেদনা। এ শুধু সহানুভূতি বা সমবেদনা নয়, সত্যিকার ভালবাসা। চাচা-ফুপু দু'জনেই নিঃসন্তান। ব্যবসা দাঁড় করাবার চেষ্টায় এতই ব্যস্ত ছিলেন এরফান চৌধুরি, কোনোদিন বিয়ে করেননি। ইসমাত যা-ও বা

করেছিলেন, সন্তানের মুখ দেখবার আগেই দুরারোগ্য এক ব্যাধির কারণে হারিয়েছেন স্বামীকে। দু-ভাইবোনের নিঃসঙ্গ জীবনে যেন নতুন এক কিরণ হয়ে এসেছে রানা। ওকেই সন্তান বলে মেনে নিয়েছেন তাঁরা।

ফুপুর লণ্ডনের বাড়িতে বিগত বছরের প্রায় পুরোটা কাটিয়েছে রানা। নিজেকে বন্দি করে রেখেছিল চার দেয়ালের মাঝে। স্কুলে ভর্তি হয়নি, কোথাও বেড়াতে যায়নি, বন্ধুত্ব করেনি কারও সঙ্গে। ফুপুও কখনও জোর-জবরদস্তি করেননি, ওকে থাকতে দিয়েছেন নিজের মত। ভেবেছেন শোক কাটিয়ে নেবার জন্য ওর কিছুটা সময় দরকার। চাচা ব্যস্ত মানুষ, তারপরেও উইকএণ্ড বা ছুটির দিন পেলেইরানার জন্যে কিছু না কিছু কিনে নিয়ে চলে আসতেন, সময় কাটাতেন ওর সঙ্গে। তাঁরা দু'জনেই শুধু সঙ্গী ছিলেন ওর।

বছর গড়ালে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন তাঁরা। শোক কাটাবার জন্য যে-স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল রানাকে, তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল হবারই আশঙ্কা বেশি। নিজেকে একেবারে গুটিয়ে ফেলছে ও—হয়ে উঠছে অন্তর্মুখী, অসামাজিক। লেখাপড়াও হচ্ছে না তেমন। একাধিকবার বলে বা বুঝিয়েও কাজ হয়নি, রানা তাঁদের কথা শুনছে না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে একটু কঠোর হবার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। ঠিক করেন, বোর্ডিং স্কুলে পাঠাবেন ওকে। কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা, রুটিনবাঁধা পরিবেশ আর সমবয়েসী ছেলেদের মাঝে সময় কাটাতে বাধ্য হলে আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যাবে সব। তাই বলে ওকে যেনতেন স্কুলে পাঠাননি তাঁরা, পাঠিয়েছেন ইটনে—শুধু ইংল্যাণ্ড নয়, সারা দুনিয়ার সবচেয়ে নামকরা ও বনেদি স্কুলগুলোর একটিতে। এমনিতে ইটনে ভর্তি হওয়া সহজ নয়, সমাজের একেবারে উঁচুতলার মানুষেরাই শুধু পারে তাদের সন্তানকে ইটনে পাঠাতে। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন এরফান চৌধুরি—সাহায্য নিয়েছেন প্রভাবশালী

কিছু ব্রিটিশ বন্ধুর, বিশেষ স্কলারশিপের অধীনে ভাতিজাকে ভর্তি করেছেন ইটনে, ভর্তি পরীক্ষাও দিতে হয়নি ওকে।

বোর্ডিং স্কুলের কথা শুনে শুরুতে রাগ হয়েছিল রানার, এরপর অভিমান... মনে হয়েছিল বুঝি ওকে তাড়াতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন চাচা আর ফুপু। সেই অভিমানে ঘর ছেড়েছিল, টুঁ শব্দ করেনি, নির্বাসন ভেবে নিয়েছিল ইটনকে। কিন্তু স্কুলে কিছুদিন কাটাবার পর ভেঙে গেছে ওর ভুল ধারণা। নিস্তরঙ্গ জীবন ফের রঙিন হয়ে উঠেছে অকৃত্রিম কিছু বন্ধু ওঅকৃত্রিম শত্রু পেয়ে! নতুন করে ছন্দ খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। বুঝতে পেরেছে, এখানে পাঠিয়ে আসলেই ওর মঙ্গল করেছেন চাচা আর ফুপু। কৃতজ্ঞতা বেড়েছে তাঁদের প্রতি... বেড়েছে ভালবাসা। এখন রানাও তাঁদের দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। ইস্টারের ছুটিতে চলেছে স্কটল্যাণ্ডে... ফুপার এস্টেটে। সরাসরি যাবার উপায় নেই বলে ট্রেনে চেপে প্রথমে লণ্ডন যাচ্ছে, সেখান থেকে দ্বিতীয় আরেকটা ট্রেন ধরে যাবে কিথলিতে।

সিটে হেলান দিল রানা। ভাবল স্কুলের কথা। গ্রিফিন কাপের প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর কেটে গেছে পুরো দু-দুটো সপ্তাহ। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি এর মাঝে। ঘটবার সুযোগও ছিল না অবশ্য। দু'সপ্তাহের প্রায় পুরোটাই গেছে টার্ম-সমাপনী বিভিন্ন পরীক্ষা ও ক্লাসে। লেখাপড়া নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে সবাইকে, অন্য কিছু করবার সুযোগ ছিল না। জ্যানিকে এড়িয়ে চলেছে রানা, সে-ও আর কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করেনি। দূরত্ব বজায় রেখেছে। ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও মতলব ভাঁজছে প্রতিশোধ নেবার, তার প্রতিফলন ঘটবে ছুটি থেকে ফেরার পর। তবে এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না রানা। যখনকারটা তখন দেখা যাবে।

ছুটির আমেজে রয়েছে ও। ভাল লাগছে অনেকদিন পর

স্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরতে পারায়। মনে হচ্ছে যেন ফিরে পেয়েছে নিজেকে। ইটনে তার উপায় নেই। সবসময় ফিটফাট বাবু সেজে থাকতে হয়—ভাল লাগে না ওর।

তিনজনের সঙ্গে ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট শেয়ার করছে রানা, তাদের একজন জিম বুচার। বাড়ি ফেরার আনন্দে কলকাকলি করছে সবাই। রানা চুপচাপ দেখে পাশে এসে বসল জিম। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? এত চুপচাপ কেন? ছুটিতে যেতে ভাল লাগছে না বুঝি?'

'তা-ই কী হয়?' হাসল রানা। 'আসলে নতুন জায়গায় যাচ্ছি কি না...'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'স্কটল্যাণ্ডে। আমার ফুপুর কাছে। গ্রাম্য এলাকা বলে শুনেছি, শহুরে আনন্দের উপকরণ কিছুই নেই।'

'তাতে কী? আমি তো লণ্ডনে যাচ্ছি, তাই বলে কি যেমন খুশি আনন্দ করতে পারব ভেবেছ? আমার বাবা-মা খুব কড়া। শকুনের মত নজর রাখেন আমার উপর। একটু ডান-বাম করার উপায় নেই। তারপরেও ওর মাঝেই যতটুকু সম্ভব উপভোগ করতে হবে ছুটিটা। তোমাকেও সে-পরামর্শই দেব।'

'থ্যাঙ্কস।'

গল্প করতে করতে যাত্রার বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দিল দু'জনে। প্যাডিংটন স্টেশনে পৌঁছে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এসকেলেটর ধরল, নেমে এল আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশনে। পাতালরেলে চেপে *কিংস ক্রস* স্টেশনে যেতে হবে ওকে, সেখান থেকে উঠবে স্কটল্যাণ্ডগামী আরেকটা ট্রেনে।

ঢাকার লোকাল বাসের সঙ্গে পাতালরেলের বিশেষ পার্থক্য নেই। নোংরা কম্পার্টমেন্ট, যাত্রীদের গাদাগাদি, সেইসঙ্গে ঘাম

আর সিগারেটের ধোঁয়ার বিশ্রী দুর্গন্ধ। সিট পেল না রানা, কোনোমতে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে নিল এক কোণে। ধরবার মত কিছু নেই, আঁকাবাঁকা ট্র্যাকে যখনই মোড় নিচ্ছে ট্রেন, হুমড়ি খেয়ে পড়বার জোগাড়! খুবই অস্বস্তিকর পরিবেশ।

কিংস ক্রস স্টেশনে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। স্টেশনটা খোলামেলা, পরিচ্ছন্ন। কাঁচ আর লোহা দিয়ে গড়া ছাতটা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। পরের ট্রেন ধরবার আগে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে এখানে। প্ল্যাটফর্ম নম্বর দেখে নিয়ে স্টেশনের ক্যাফেতে ঢুকল রানা, দুধ আর বনরুটির অর্ডার দিল। খাবার এসে গেলে খেতে খেতে চোখ বোলাল বাইরে।

বিচিত্র সব মানুষের সমাবেশ চলছে যেন—পুরো স্টেশনজুড়ে নানা জাতের, নানা বয়সের, নানা ধরনের মানুষ ছোটাছুটি করছে। কেউ যাচ্ছে, কেউ আসছে। খুঁটিয়ে তাদেরকে দেখতে শুরু করল রানা, ছেড়ে দিল কল্পনার লাগাম। পুরোটাই এক ধরনের খেলা—অচেনা মানুষকে দেখে গল্প সাজায় ও। ওই যে... কোনায় লম্বা ওভারকোট পরা সন্দেহজনক চরিত্রের একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে তাকে একজন মাস্টার ক্রিমিনাল বলে কল্পনা করল ও, পরের অপরাধ ঘটাবার আগে রেকি করে নিচ্ছে ঘটনাস্থল। মিঙ্ক কোট আর মুক্তার মালা পরা এক সুন্দরী যুবতী ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে—রানার কল্পনায় সে এক নির্মম খুনি... স্বামীকে খুন করে স্টেশনে এসেছে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, দু'জনে একসঙ্গে পালাবে। খোঁচাখোঁচা দাড়িআর লাগেজের বহর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক—দুর্ধর্ষ এক অ্যাডভেঞ্চারার, রওনা হয়েছে অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকার উদ্দেশে...

কল্পনার জগতে ডুব দিয়ে অপেক্ষার সময়টা নিমেষে কাটিয়ে দিল রানা। ঘোর কাটল লাউডস্পিকারের ঘোষণায়। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা।

'যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ফোর্ট উইলিয়াম হয়ে এডিনবরা-গামী সাড়ে সাতটার নর্থ-ইস্টার্ন স্লিপিং কার এক্সপ্রেস এখন ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। যাত্রীদেরকে তাদের আসন নেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।'

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল রানা। ওটাই ওর ট্রেন। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ক্যাফে থেকে। এগোল ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। ইতিমধ্যে লাইন পড়েছে এণ্ট্র্যান্সে। টিকেট কালেক্টরকে টিকেট দেখিয়ে এক সারিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে যাত্রীরা। লাইনের পিছনে অবস্থান নিল ও। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। তাড়াতাড়ি হাত দিল পিছনে, হাতটা বেধে গেল আরেকটা হাতের সঙ্গে। কেউ একজন ওর ব্যাকপকেটে হাত দিয়েছে! পকেটমার!

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। মুখোমুখি হলো লালচুলো শীর্ণদেহী এক কিশোরের। বয়সে রানার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় হবে হয়তো। ধরা পড়ে গিয়ে বোকার হাসি হাসল সে। বলল, 'হাই! আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো, মেইট?'

চোর চোর বলে চেঁচিয়ে ওঠা উচিত রানার, কিন্তু কেন যেন পারল না। কড়া গলায় বলল, 'এসবের মানে কী? আমার ওয়ালেট চুরি করতে চাইছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ছেলেটা। 'কিন্তু নিতান্তই নিরুপায় হয়ে। টিকেট কেনার টাকা নেই আমার কাছে।'

'কীসের টিকেট?'

'স্কটল্যাণ্ড যাবার। বিশ্বাস করো, যাওয়াটা খুব জরুরি।'

'তার জন্য পকেট মারতে হবে কেন? টিকেট ছাড়াই উঠে পড়ো ট্রেনে। তারপর লুকিয়ে থাকলেই হলো।'

এণ্ট্রান্সের দিকে ইশারা করল ছেলেটা। 'টিকেট না দেখালে প্ল্যাটফর্মেই ঢুকতে দিচ্ছে না। ট্রেনে উঠব কীভাবে? লুকানো তো

পরের কথা। একটু সাহায্য করো না, ভাই!'

ঠোঁট কামড়াল রানা। সঙ্গে বাড়তি টাকা নেই যে টিকেট কেনার জন্য ধার দেবে। তা ছাড়া একজন পকেটমারকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা উচিত নয়। কিন্তু কেন যেন মানা করে দিতে পারল না, মন্দ ছেলে বলে মনে হচ্ছে না একে। বোঝা যাচ্ছে, বিপদে পড়ে সত্যিকার সাহায্য চাইছে। কী যেন এক অজানা আকর্ষণও আছে ছেলেটার মাঝে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়ায় রোমাঞ্চের আহ্বান। রানার মাঝেও সংক্রামিত হলো তা।

'কী করতে হবে?' জানতে চাইল ও।

'বেশি কিছু না। কালেক্টরকে একটু ব্যস্ত রাখতে পারবে, যাতে ওর চোখ এড়িয়ে আমি ঢুকে যেতে পারি?'

একটু ভাবল রানা। তারপর বলল, 'দেখছি কী করা যায়।'

'থ্যাঙ্কস।' চোখ টিপে চলে গেল ছেলেটা।

টিকেট কালেক্টরের সামনে পৌঁছে অভিনয় শুরু করল রানা। ভাব দেখাল যেন টিকেট খুঁজে পাচ্ছে না, হাতড়াতে থাকল জামাকাপড়ের সমস্ত পকেট। একটু পরে পাওয়ার ভান করল, কিন্তু নড়ল না জায়গা ছেড়ে। ট্রেন কখন ছাড়বে, কোন্ পথে যাবে, ক'টায় কোথায় পৌঁছুবে, ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন করে ব্যস্ত করে তুলল কালেক্টরকে। লোকটা প্রথমে ধৈর্য ধরে জবাব দিল ওর প্রশ্নের, কিন্তু খানিক পরেইবিরক্ত হয়ে উঠল। ততক্ষণে রানার পিছনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। ঠেলা দিয়ে ওকে প্ল্যাটফর্মে পাঠাতে চাইল কালেক্টর, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রানা। আঁতকে উঠল লোকটা, ওকে সাহায্য করবার জন্য ঝুঁকল, ফলে মনোযোগ সরে গেল এন্ট্র্যান্স থেকে; আড়চোখে তখুনি লালচুলো ছেলেটাকে ওখান দিয়ে ঢুকে যেতে দেখল রানা।

আর অভিনয়ের প্রয়োজন নেই, উঠে দাঁড়াল ও। গায়ের ধুলো ঝাড়ল। টিকেট কালেক্টরকে বলল, 'আমি ঠিক আছি। ধন্যবাদ।'

'ব্যথা পাওনি তো?' বলল লোকটা, বিব্রত। 'আমি বোধহয় একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি।'

'না, না, আমারই দোষ। আমিই তো বিরক্ত করছিলাম আপনাকে। কিছু মনে করবেন না।'

'দূর, ওসব কিছু না,' বলল কালেক্টর। 'এখন জলদি গিয়ে ট্রেনে ওঠো। তোমার জন্য বাকি সবাই ট্রেন মিস করবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আসি।'

ব্যাগ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল ও। খুঁজে নিল নিজের কম্পার্টমেন্ট। ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট পাঠিয়েছেন ফুপু, ট্রেনের একেবারে সামনের দিকে ওটা, ডাইনিং কারের লাগোয়া। নম্বর মিলিয়ে নিজের কেবিনের সামনে গেল রানা, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ছোট্ট কেবিন। দুটো বাঙ্ক আর একটা ওঅশবেসিন রয়েছে ভিতরে। উপরের বাঙ্কটা গোটানো। সিটের উপর ব্যাগ রেখে জানালার পাশে বসল রানা। ব্যাগ থেকে একটা গল্পের বই বের করে পড়তে শুরু করল, কিন্তু এক পাতার বেশি এগোতে পারল না। মন চলে গেল জানালার বাইরে। শেষ মুহূর্তের যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে উঠছে ট্রেনে, দেখতে থাকল তাদেরকে।

ট্রলি নিয়ে দু'জন পোর্টারকে শশব্যস্ত হতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল—ব্যাগ-সুটকেস মিলিয়ে অন্তত পাঁচ-সাত রকমের লাগেজ বহন করছে তারা। এত লাগেজ নিয়ে সাধারণত কেউ ভ্রমণ করে না। জানালার পাশ দিয়ে ট্রলিটা যাবার সময় চোখ পড়ল একটা সুটকেসের গায়ে লাগানো ট্যাগে, সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল। ড্যানিয়েল গ্রিফিনের নাম লেখা ওতে। এক মুহূর্ত পর ড্যানিকেও দেখতে পেল—পোর্টারদের পিছন পিছন আসছে, ধমকাধমকি করছে তাদেরকে। অন্য ট্রেনে নয়, এই ট্রেনেই উঠবে সে। ছুটি কাটাতে সে-ও স্কটল্যাণ্ডে তাদের

পারিবারিক এস্টেটে চলেছে।

মনে মনে কপাল চাপড়াল রানা, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে ড্যানির সঙ্গে এক ট্রেনে যেতে হচ্ছে। ও-ও নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী, তারমানে যাত্রাপথে ট্রেনের ভিতরে দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ হবেই। এড়ানোর উপায় নেই। হতাশায় মাথা নেড়ে বইটা আবার তুলে নিল ও। ডুবে যেতে চাইল গল্পের ভিতরে। একটু পরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের প্রলম্বিত হুইসেল।তারপর দুলে উঠল গোটা কম্পার্টমেণ্ট,মৃদু ঝাঁকুনি খেয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন। আলোকিত প্ল্যাটফর্ম সরে যেতে থাকল জানালার পাশ থেকে।

ধীরে ধীরে গতি বাড়ল ট্রেনের। সেইসঙ্গে চাকার ছন্দোবদ্ধ ঝিকঝিক আওয়াজ। আরামদায়ক দুলুনিতে চোখ লেগে এল রানার, কিন্তু খানিক পরেই তন্দ্রা টুটে গেল কেবিনের দরজায় করাঘাত শুনে।

'কাম ইন।'

দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল একটা পরিচিত মুখ। স্টেশনের সেই লালচুলো কিশোর। রানাকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো চেহারা। বলল, 'যাক, পাওয়া গেল তোমাকে! ধন্যবাদ জানাব বলে সেই কখন থেকে খুঁজে মরছি!'

'আরে দূর! এতে ধন্যবাদ দেবার কী আছে?' বলল রানা। 'ভিতরে এসো।'

কেবিনে ঢুকল ছেলেটা। দরজা টেনে দিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ না দিয়ে উপায় আছে? পুলিশে ধরিয়ে দিলে না, বরং এত বড় একটা উপকার করলে আমার! ছেলেও ভীষণ চালু তুমি, কীভাবে ধরে ফেললে আমাকে! এর আগে কতজনের পকেট মেরেছি, কেউ কোনোদিন টের পায়নি। নিজেকে পাকা পকেটমার ভাবতাম... এখন বুঝতে পারছি, ধারণাটা ভুল।'

'এখানে আবার চুরি করতে আসোনি তো?'

'ছি, ছি! কী যে বলো! উপকারীর অপকার করতে শিখিনি আমি। সম্ভব হলে পাল্টা উপকার করব, দেখে নিয়ো।'

'চুরি করাই ছেড়ে দাও না কেন? খুব খারাপ অভ্যেস।'

'ইচ্ছে করে করি ভেবেছ? করি অবস্থার চাপে,' কাঁধ ঝাঁকাল ছেলেটা। 'যাক গে, খুব ভাল ছেলে তুমি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।' হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি রব রাইলি। বন্ধুরা বলে *রেড রাইলি*। সংক্ষেপে রেড বলেও ডাকতে পারো। মাথার চুল লাল কিনা, তাই এমন নাম।'

হেসে হাত মেলাল রানা। 'আমি মাসুদ রানা। সংক্ষেপে রানা বলে ডাকলেই চলবে।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। তোমার এখানে কিছুক্ষণ বসতে পারি, রানা?'

'নিশ্চয়ই,' সিট থেকে ব্যাগ নামিয়ে রাখল রানা। 'বসো।'

বসল রেড। জিজ্ঞেস করল, 'স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। ফোর্ট উইলিয়ামে নামব।'

'বেড়াতে যাচ্ছ, নাকি ওখানেই থাকো?'

'বেড়াতে। তুমি?'

'অনেকটা সেরকমই। একটু কাজও আছে। এই প্রথম যাচ্ছি ওদিকে। জায়গাটা কেমন কে জানে।'

'আমারও প্রথম। তবে আবহাওয়া আর পরিবেশ ভাল বলে শুনেছি। শীত আর গরম... দুটোই একটু বেশি, এই যা।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল রেড। 'আসলে হয়েছে কি, জানো? বাড়ি ছেড়ে এতদূরে আগে কখনও যাইনি আমি। লণ্ডনের বাইরেই কখনও যাওয়া হয়নি আমার। ছুটিছাটায় বড়জোর কেন্ট বা মারগেট পর্যন্ত গেছি, ব্যস। লম্বা ট্রেনজার্নি কেমন হয়, কিছুই জানি না। এই দুলুনির মধ্যে রাতে ঘুমুতে পারব তো?'

'পারবে,' মুখে হাসি ফুটিয়ে রেডকে আশ্বাস দিল রানা। প্রসঙ্গ

পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'স্কটল্যাণ্ডে কার কাছে যাচ্ছ? ওখানে কোনও আত্মীয় আছে তোমার?'

'আত্মীয় আমার সবখানেই আছে, মেইট। আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ কিনা!' গর্ব ফুটল গলার স্বরে। 'গত শতাব্দীর শুরুতে দলে দলে আইরিশ মানুষ এসেছিল এ-দেশে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গড়ে তুলেছে ব্রিটেনকে। তারপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে গোটা দেশে। এই যে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছ... খোঁজ নিয়ে দেখো, রেললাইনটা হয়তো আইরিশ শ্রমিকেরাই বানিয়েছে।'

'তাই নাকি? আইরিশদের এত অবদানের কথা জানতাম না তো।'

'জানবে কী করে? ব্রিটিশরা সব ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। যাক গে, আপাতত আমি যাচ্ছি আমার বিধবা চাচির কাছে। কিথলি নামে একটা জায়গায় থাকেন তিনি।'

'তা-ই? আমিও তো কিথলিতেই যাচ্ছি।'

'সত্যি?' ভুরু কোঁচকাল রেড। 'তুমিও যাচ্ছ ওখানে? ভালই হলো, প্রয়োজনে তোমার সাহায্য নেয়া যাবে।'

'আবার?' হাসল রানা। 'কী সাহায্য চাই ওখানে?'

'আমার চাচাতো ভাই রডনি নিখোঁজ। ওকে খোঁজার জন্যেই আসলে আমি যাচ্ছি কিথলিতে।'

'নিখোঁজ মানে? কীভাবে নিখোঁজ হলো?'

'কেউ সঠিক জানে না। বাড়ি থেকে মাছ ধরার সরঞ্জামও গায়েব, তাই ধারণা করা হচ্ছে কোথাও মাছ ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা কোথায়, কেউ জানে না। চাচা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে, এখন ছেলেকেও হারিয়ে চাচির প্রায় মাথা-খারাপ দশা। কেউ কিছু করছেও না। আইরিশ ছেলে হারিয়েছে বলে পুলিশের মাথাব্যথা নেই, নামকাওয়াস্তে একটা রিপোর্ট লিখে রেখে দিয়েছে। তাই ভেবে দেখলাম যা করার আমাকেই করতে

হবে। আইরিশদের সমস্যা আইরিশদেরকেই মেটাতে হয়।' কণ্ঠে বিষাদ ফুটল রেডের।

'কী ঘটেছে বলে মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোথায় হারাল তোমার চাচাতো ভাই?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে-টুবে গেছে হয়তো। ওখানে গিয়ে ভালমত তল্লাশি চালাতে হবে।'

'হুম। সেক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব আমি।'

'একটা সাহায্য এখুনি দরকার।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে আনল রেড। 'আমাকে একটু লুকিয়ে রাখতে পারবে?'

'মানে!'

'মানে টিকেট চেকার যখন আসবে আর কী।'

একদৃষ্টে রেডের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রানা। আবদারটা একটু বেশিই করে ফেলছে সে। কিন্তু মানা করতে পারল না। পাগলাটে ছেলেটাকে কেন যেন খুব পছন্দ হয়েছে ওর। অদ্ভুত একটা প্রাণশক্তি আছে তার মধ্যে... আছে মুহূর্তেই কাউকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। মনে হচ্ছে ওকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না।

'চিন্তা কোরো না, আমি তোমাকে বিপদে ফেলব না,' রানার উরুতে চাপড় মেরে বলল রেড। 'ধরা পড়ে গেলে বলব, আমি তোমাকে বন্দুক দেখিয়ে বাধ্য করেছি... তোমার কিছু করার ছিল না।'

'বন্দুক আছে তোমার কাছে?' রানার প্রশ্ন। 'যদি দেখতে চায়?'

'ধ্যাত্তেরি! ঠিক আছে, যাও... বলব আমি তোমার গলা টিপে ধরেছিলাম।'

খিলখিল করে হেসে ফেলল রানা। 'থাক, আর মিথ্যে বলতে

হবে না। কোথায় লুকালে ধরা পড়বে না, তা আমি জানি।'

বিশ মিনিট পর এল টিকেট চেকার। দরজায় টোকা শুনে রেডকে সিটের তলায় পাঠাল রানা। নিজের পা আর ব্যাগ দিয়ে আড়াল করে রাখল ওকে। এরপর চেকারকে ভিতরে ঢুকতে বলে টিকেট বের করে দিল। দায়সারা ভঙ্গিতে টিকেট দেখল লোকটা, অন্য কোনও দিকে মনোযোগ নেই।

'এই কেবিনে আর কোনও যাত্রী কি উঠবে?' তার কাছে জানতে চাইল রানা।

'না, ট্রেন আজ প্রায় ফাঁকা,' টিকেট ফিরিয়ে দিয়ে বলল চেকার। 'কামরাটা একাই পাচ্ছ তুমি, ইয়াং ম্যান। শুভরাত্রি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কোথায়একা, রেড আছে না!

টিকেট চেকার চলে গেলে সিটের তলা থেকে বেরিয়ে এল রেড। গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'বাপ রে, বাপ! কী যে ধুলো নিচে! হাঁচি এসে যাচ্ছিল প্রায়। জিন্দেগিতে কেউ কোনোদিন পরিষ্কার করেছে বলে মনে হয় না।'

'রাতটা এখানেই কাটাতে পারো,' রানা বলল। 'উপরের বাঙ্কটা খালি পড়ে রয়েছে। কেউ তোমাকে জ্বালাতন করতে আসবে না।'

'থ্যাঙ্কস, দোস্ত! তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম।'

'যথাসময়ে ঋণ শোধ করে দিয়ো, তা হলেই হবে।'

'ইয়ে... সেক্ষেত্রে আরেকটু ঋণ কি বাড়ানো যায়? মানে, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে কিনা...'

'তোমার দেখি চাহিদার শেষ নেই,' কপট রাগ দেখাল রানা। 'থাকো এখানে। আমি ডিনার করতে যাচ্ছি। ফেরার পথে খাবার নিয়ে আসব।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে ডাইনিং কারে গেল ও। কোনার একটা টেবিলে বসে চুপচাপ ডিনার সারল। ড্যানির সঙ্গে দেখা হবে

ভেবেছিল, কিন্তু হলো না। সম্ভবত নিজের কেবিনেই খাওয়াদাওয়া করছে সে।

ডিনারশেষে বিল মিটিয়ে উঠে পড়ল রানা। পাউরুটি, ফল আর সসেজ কিনে নিয়েছে রেডের জন্য। ওগুলো নিয়ে ফিরে এল কেবিনে। খাবার পেয়ে কৃতজ্ঞতা ফুটল রেডের চোখে। বুভুক্ষের মত খেতে শুরু করল।

'কতদূর এলাম, জানো?' একটু পর জিজ্ঞেস করল সে।

'ডাইনিং কারে শুনলাম, গ্র্যানথাম পেরিয়েছি। পরের স্টেশন ইয়র্ক।'

কী যেন মনে মনে হিসেব করল রেড। বলল, 'তা হলে শিডিউল মোতাবেকই এগোচ্ছি।' আবার খাওয়ায় মন দিল।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি বাথরুমে যাচ্ছি। ফিরে এসে শুয়ে পড়ব। আর কিছু লাগবে তোমার?'

'নাহ্। যাও তুমি। আমাকেও বাথরুমে যেতে হবে। আসছি একটু পরে।'

সংকীর্ণ করিডোর ধরে বাথরুমের দিকে এগোল রানা। জায়গামত পৌঁছে দেখল, দরজা বন্ধ। ভিতরে কেউ আছে। বাইরেই অপেক্ষা করতে থাকল। পাশের জানালা খুলে দিল বাতাস আসার জন্য।

টয়লেটের ফ্ল্যাশের আওয়াজ শোনা গেল খানিক পর। দরজা খুলে যে মানুষটা বের হয়ে এল, সে আর কেউ না—ড্যানি গ্রিফিন। রানাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে।

'হাই, ড্যানি!' সহজ সুরে বলল রানা। 'খুব অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?'

'তুমি এখানে কী করছ?' খেঁকিয়ে উঠল ড্যানি।

'তুমি যা করছ তা-ই। স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছি ছুটি কাটাতে।'

দাঁত কিড়মিড় করল ড্যানি। 'দরজা খুলে তোমাকে ট্রেনের

বাইরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত।'

'সরি, জানতাম না তোমার সঙ্গে এক ট্রেনে ভ্রমণ করবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।'

'নিষেধাজ্ঞা না, জানের মায়া থাকলে এমনিতেই আমার কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত তোমার। সেই রেসের পর থেকে তোমাকে খুন করবার প্ল্যান করছি আমি।'

'সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? সামান্য এক প্রতিযোগিতা ছিল ওটা। তুমি সবাইকে ঠকিয়ে জিততে চেয়েছিলে, কিন্তু পারোনি। ব্যস, কাহিনি খতম!'

রাগের বিস্ফোরণটা ঘটল সঙ্গে সঙ্গে। আচমকা ধাঁই করে রানার তলপেটে ঘুষি মারল ড্যানি। ব্যথায় দম আটকে এল রানার, কুঁজো হয়ে গেল সামনে। তখুনি ওর ঘাড়ে আরেকটা রদ্দা বসাল ড্যানি। এবার আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না রানা, সর্বশক্তিতে লাথি মারল ছেলেটার হাঁটুর নিচে।

কাতরে উঠল ড্যানি। পিছিয়ে গেল দু'পা। ক্রোধে জ্বলে উঠল চোখদুটো। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'এবার তোকে যদি খুন না করেছি...!'

ছুটে এসে রানার কলার চেপে ধরল সে। ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল কম্পার্টমেন্টের দরজার কাছে। ঠেলে ওর মাথা আর কাঁধ বের করে দিল খোলা জানালা দিয়ে।

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা সূচের মত আঘাত হানল রানার মুখের চামড়ায়। বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। ট্র্যাকসাইড পোস্টগুলো সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে মাথার কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে। ইঞ্জিনের হুইসেল শোনা গেল, একটা টানেলে ঢুকতে চলেছে ট্রেন—তারই সতর্কসঙ্কেত।

'ছাড়ো আমাকে, ড্যানি!' চেঁচাল রানা। 'ছাড়ো বলছি!'

এক চুল আলগা হলো না ড্যানির মুঠি। আতঙ্কে চোখ বড়

হয়ে গেল রানার। টানেলের মুখ দেখতে পাচ্ছে, এখুনি তার কিনারে বাড়ি খেয়ে ছাতু হয়ে যাবে ওর মাথা।

একেবারে শেষ মুহূর্তে হ্যাঁচকা টান দিয়ে রানাকে ভিতরে নিয়ে এল ড্যানি। পরক্ষণে টানেলে ঢুকে পড়ল ট্রেন। দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে গমগম করছে চাকার আওয়াজ।

হাঁপরের মত ওঠানামা করছে রানার বুক। মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখেনি আগে কোনোদিন। কিন্তু ড্যানির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর। কে যেন ওর কলার ধরে এক টানে পিছিয়ে এনেছে। ফলে ওর সঙ্গে পিছিয়ে এসেছে রানাও।

'আমার গায়ে হাত তোলে... কার এত বড় সাহস!' রাগী গলায় বলল ড্যানি। ঘুরে দাঁড়াল।

'ভয় পেয়েছ?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল লালচুলো রেড। ওর হাসি দেখে রানারই আত্মা খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়।

'কে তুমি?' প্রশ্ন ছুঁড়ল ড্যানি।

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। আরেকটু হলেই মাথাটা ছাতু হয়ে যেত আমার বন্ধুর। এ-ধরনের শয়তানির চেষ্টা যদি আবার দেখি, পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে তিন ভাঁজ করে ফেলে দেব জানালা দিয়ে বাইরে। বোঝা গেছে?'

ভাগ্যিস ঠিক সময়মত করিডোরে উদয় হয়েছিল রেড। ওর বিষমাখানো চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল ঢ্যাঙা ড্যানি। পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে... আমি তো ঠাট্টা করছিলাম।'

'ঠাট্টা? এখন আমি যদি একটু ঠাট্টা করি, আবার বাথরুম চেপে যাবে তোমার! যাও, ভাল চাও তো ভাগো এখান থেকে!'

'তুমি আমাকে হুকুম দেবার কে?'

'আমি? আমি লণ্ডনের স্ট্রিট ফাইটার। ইচ্ছে হলে আবার ওর গায়ে হাত তুলে দেখতে পারো কী হয়।'

ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে রেড।

পালা করে রানা আর রেডের দিকে তাকাল ড্যানি। টের পেল, সুবিধে করতে পারবে না। হতাশায় মেঝেতে পা ঠুকল সে, তারপর রেডকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল নিজের কামরার দিকে।

'থ্যাঙ্ক ইউ, রেড,' বলল রানা।

হাসল আইরিশ কিশোর। 'ঋণএকটু শোধ হয়েছে না? দেখো, একদম শোধ করে দেব সুযোগ পেলেই।'

খানিক পর, বাঙ্কে শুয়ে ড্যানির ব্যাপারে জানতে চাইল রেড।

রানা বলল, 'বলার মত কিছু না। আমাদের স্কুলে পড়ে। আমাকে একদম পছন্দ করে না।'

'সে তো দেখতেই পেলাম। কোন্ স্কুলে পড়ো তোমরা?'

'ইটনে।'

'আরিব্বাপরে!' উপুড় হয়ে উপরের বাঙ্ক থেকে মাথা বের করল রেড। 'ওটা তো খান্দানি ছেলেপেলেদের স্কুল। তোমাকে মোটেই সেরকম মনে হয়নি!'

'তাতে কি আমার ব্যাপারে তোমার মনোভাব বদলে যেত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ। তুমি অন্যরকম। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কোথায় পড়ো না পড়ো, তাতে কিছু যায়-আসে না। যাক গে, এবার একটু ঘুমোনো যাক, কী বলো? সকালে আবার কথা হবে।'

অদৃশ্য হয়ে গেল রেডের মুখ। একটু পরই উপর থেকে ভেসে এল শ্বাস ফেলার ভারী আওয়াজ। ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

কিন্তু রানার ঘুম এল না। বাঙ্কে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল কয়েকবার। মিছিলের মত নানা ধরনের চিন্তা আসছে মাথায়। ভাবছে ইটনের কথা... উপরের বাঙ্কে শুয়ে থাকা অদ্ভুত ছেলেটির কথা... ড্যানি ও লর্ড গ্রিফিনের কথা। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে

মা-বাবার মুখ।

নিজের অজান্তেই চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা।

নয়

শক্তিশালী ইঞ্জিনের টানে রাতভর ছুটে চলল ট্রেন। ইংল্যাণ্ডের সীমানা পেরুল, পূর্ব-উপকূলের রুট ধরে ইয়র্ক হয়ে নিউক্যাসল পৌঁছুল, তারপর দিক বদলে রওনা হলো এডিনবরা, পার্থ আর স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়ামের উদ্দেশে।

ছটফট করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি, সকাল সাড়ে ন'টায় সেই ঘুম ভাঙল রানার। চোখ খুলতেই দেখল উপর থেকে ঝুলে থাকা এক জোড়া পা। রেড আগেই জেগেছে, পা ঝুলিয়ে বসে আছে তার বাঙ্কে।

নিচে রানার সাড়া পেয়ে লাফ দিয়ে নামল সে। 'সুপ্রভাত!' বলে হাসল স্ট্রিট ফাইটার। 'বাপ রে, তুমি ঘুমাতেও পারো বটে। আরেকটু হলেই দুপুর গড়িয়ে সাঁঝ হয়ে যেত। ওঠো, ওঠো। স্কটিশদের রাজ্যে পৌঁছে গেছি আমরা।'

উঠে বসল রানা। চোখ কচলাল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রেড বলল, 'ইংল্যাণ্ডের মতই লাগছে। ফসলের খেত, গাছপালা, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মেঘ আর সাধারণ পোশাকের মানুষ। কোনও পার্থক্য দেখছি না।'

'কী আশা করেছিলে?' রানাও বাইরে উঁকি দিল। 'কিল্ট* পরে ব্যাগপাইপ বাজাতে দেখবে ওদের?'

'তা না, তবে ভিন্ন কিছু দেখব ভেবেছিলাম। এই প্রথম ইংল্যাণ্ডের বাইরে এসেছি তো... প্রত্যাশা তাই একটু বেশিই ছিল।'

'হুম,' বাঙ্ক থেকে নামল রানা। 'মুখ-হাত ধুয়ে আসি। এরপর ব্রেকফাস্টে যাব।'

'আমি আসব তোমার সঙ্গে?' ঠাট্টার সুরে বলল রেড। 'কাল রাতের ওই ষণ্ডাটার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যেতে পারে। বডিগার্ড দরকার তোমার।'

'বলেছে তোমাকে!' হেসে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

সকালেই এডিনবরা আর পার্থ পেরিয়ে এসেছে ট্রেন। বারোটা নাগাদ পৌঁছুল ফোর্ট উইলিয়ামে। ওখানেই নামল রানা আর রেড। প্ল্যাটফর্মে রানার জন্য অপেক্ষা করছেন ইসমাত ফুপু। বেশ সুন্দরী তিনি, অনেক বছর বিদেশে থেকেও বাঙালিয়ানা ত্যাগ করেননি, শাড়ি পরেছেন বরাবরের মত। ওকে দেখতে পেয়েই কাছে এসে জড়িয়ে ধরলেন।

'কেমন আছ, রানা?'

'ভাল, ফুপু,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'এবার আমাকে ছাড়ো। লোকজন তাকিয়ে আছে।'

'তাতে আমার বয়েই গেছে!' মুখ ঝামটা দিলেন ইসমাত আরা। তবে রানাকে ছেড়েও দিলেন। 'দাঁড়াও, ভাল করে দেখি, হতচ্ছাড়া স্কুলটা তোমার কী হাল করেছে।'

'হাল ভালই আছে,' বলল রানা।

---

*Kilt- এক ধরনের স্কার্ট, স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় পোশাকের অংশ।

'কোথায়? আরও শুকিয়ে গেছ। স্কুলে ভাল খেতে দেয় না বুঝি?'

'দেয়। কিন্তু আমার ভাল লাগে না।'

'না লাগারই কথা। ঘরের খাবার খেয়েছ এতদিন, হোস্টেলের খাবার ভাল লাগবে কী করে? ওখানে তো বাঙালি খাবারও নেই।'

কথা বলতে বলতে স্টেশনের বাইরে চোখ বোলাল রানা। সদ্য পৌঁছুনো যাত্রীরা সেখানে বাস আর ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ছে। কালো রঙের একটা চকচকে রোলস-রয়েস দেখতে পেল, ড্যানি গ্রিফিনকে সেটায় ওঠাচ্ছে ইউনিফর্মধারী এক শোফার।

'কী ব্যাপার?' রানাকে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ফুপু। 'কী দেখছ?'

'কিছু না,' মাথা নাড়ল রানা।

আর ঠিক তখুনি উদয় হলো রেড। ট্রেন থেকে নেমেই বাসের খোঁজ নিতে গিয়েছিল। এখন ফিরে এসেছে।

'হাই, মেইট! ইনিই তোমার ফুপু?'

'হ্যাঁ...'

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না রানা, তার আগেই হ্যাণ্ডশেকের ভঙ্গিতে ফুপুর হাত ধরে ঝাঁকি দিল রেড। বলল, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, আণ্টি। আপনার ভাইপো খুব ভাল ছেলে। ভালমত খেয়াল রাখবেন ওর দিকে।'

'নিশ্চয়ই রাখব,' হতচকিত হয়ে গিয়ে বললেন ফুপু।

'আমি তা হলে আসি। বাস ছেড়ে দেবে। আশা করি পরে আবার দেখা হবে, রানা। বাই!'

যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ঝড়ের বেগে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল রেড।

বিস্মিত গলায় ফুপু বললেন, 'কে এই ছেলে?'

'ঠিক জানি না, ট্রেনেই পরিচয় হয়েছে,' রানা জানাল।

'দু'জনে একসঙ্গে জার্নি করলাম। একটু পাগলাটে... এই আর কী।'

'হুম। চলো বেরোই।'

নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছেন ফুপু। পিছনের সিটে ব্যাগ রেখে ওটায় উঠে পড়ল রানা। ইগনিশন ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করলেন ফুপু, গিয়ার দিয়ে আগে বাড়ালেন গাড়িকে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রায় নির্জন রাস্তা ধরে ছুটলেন কিথলির উদ্দেশে।

'কতক্ষণ লাগবে পৌঁছুতে?' জানতে চাইল রানা।

'ঘণ্টাখানেক। রাস্তা মন্দ না, আশা করি ভাল লাগবে তোমার। আরাম করে বসো।'

সিটে শরীর এলিয়ে দিল রানা, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। একেবারেই গ্রাম্য পরিবেশ। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ দেখতে পাচ্ছে ও—ফসলের খেত, সবুজ গাছপালা, জলাশয় আর ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি। মাথার উপর আকাশ ঘন নীল, যেন তুলিরপোঁচ দিয়ে রং লেপে দেয়া হয়েছে। সূর্যইতিমধ্যে উঠে এসেছে মধ্যআকাশে, ছড়াচ্ছে কড়া উত্তাপ।বৈচিত্র্যহীন দিনটাকে মনে হচ্ছে যেন থমকে আছে—শান্ত, সমাহিত।

'এখানে সময় কাটাবার মত খুব বেশি কিছু নেই,' বললেন ফুপু, 'তবে গতকাল দেখলাম কিলক্রেমোরে তাঁবু খাটিয়েছে একটা সার্কাস পার্টি। আজ সন্ধ্যায় ওখানে সার্কাস দেখতে গেলে কেমন হয়?'

'ভাল হয়, ফুপু,' বলল রানা।

চেহারা উজ্জ্বল হলো ফুপুর। কয়েক মাস আগে হলেও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিত রানা। ঘরে বসে থাকত।

'আমি চাই, ছুটিটা তুমি পুরোপুরি উপভোগ কর, রানা।'

'আমারও তা-ই ইচ্ছে।'

লক লিনহি-র পাশ ঘুরে রোড টু দ্য আইলস-এ উঠল গাড়ি, ছুটল মেলেইগ-এর দিকে।

'চাচার শরীর কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল না,' ফুপু বললেন। 'তুমি তো বোধহয় গত ছ'মাসে দেখোনি ওকে?'

'না। ইটনে যাবার আগেও দেখা হয়নি। ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে গিয়েছিলেন।'

'হুম। এখন তা হলে দেখলে একটা ধাক্কা খাবে। শুকিয়ে এইটুকুন হয়ে গেছে, সারাক্ষণ কাশে।'

'রোগটা সিরিয়াস?'

ইতস্তত করলেন ফুপু। 'ইয়ে... তোমাকে বলা হয়নি, রানা... ওর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়েছে।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'প্লিজ, তোমার চাচার সামনে কিছু বলতে যেয়ো না। এখনও শক্ত আছে ও, আমিও সাহস জুগিয়ে চলছি... এমন কিছু কোরো না যাতে ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বরং চেষ্টা কোরো ওকে হাসিখুশি রাখতে। ডাক্তার সে-পরামর্শই দিয়েছে। কিথলিতেও ওকে নিয়ে এসেছি সে-কারণেই।'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল রানা, কিন্তু হু হু করে উঠল মন। যদিও কখনও মুখ ফুটে বলেনি, চাচাকে ভীষণ ভালবাসে ও। তাঁর প্রতি আলাদা একটা টান আছে ওর। রানার পিতা জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরি খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন, একেবারেই সময় দিতে পারতেন না ছেলেকে। সে-অভাব অনেকাংশেই পূরণ করেছিলেন এরফান চাচা। ব্যবসার কাজে বা নিছক ছুটি কাটাতে প্রায়ই ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে যেতেন তিনি, আর গেলেই সময় কাটাতেন রানার সঙ্গে। তাঁর কাছেই সাইকেল চালানো শিখেছে রানা, শিখেছে ব্যাডমিণ্টন-দাবাসহ অনেক খেলা। ওর বড় হয়ে ওঠায়

চাচার ভূমিকা রয়েছে অনেক। সেই চাচাই এখন মরণব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত। তারমানে খুব শীঘ্রি... আর ভাবতে পারল না রানা।

গ্লেনফিনানের মাইলদুয়েক দূরে মেইন রোড ছাড়ল গাড়ি। আঁকাবাঁকা আধপাকা রাস্তা ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে পৌঁছুল কিথলি গ্রামে। পাহাড়ি এলাকায় গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র এক জনপদ ওটা; বাড়িগুলোও ছোট, নিচু, পাথর দিয়ে গড়া। বড় কোনও দালান নেই গ্রামে। চারদিকের ছোটবড় পাহাড়গুলো প্রাচীরের মত গ্রামকে রক্ষা করে হিমেল বাতাসের ঝাপটা থেকে।

ফুপুর এস্টেট গ্রামের সীমানার বাইরে। মূল সড়ক ধরে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গেল ওরা, চোখে পড়ল স্থানীয় পাব, পোস্ট অফিস আর টাউন হলসহ বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং। এরপর কাঁচা একটা রাস্তায় নামল, নদীর পাড় ঘেঁষে এগিয়ে ঢুকে পড়ল পাইনের অরণ্যে। খানাখন্দে চাকা পড়ায় ঘন ঘন লাফাচ্ছে গাড়ি।

'এদিককার রাস্তা ভাল না,' কৈফিয়তের সুরে বললেন ফুপু। 'আসলে থাকা হয় না তো কখনও, তাই মেরামত করাইনি। তোমার ফুপা বেঁচে থাকতে যা-ও বা আসতাম, এখন একেবারেই আসা হয় না।'

'কেউ থাকে না এস্টেটে?' জানতে চাইল রানা।

'মার্থা আর ক্রেইগ বার্লি নামে স্থানীয় এক দম্পতি থাকে—এস্টেটের দেখাশোনা করে ওরা। এখন তোমার চাচার সেবাযত্নও করছে।'

'ওষুধপথ্য?'

'লণ্ডন থেকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ে এসেছি। তা ছাড়া এখানকার ডাক্তার নিয়মিত এসে দেখে যায়। এ ছাড়া গ্রেহাম নামে স্থানীয় আরেকটা লোক রেখেছি, এরফানকে মাছ ধরার

কাজে সাহায্য করে।'

'মাছ ধরা?' বিস্মিত হলো রানা। মাছ শিকারের নেশা আছে এরফান চাচার, কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেও তাতে ক্ষান্ত দেননি শুনে অবাক হয়েছে।

'আর বলছি কী!' বিরক্তি ফুটল ফুপুর কণ্ঠে। 'ছোটবেলা থেকেই মাছ ধরার পাগল। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কিচ্ছু মানে না, মাছ ধরার সুযোগ পেলেই হলো! আমার তো মনে হয়, মাছ ধরতে পারবে বলেই এখানে আসতে রাজি হয়েছে লণ্ডন ছেড়ে।'

এস্টেটের কাঁটাতারের সীমানা পেরুল গাড়ি। বড় একটা মোড় ঘুরে পৌঁছুল একটা ছিমছাম কটেজের সামনে। গাছপালার মাঝে এক চিলতে ফাঁকা জমিতে তৈরি করা হয়েছে ওটা। চারদিকে ফুলের বাগান। ছবির মত সুন্দর।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ছড়িতে ভর দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। এরফান চাচা! চমকে উঠল রানা—এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর... ফুপু যদি আগে থেকে বলে না দিতেন, প্রথম দেখায় রানা চিনতেই পারত না তাঁকে।

খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে চাচাকে। শরীর হাড্ডিসার, ঢলঢলে হয়ে গেছে গায়ের পোশাক। চোখজোড়া বসে গেছে গর্তে। গায়ের চামড়া হলদেটে, নিষ্প্রাণ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রীতিমত সুপুরুষ ছিলেন চাচা, অথচ ছ'মাসের ব্যবধানে বিধ্বস্ত এক মানুষে পরিণত হয়েছেন।

গাড়ি থেকে নেমে অস্ফুট গলায় ডেকে উঠল রানা, 'চাচা!'

'ওয়েলকাম, রানা,' দুর্বল গলায় বললেন এরফান চৌধুরি। 'কাছে এসো, তোমাকে একটু ভাল করে দেখি।'

ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'তোমার এ-অবস্থা কেন, চাচা?'

ওর মাথায় হাত বোলালেন এরফান। 'অসুখ-বিসুখ হয় না

মানুষের? ও কিছু না...' বলতে বলতেই কেশে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল রানা। কাশি থামলে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন চাচা। বললেন, 'সরি, শরীরটা বেশি ভাল না। হয়তো ঠিকমত সময় দিতে পারব না তোমাকে। ভিতরে চলো। তোমার ব্যাগ কোথায়? আমার হাতে দাও।'

'খবরদার, ব্যাগ ধরবি না। কোনও দরকার নেই।' মুখ ঝামটে উঠলেন ফুপু। 'এই শরীর নিয়ে বাইরে এসেছিস কেন? আমরা কি ঘরে ঢুকতাম না?'

'আহ্, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করো, বুবু!' বললেন চাচা। 'কী এমন হয়েছে...'

'বাড়াবাড়ি আমি না, তুই করছিস। বড় বোনের সঙ্গে আবার মুখে মুখে কথা? ভিতরে যা বলছি! রানার ব্যাগ আমি নিয়ে আসছি।'

গোমড়ামুখে রানার দিকে তাকালেন চাচা। 'মহিলা হিটলারের কবলে পড়েছি, বুঝলে? চলো, ভিতরেই চলো।'

বাইরে থেকে ছোট মনে হলেও কটেজের ভিতরটা যথেষ্ট বড়। কিচেন, বসার ঘর আর ডাইনিং রুম ছাড়াও চার-চারটে থাকার কামরা আছে। রানাকে ওর জন্য নির্ধারিত কামরায় নিয়ে গেলেন চাচা। খাট আর পড়ার টেবিল ছাড়াও বড়সড় একটা বুকশেলফ আছে রুমটায়, শেলফভর্তি পুরনো আমলের হাজারো ক্লাসিক বই। মেঝেতে নরম গালিচা।

'পছন্দ হয়েছে?' চাচা জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই!' রানা বলল। 'ইটনে এর অর্ধেক সাইজের একটা রুমে থাকি আমি।'

জানালার কাছে গেল ও। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঝিকমিক করছে ওপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পানি। দৃশ্যটা মোহনীয়।

'মাছ ধরতে যাবে?' বললেন চাচা। 'লাঞ্চের আগে দু-চারটা

ফিনক ধরতে পারলে মন্দ হয় না।'

'ফিনক?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা, এ-মাছের নাম আগে শোনেনি।

'এক ধরনের ট্রাউট—সামুদ্রিক মাছ। ডিম পাড়ার মৌসুমে নদীতে ঢুকে পড়ে, আমাদের দেশের ইলিশের মত। এখন সেই মৌসুম চলছে, নদীতে অনেক মাছ। গত দু'দিন বৃষ্টি হওয়ায় পানি একটু ঘোলা, তবে ওতে অসুবিধে হবে না। ঠিকমত ছিপ ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে।'

'মাছ ধরার কিছুই জানি না যে আমি।'

'অসুবিধে নেই। এই ছুটিতেই তালিম দিয়ে তোমাকে পাক্কা মৎস্যশিকারি বানিয়ে দেব আমি। নদীটা সুন্দর না?'

'হুঁ।'

'কিন্তু এই সৌন্দর্য বাহ্যিক। নদীর সত্যিকার সৌন্দর্য যদি উপভোগ করতে চাও... যদি ওর অংশ বানাতে চাও নিজেকে... নদীতে নেমে মাছ ধরার বিকল্প নেই। অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে যখন তুমি ছিপ ফেলতে শুরু করবে, শুধুমাত্র তখনই একাত্ম হতে পারবে প্রকৃতির সঙ্গে। কারণ মাছশিকারি বক বা মাছরাঙার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য থাকবে না তোমার। এ এক অন্যরকম মজা।'

'শুনে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

'আসলেও তা-ই। যেতে চাও মাছ ধরতে?'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু তোমার শরীর...'

'শরীর ঠিকই আছে। মাছ ধরতে অসুবিধে নেই। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। একসঙ্গে বেরুব আমরা।'

আধঘণ্টার মধ্যেই চাচার সঙ্গে নদীতীরে হাজির হলো রানা। চাচা ওকে ফ্লাই-ফিশিঙের বিভিন্ন নিয়মকানুন শেখালেন—কীভাবে ছিপে সুতো পরাতে হয়, কীভাবে বাঁধতে হয় টোপ, কীভাবে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়তে হয় বড়শি, ইত্যাদি।

আগ্রহ নিয়ে সব শিখল রানা, মজাও পেল। কিন্তু ধৈর্য হারাতে

শুরু করল একটা মাছও ঠোকর না দেয়ায়।

নদীতীরে বসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন এরফান চৌধুরি। 'ধৈর্য হারিয়ো না, রানা। এই যে একটা অনিশ্চয়তা... এটাই মাছ শিকারের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ। প্রতিবার ছিপ ফেললেই যদি মাছ ধরা পড়ত, ব্যাপারটায় মজা থাকত না কোনও।'

একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। কিন্তু দু'টান দিয়েই শুরু করলেন কাশতে। ভয়ানক কাশি। মনে হলো শরীরের ভিতর থেকে সবকিছু বেরিয়ে আসবে মুখ দিয়ে। তাড়াতাড়ি ছিপ ফেলে চাচার কাছে ছুটে এল রানা। একটু পর থামল তাঁর কাশি। সিগারেট ফেলে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন।

'সিগারেট আজকাল একদম সহ্য হচ্ছে না,' বললেন চাচা।

'ছেড়ে দাও না কেন?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'নেশা,' কাঁধ ঝাঁকালেন চাচা। 'তা ছাড়া ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর সিগারেট ছেড়ে লাভ নেই। তাই সহ্য না হলেও টানি... কাশি আসার আগে যে-ক'টা টান দিতে পারি, সেটুকুই আনন্দ।'

'আমি কোনোদিন সিগারেট খাব না,' বলল রানা।

'খুব ভাল,' হাসলেন চাচা। 'একটা বয়সে আমিও এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারিনি। আসলে... এমন কিছু পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম, মনে হয়েছিল সিগারেটের আগেই অন্য কিছু আমার জীবন নেবে। তাই ভাবলাম, নিষিদ্ধ ওই সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা কেন?'

'কী পরিস্থিতি?'

'জীবন-মরণ পরিস্থিতি, রানা। বললাম তো তোমাকে।'

'ব্যবসা করতে গেলে জীবন-মরণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়?'

একটু যেন থমকে গেলেন চাচা। তারপর বললেন, 'আমার

ব্যাপারে একটা কথা তোমার জানা নেই, রানা। ব্যবসা আমার মূল পেশা হলেও এককালে আরেকটা কাজ করতাম আমি।'

'কী কাজ?' কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা।

'স্পাইং... ব্রিটিশ সরকারের হয়ে দেশ-বিদেশে বেশ কিছু কাজ করেছি আমি।'

'তুমি... তুমি স্পাই ছিলে?' চোখ বড় হয়ে গেল রানার। 'কী বলছ এসব?'

'আস্তে!' ঠোঁটের কাছে আঙুল তুললেন চাচা। 'কথাটা বুবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন তোমাকে বললাম। তুমিও কাউকে বোলো না।'

'কিছু জানলে তো বলব! কী ধরনের স্পাই ছিলে তুমি?'

'তথ্য-সংগ্রহকারী। ব্যবসার কাজে বিভিন্ন দেশে অবাধ যাতায়াত ছিল আমার, বাঙালি বলে কেউ সন্দেহ করত না। তাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স—যেসব জায়গায় ব্রিটিশ এজেন্ট পাঠানো যেত না, সেসব জায়গায় গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আমাকে। আমিও রাজি হয়ে গিয়েছিলাম—রোমাঞ্চের নেশায়... তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের কাজ করে দিলে ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধে পাওয়া যাবে বলে। তো... সেসব কাজ করতে গিয়েই কয়েকবার বিপদে পড়েছিলাম। মারাও যেতে পারতাম। ভাগ্য ভাল, শেষ পর্যন্ত কখনোই কিছু হয়নি।'

'আমার তো শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে,' বলল রানা রুদ্ধশ্বাসে। 'স্পাইং করে লাভ হয়েছিল তোমার? মানে... ব্যবসার ক্ষেত্রে?'

'অবশ্যই। সরকারের সাহায্য পাওয়াতেই ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল আমার ব্যবসা। প্রভাবশালী অনেক বন্ধুও পেয়েছি। তারাই তোমাকে ইটনে ভর্তি করাতে সাহায্য করেছে।'

'কিন্তু বিয়ে? কখনও বিয়ে করোনি কেন তুমি, চাচা?'

'স্পাইং খুব বিপজ্জনক পেশা, রানা,' উদাস হয়ে গেলেন চাচা। 'কখন কী ঘটে কিছু বলা যায় না। আমি চাইনি আমাকে বিয়ে করে কোনও মেয়ে অকালে বিধবা হয়ে যাক।' ভাতিজার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'প্রার্থনা করি, আমার অবস্থা যেন না হয় তোমার। মৃত্যুর সঙ্গে যেন কখনও পাঞ্জা লড়তে না হয় তোমাকে... আমার মত। যেন চিরকুমার থাকতে না হয়।'

'তারমানে কি ভুল করেছিলে তুমি?'

'না, তা বলব না। এক অর্থে সেবা করেছি দেশের—দেশটা নিজের নয়, এই আর কী। নিজের হলে আরও ভাল লাগত। কিন্তু বেশ কিছু মন্দ লোককে ঠেকিয়েছি, রক্ষা করেছি নিরীহ মানুষকে... অর্জন হিসেবে সেসব কম নয়। সমস্যা হলো, একজন স্পাইকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, বিসর্জন দিতে হয় জীবনের অনেক কিছু।'

'ওভাবে দেশের জন্য কিছু করা গেলে আমার আপত্তি নেই,' রানা বলল।

'খুব ভাল।' নদীর দিকে তাকালেন চাচা। 'আজ বোধহয় আর মাছ ধরা পড়বে না। লাঞ্চেরও সময় হয়ে গেছে। চলো বাড়ি ফিরি। তোমার ফুপু নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে আমাদেরকে।'

পুরোপুরি বাঙালি কায়দায় সাদা ভাত, মুরগির মাংস আর সবজি রেঁধেছেন ইসমাত আরা। আহামরি কিছু নয়, কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস ইটনের বিস্বাদ খাবার খেতে খেতে এমন অবস্থা হয়েছে, এসবই অমৃতের মত লাগল রানার কাছে।

ডেজার্ট হিসেবে খাঁটি দুধের পায়েস পরিবেশন করলেন ফুপু। এক চামচ মুখে দিয়ে রানা বলল, 'রডনি রাইলি নামে কোনও ছেলের ব্যাপারে কিছু জানো তোমরা?'

'বিশ্রী একটা ব্যাপার,' নামটা শুনেই মাথা দোলালেন ফুপু।

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করলেন চাচা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, রানার প্রশ্ন শুনতে পাননি।

'ওই যে... গাঁয়ের অ্যানি রাইলির ছেলে,' ফুপু বললেন। 'ক'দিন আগে যে-ছেলেটা হারিয়ে গেল।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন চাচা। 'আমি কিছুটা খোঁজখবরও নিয়েছিলাম, ছেলেটা আমারই মত মাছ শিকারি কিনা। লোকে বলছে, মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে গেছে ও। একেবারেই বাজে কথা। এলাকার ছেলে... নদী চেনে সে; কোথায় বিপদ-আপদ আছে তাও নিশ্চয়ই জানে। আনাড়ির মত ডুববে কেন? ওর ফিশিং গিয়ারও তো পাওয়া যায়নি। মানুষ নাহয় ডুবেছে, সরঞ্জাম গেল কোথায়? গ্রেহামের ধারণা, ছেলেটা সিলভারব্যাক লেকে মাছ ধরতে গিয়েছিল। আগেও নাকি কয়েকবার ওকে ওদিকে যেতে দেখেছে সে। সমস্যা হলো, কিথলির কেউ ওখানে খোঁজ নিতে যাচ্ছে না। শরীর একটু ভাল থাকলে আমিই যাব ভাবছি।'

'কিন্তু ওই লেকে তো মাছ ধরা নিষেধ,' বললেন ফুপু। 'ওখানে যাবে কেন?'

'চ্যালেঞ্জের জন্য। বয়সটাই তো অমন—কিছু নিষেধ করলে তা করা চাই। তা ছাড়া আমি শুনেছি, এই এলাকায় সবচেয়ে ভাল মাছ পাওয়া যায় সিলভারব্যাক লেকে। ইশ্‌শ্, যদি যাওয়া যেত!'

'যতক্ষণ ওই লর্ড এখানে আছেন, তা সম্ভব না,' মাথা নাড়লেন ফুপু।

'জানি,' সায় দিলেন চাচা। 'কিন্তু এত বিধি-নিষেধ দেখেই সন্দেহ জাগছে মনে। আমার ধারণা, লর্ড গ্রিফিন ওখানে তলে তলে কিছু একটা ঘটাচ্ছেন... সেটা ভাল কিছু নয়।'

এক চামচ পায়েস মুখের কাছে এনেছিল রানা, কথাটা শুনে

থমকে গেল। 'কী বললেন, চাচা? কী নাম লর্ডের?'

'গ্রিফিন... লর্ড রেজিনাল্ড গ্রিফিন।'

দশ

'লর্ড গ্রিফিন এদিকেই থাকেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন এরফান চৌধুরি। 'সিলভারব্যাক লেকের মাঝে তাঁর দুর্গ। ওদিককার বেশিরভাগ জমির মালিকও তিনি। ভদ্রলোককে তুমি চেনো?'

'ইটনে দেখা হয়েছে,' রানা বলল। 'লর্ড গ্রিফিনের ছেলে আমাদের স্কুলেই পড়ে।'

'ও হ্যাঁ,' মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে বললেন চাচা। 'তোমার বন্ধু নাকি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দু-বছরের সিনিয়র,' সংক্ষেপে জানাল ও। তার বেশি কিছু বলল না।

'হুম। লর্ডের ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। শুনেছি এই এলাকার প্রাক্তন লর্ড নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন, তারপর রেজিনাল্ড আমেরিকা থেকে এসে কিনে নেন উপাধিটা, নিজের ভাইসহ ওঠেন ওই দুর্গে। এডগার নাম ছিল বোধহয় ভাইটার, এখানে আসার কিছুদিন পর সে-ও দুর্ঘটনায় মারা গেছে। লোকে ভেবেছিল ভাই মারা যাবার পর মুষড়ে পড়বেন গ্রিফিন, চলে যাবেন এখান থেকে। কিন্তু তা আর ঘটেনি। বরং আরও ভালমত

জাঁকিয়ে বসেছেন।'

'ভদ্রলোক তো বোধহয় খুব ধনী।'

'তা আর বলতে! কত টাকা আছে নিজেও মনে হয় জানেন না। কয়েকদিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, বেশ বন্ধুত্বপরায়ণ। স্থানীয়দের মাঝেও জনপ্রিয়। নিজের টাকায় একটা নতুন স্কুল আর টাউন হল তৈরি করে দিয়েছেন গাঁয়ে। কিছুদিন পর পর নানা ধরনের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন। স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা আর কী... ভদ্রলোক সত্যিকার একজন ব্রিটিশ লর্ডের মত সম্মান পেতে চান। তবে কেন যেন তাঁকে পছন্দ হয়নি আমার। সারাক্ষণই মনে হয় কিছু একটা লুকাচ্ছেন। নিজের এলাকা নিশ্ছিদ্র করে রেখেছেন, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে পাহারা দেয় অস্ত্রধারী লোকেরা।'

'কেন?'

'এলাকাবাসীর কাছে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়েছেন গ্রিফিন, দুর্গের ভিতরে নাকি তাঁর অস্ত্র তৈরির ছোট একটা কারখানা আছে। কিন্তু আমার ধারণা, আরও বড় কোনও রহস্য আছে এর ভিতর।'

'কী রহস্য?' সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'জানা নেই আমার,' কাঁধ ঝাঁকালেন চাচা। 'আন্দাজে কিছু বলা ঠিকও হবে না। কোনও রহস্য ভেদ করতে হলে সবচেয়ে যেটা জরুরি তা হলো—তথ্য। সেটাই নেই আমার হাতে। নানা রকম গুজব শুনি, কিন্তু সেসবে কান দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইশ্‌শ্... শরীরটা যদি ভাল থাকত, আমি নিজেই গিয়ে হানা দিতাম ওখানে...'

'হয়েছে, থাম তো!' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন ইসমাত ফুপু। 'ছেলেটার মাথা আর খারাপ করিস না। তোর কথা শুনে দেখা যাবে ও-ই ছুটেছে ওখানে।'

'গেলে সমস্যা কোথায়?' বললেন চাচা। 'এ-বয়সে রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চার... এসবের দরকার আছে।'

'যদি বিপদে পড়ে?'

'ভয় পাচ্ছ?' ভুরু নাচালেন চাচা। 'তুমি তো এমন ভীতু ছিলে না, বুবু! ছোটবেলায় আমার বা ভাইয়ার চেয়ে তুমিই দস্যিপনায় এগিয়ে ছিলে...'

'খাবি এক থাপ্পড়!' চোখ রাঙালেন ফুপু। 'আমাকে ভীতু বলা হচ্ছে? এখনও তোর চেয়ে বেশি সাহস আমার। তারমানে এই না যে, একটা ছোট ছেলেকে উস্কানি দিয়ে বিপদে ফেলব। খবরদার, রানা, ওর কথায় একদম কান দিয়ো না।'

ভাইবোনের ঝগড়াঝাঁটিতে বেশ মজা পাচ্ছে রানা। কোনোমতে হাসি চেপে বলল, 'ঠিক আছে, ফুপু।'

'বিকেলটা বিশ্রাম নাও। কোথাও যাবার দরকার নেই। জার্নি করে এসেছ।'

'কী শুরু করলে, বুবু!' বিরক্ত হলেন চাচা। 'ছেলেটা অল্প ক'দিনের জন্য এসেছে, ওকে বন্দি করে রাখবে নাকি?'

'তা হলে কী করতে চাস? আবার মাছ ধরতে যাবি?'

মুচকি হাসলেন চাচা। 'সেটা রানার খুব পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না। ভিন্ন কিছু করব আমরা।'

জং ধরা কবজায় ক্যাচকোঁচ আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে খুলে গেল গোলাঘরের দরজা। ভিতরে ঠায় বসে থাকা আবছা একটা আকৃতির দিকে ইশারা করে এরফান চৌধুরি বললেন, 'মাই ডিয়ার রানা, এসো পরিচয় করিয়ে দিই *আলফা রোমিও নাইনটিন হানড্রেড*-এর সঙ্গে। সুন্দর না?'

চোখ পিটপিট করল রানা চাচার পিছু পিছু ঢুকল গোলাঘরে। ধূসর রঙের একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছে। ময়লা কাঁচের জানালা

দিয়ে ঢোকা এক চিলতে আলোয় চকচক করছে ওটার দেহ। গাড়ি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু না জানলেও বাহ্যিক অবয়ব দেখেই মুগ্ধ হলো ও। গাড়িটা সত্যিই সুন্দর।

'ক্লাসিক কার,' বললেন চাচা। '১৯৫০ সালের মডেল। অনেক দাম দিয়ে এক কালেক্টরের কাছ থেকে কিনেছি। পুরনো হলে কী হবে, এখনও নতুন যে-কোনও গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আজকাল এ-ধরনের গাড়ি বানায় না কেউ।'

একটা লাইট জ্বালিয়ে রানাকে গাড়িটা ভাল করে দেখার সুযোগ করে দিলেন তিনি।

চার দরজার গাড়ি। গোলগাল দেহ—ফ্রন্ট আর রিয়ার-এণ্ড, দুটোই ভোঁতা। সামনে-পিছনে চকচকে বাম্পার লাগানো, হেডলাইটদুটো বনেট থেকে সামান্য নিচে। ঘুমিয়ে থাকা দানব যেন, এখুনি ছুট লাগাবে।

'তোমার গাড়ি কিথলিতে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রিয় গাড়ি,' চাচা বললেন। 'এটা ছাড়া কোথাও যাবার কথা ভাবতেই পারি না। তাই লণ্ডন থেকে নিয়ে এসেছি, যদিও শরীর খারাপ বলে খুব একটা চালানো হয় না। আজ বেরোতে চাই। তুমি যাবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলল রানা।

ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলেন চাচা, পাশে রানা। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই গর্জে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন। ক্লাচ রিলিজ করতে করতে অ্যাকসেলারেটর চাপলেন, ঘুরতে শুরু করল চাকা। গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এল। মোড় নিয়ে উঠে এল কটেজের সামনের রাস্তায়। মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটতে থাকল।

ধীরে ধীরে গতি বাড়ালেন চাচা। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকল হাওয়া, এলোমেলো করে দিল রানার চুল। ভয় হলো ওর, কাঁচা রাস্তায় যেভাবে চালাচ্ছেন চাচা, কখন না জানি

অ্যাকসিডেন্ট করে বসেন! তবে একটু পরেই ওর আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হলো। দক্ষ ড্রাইভার এরফান চৌধুরি, নিপুণ হাতে চালাচ্ছেন গাড়ি। রাস্তার আঁকবাঁক পেরুচ্ছেন সুচারুভাবে। অসুস্থতার লক্ষণ নেই আর চেহারায়, হঠাৎ করে যেন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন। উঠে এলেন পাকা রাস্তায়।

'দেখেছ কেমন চমৎকার চলছে?' এবার বললেন তিনি। 'সর্বোচ্চ এক শ' মাইল স্পিডে চালিয়ে দেখেছি, একটুও আওয়াজ করে না ইঞ্জিন। এমন গাড়ি চালিয়েও মজা।'

মাথা ঝাঁ·গল রানা। খুব ভাল লাগছে ওর। জানালা দিয়ে মাথা বের করে পরশ নিল উদ্দাম বাতাসের। ওর ছেলেমানুষি দেখে হেসে উঠলেন চাচা। নিজের বয়সটাও যেন কমে গেছে হঠাৎ করে।

কিল্‌ক্রেমোরে পৌঁছে একটা পেট্রোল স্টেশনে গাড়ি থামালেন তিনি। তেল নেয়া হলে বনেট খুললেন, রানাকে দেখালেন গাড়ির ইঞ্জিন।

'দারুণ জিনিস এই ইন্টারনাল কমবাস্‌চান ইঞ্জিন,' বললেন তিনি। 'দুনিয়া পাল্টে গেছে এ-জিনিস আবিষ্কারের পর। ইঞ্জিনটা কীভাবে কাজ করে, জানো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু এটুকুই জানি যে পেট্রোলে চলে গাড়ির ইঞ্জিন।'

'ওয়েল... প্রাথমিক আইডিয়া হিসেবে সেটা ঠিক আছে। তবে গাড়ি যদি চালাতে চাও, ইঞ্জিন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে রাখা ভাল। জানতে চাও?'

'অবশ্যই।'

'বেশ, তা হলে তুমি যেটুকু জানো, সেখান থেকেই শুরু করা যাক। পেট্রোলের বৈশিষ্ট্য কী?'

'খুব সহজে আগুন ধরে।'

'ঠিক বলেছ। ওটাই ইন্টারনাল কমবাস্চান ইঞ্জিনের রহস্য। পেট্রোলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কাজ করে ওটা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' ইঞ্জিনের গায়ে পরম মমতায় হাত বোলালেন চাচা। 'লোহালক্কড়ের এই জঞ্জালের ভিতরে রয়েছে চারটে সিলিণ্ডার... প্রত্যেকটার ভিতরে রয়েছে একটা করে পিস্টন—ওগুলোই চালায় ইঞ্জিনকে। এ-মুহূর্তে সিলিণ্ডারগুলো দেখতে পাচ্ছ না, কারণ মেটাল জ্যাকেট দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে ওগুলোকে, আর ওই জ্যাকেটের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি—ইঞ্জিনের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখার জন্য। পানিটা রেডিয়েটরে এসে জমা হয়... এই যে, এখানে। ফ্যান দেখতে পাচ্ছ? ওটা রেডিয়েটরে জমে থাকা গরম পানিকে ঠাণ্ডা করে, আর ঠাণ্ডা পানি আবার প্রবাহিত হয় ওই জ্যাকেটের মধ্য দিয়ে। পুরোটাই একটা চক্র। বুঝতে পারছ?'

'কিছুটা। কিন্তু বিস্ফোরণ হয় কোথায়?'

'বলছি। পেট্রোল ইঞ্জিন আসলে একটা বিস্ময়—অসংখ্য পার্টস আছে ভিতরে, প্রতিটাই পরস্পরের সঙ্গে এত নিখুঁত ছন্দ মিলিয়ে কাজ করে যে ভাবলে অবাক হতে হয়। যা হোক, এটা ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিন, তার মানে প্রতিটা পিস্টন তার সিলিণ্ডারের ভিতরে চার স্ট্রোকের চক্র অনুসরণ করে।' হাত নেড়ে দেখালেন চাচা, 'উপর-নিচ... উপর-নিচ... এভাবে। বোঝা গেল?'

'হুঁ।'

'গুড। স্টার্টারের সাহায্যে শুরু হয় পুরো প্রক্রিয়া। পিস্টন যখন নিচের দিকে যায়, উপরে একটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়, তখন কারবুরেটর থেকে কুয়াশার মত পেট্রোলের মিহি একটা কুয়াশা চলে আসে সেই ভ্যাকুয়ামে। বাতাসের সঙ্গে পেট্রোলের এই মিশ্রণে তৈরি হয় দাহ্য গ্যাস। ওটাই প্রথম স্ট্রোক... মানে, ইণ্ডাকশন স্ট্রোক। এরপর আসে কম্প্রেশন স্ট্রোক—পিস্টনটা

উপরে এসে চাপ সৃষ্টি করে গ্যাসে; এরপর তৃতীয় স্ট্রোকের জন্য যখন ওটা নিচে নামে, বিদ্যুতের একটা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে স্পার্কিং প্লাগের সাহায্যে। এই যে, এগুলো।'

আঙুল দিয়ে ইঞ্জিনের উপর দিয়ে বেরিয়ে থাকা কতগুলো চকচকে নব দেখালেন চাচা। তারপর হাসলেন। 'এবার তুমিই আন্দাজ করো, দাহ্য গ্যাসের মাঝখানে স্ফুলিঙ্গ দিলে কী ঘটবে।'

'আগুন জ্বলে উঠবে,' রানার তড়িৎ জবাব।

'ঠিক। বিস্ফোরণ ঘটে তখুনি। সেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড চাপে সিলিণ্ডারের একেবারে নিচে নেমে যায় পিস্টন। তার ফলে ক্র্যাঙ্কশাফট, ফ্লাইহুইল আর অন্যান্য সিলিণ্ডারের পিস্টন ঘোরে। গ্যাসটা পুড়ে শেষ হয়ে গেলে প্রথম পিস্টন আবার উঠে যায় উপরে, পরের সাইকেল শুরু করবার জন্য। পোড়া গ্যাসটা ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যায় এগজস্ট পাইপ দিয়ে।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা, যদিও পুরোপুরি বোঝেনি সবকিছু।

'ইঞ্জিনের যে-আওয়াজ আমরা শুনতে পাই,' চাচা বলে চললেন, 'তা আসলে সিলিণ্ডারের ভিতরে অগুনতি বিস্ফোরণের আওয়াজ। ওর সাহায্যেই ক্র্যাঙ্কশাফট ঘোরে... চাকাকে ঘোরায়।' বনেটের ঢাকনা নামিয়ে দিলেন তিনি। 'ড্রাইভ করতে চাও?'

বিস্মিত চোখে চাচার দিকে তাকাল রানা। 'আমি তো ড্রাইভিং জানি না!'

'শেখানোর জন্যেই বলছি। একদিন না একদিন তো শিখতে হবেই, তাই না?'

'সত্যি শেখাবে, চাচা?'

'যদি তুমি চাও।'

'চাই না মানে!' রানা উত্তেজিত। 'এমন সুযোগ হাতছাড়া করব ভেবেছ?'

'পাগল ছেলে!' হেসে মাথা নাড়লেন চাচা। পেট্রোলের দাম মিটিয়ে উঠে পড়লেন গাড়িতে। ফিরতি পথ ধরলেন কিথলির দিকে।

গ্রাম পেরিয়ে এস্টেটের রাস্তায় নেমে ব্রেক কষলেন চাচা। বললেন, 'এখানেই প্র্যাকটিস করা যাক। আশপাশে আর কোনও গাড়ি নেই, জায়গাটাও নিজস্ব, প্রাণ খুলে ড্রাইভ করা যাবে। পাকা রাস্তা হলে আরও ভাল হতো, তবে সেটা বড় কোনও সমস্যা নয়। কাঁচা রাস্তায় ড্রাইভিং শিখলে পাকা রাস্তায় আরও ভালমত চালাতে পারবে।'

'কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যদি কোনও গাছ-টাছের সঙ্গে লাগিয়ে দিই?' দ্বিধান্বিত গলায় বলল রানা।

'সমস্যা নেই, মেরামত করে নেব,' বললেন চাচা। 'গাড়িটা তো এখন আর লাগছে না আমার। বুবুর আলাদা গাড়ি আছে, এটা পড়েই থাকে। তাই বলে হেলাফেলা কোরো না। যদি ঠিকমত দেখভাল করতে পারো, গাড়িটা একদিন তোমাকে দিয়ে দেব।'

'সত্যি বলছ?' চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল রানার।

'হুঁ।' গিয়ার নিউট্রালে দিয়ে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামলেন চাচা। রানাকে ইশারা করলেন ড্রাইভিং সিটে বসতে। বসল ও। চাচা নিলেন ওর জায়গা।

স্টিয়ারিং হুইল দু'হাতে ধরে ড্যাশবোর্ডের উপর নজর বোলাল রানা। যতটা সহজ লাগছিল প্যাসেঞ্জার সিট থেকে, ততটা লাগছে না আর। নার্ভাস ভঙ্গিতে তাকাল মিটার, প্যাডাল আর গিয়ারস্টিকের দিকে।

'কোন্‌টা কী কিছুই তো জানি না,' বলল ও।

শিখিয়ে দিলেন চাচা, 'যেটা ধরে আছ সেটা স্টিয়ারিং হুইল। মাঝখানে রয়েছে হর্ন। ড্যাশবোর্ডে যে-চাবিটা দেখছ, সেটা

ইগনিশন। মিটারগুলো স্পিড, ইঞ্জিনের আরপিএম আর ট্যাঙ্কে তেলের পরিমাণ দেখায়। পায়ের তলায় রয়েছে অ্যাকসেলারেটর, ব্রেক আর ক্লাচ। বাম পায়ে ক্লাচ চেপে গিয়ারস্টিক নাড়াতে হয়। গিয়ারের সঙ্গে বাড়ে-কমে গাড়ির গতি। পা দিয়ে নাগাল পাচ্ছ প্যাডালগুলোর?'

'পাচ্ছি।'

'গুড। তা হলে অ্যাকসেলারেটর চাপো। গিয়ার দেবার প্রয়োজন নেই।'

পা দিয়ে অ্যাকসেলারেটর পুরোটাই চেপে দিল অনভ্যস্ত রানা। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ পশুর মত গর্জে উঠল ইঞ্জিন। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিল ও।

'ওভাবে না,' চাচা বললেন। 'আস্তে আস্তে... খুব মোলায়েমভাবে চাপবে। থেমে থাকা অবস্থা থেকে গাড়িকে চলতে শুরু করাই সবচেয়ে কঠিন। ব্যাপারটা অনেকটা পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠার মত। শুরুতে কী করবে তুমি? ছোট ছোট, দ্রুত কদম ফেলতে হবে তোমাকে, রাইট? কিন্তু যখন ওপরে উঠে অন্যপাশের ঢাল ধরে নামবে, তখন লম্বা কদম ফেলতে পারবে তুমি অনায়াসে... সময় নিয়ে। গাড়ির ব্যাপারটাও তাই। মুভমেণ্ট শুরু করবার জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু একবার যদি চলতে শুরু করে, তখন কাজটা সহজ হয়ে যায়। বোঝাতে পারলাম?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল। এখানেই কিন্তু গিয়ারের ভূমিকা আসছে। গিয়ার কী? চাকার ভিতরে আরও চাকা—বিভিন্ন আকারের, খাঁজকাটা। ফার্স্ট গিয়ারে সবচেয়ে ছোট চাকাটা বড় চাকাকে ঘোরায়। সেকেণ্ড গিয়ারে এনগেজ হয় পরের চাকাটা। এভাবে টপ গিয়ারে গেলে সরাসরি মূল চাকাগুলো ঘোরে ইঞ্জিনের সরাসরি শক্তিতে, গিয়ার

হুইলের কোনও কারবার থাকে না তখন। আর একবার যদি গাড়ি চলতে শুরু করে তো শুধু স্টিয়ার করতে হবে তোমাকে।'

'এমনভাবে বলছ, যেন ব্যাপারটা খুব সহজ,' রানার কণ্ঠে দ্বিধা।

'আসলেই সহজ। তবে গিয়ারের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগবে হয়তো। তারপর থেকে ওসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে। অবচেতনভাবে অপারেট করতে পারবে সব... গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে শরীরের বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত।'

ইগনিশন অফ করে রানাকে গিয়ারের পজিশনগুলো শেখালেন চাচা।

'নিয়মটা সিম্পল,' ব্যাখ্যা করলেন চাচা। 'ক্লাচ চেপে ইঞ্জিনকে ফ্রি করে নিতে হবে তোমাকে। এরপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ঘোরাতে হবে ক্র্যাঙ্কশাফট। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ক্লাচ ছাড়বে খুব সাবধানে। গিয়ার এনগেজ হলে চলতে শুরু করবে গাড়ি। থামাতে চাইলে ব্যবহার করবে ব্রেক।'

একে একে সবক'টা চাপল রানা।

'এত দ্রুত নয়,' বললেন চাচা। 'আস্তে। অ্যাকসেলারেটর আর ক্লাচের মাঝে সমতা রাখতে হবে তোমাকে। অ্যাকসেলারেটর যদি কম চাপো, গাড়ি চলবে না; আবার যদি বেশি চাপো, লাফ দেবে গাড়ি... নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।'

'বাপ রে! এ তো ভারি কঠিন!'

হাসলেন চাচা। 'প্র্যাকটিস করলে সব সোজা হয়ে যায়। শুরু করা যাক। তুমি তৈরি?'

'যতটা সম্ভব আর কী।'

'ঠিক আছে।'

ইগনিশন ঘোরালেন চাচা। ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। প্রথম

কয়েক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো রানার, নড়ল না গাড়ি। সপ্তমবারে একটু আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল ও, ক্লাচ ছাড়তেই গড়াতে শুরু করল চাকা। সন্তুষ্ট হয়ে অ্যাকসেলারেটরে চাপ বাড়াল ও।

'এই তো হচ্ছে,' প্রশংসা করলেন চাচা, পরক্ষণে আঁতকে উঠলেন। 'আরে, আরে, করছ কী! সামনে তো গর্ত!!'

নার্ভাস হয়ে গেল রানা, ব্রেক চাপার বদলে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। খপ করে পাশ থেকে স্টিয়ারিং ধরে ফেললেন চাচা, মোচড় দিলেন নিজের দিকে। একই সঙ্গে টেনে ধরলেন হ্যাণ্ডব্রেক। মুখ ঘুরে গেল গাড়ির, থমকে দাঁড়াল প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে। কেশে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'তুমি ঠিক আছ?' ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করলেন এরফান চৌধুরি।

কাঁপছে রানা। মাথা নাড়ল জোরে জোরে।

ওর ঘাড়ে হাত রেখে চাচা বললেন, 'ভয় পেয়ো না। প্রথম প্রথম এসব একটু-আধটু হয়ই। এখানে প্র্যাকটিস করতে চাওয়াটা ভুল হয়েছে। তোমার দরকার খোলা, সমতল জমি।'

আবার ড্রাইভিং সিটে উঠলেন তিনি। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন কটেজের পিছনে এক টুকরো ঘাসে ঢাকা চারণভূমিতে। কতগুলো ভেড়া চরছে ওখানে। খোলামেলা জায়গা, গাছপালা কম, মাটিতে খানাখন্দও নেই—ঠিক যেমনটা চাই। রানার হাতে আবার দেয়া হলো গাড়ি।

নার্ভাসনেস ইতিমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে রানা, আগ্রহ নিয়ে ফের শুরু করল প্র্যাকটিস। এ-দফা দু'বারের মাথাতেই গাড়িকে নড়াতে পারল। সামনে কোনও বাধা না থাকায় ফিরে পেল আত্মবিশ্বাস, ফার্স্ট গিয়ারে স্বচ্ছন্দে চলল গাড়ি। চাচার কথামত ধীরে ধীরে বাড়াল গতি।

ইঞ্জিনের গর্জন বেড়ে গেলে চাচা বললেন, 'শব্দটা শুনছ? এর মানে গিয়ার বদলানোর সময় হয়েছে। আগের নিয়মটাই ফলো করো। প্রথমে চেপে ধরো ক্লাচ, তারপর সেকেণ্ড গিয়ারে দাও, সবশেষে খুব সাবধানে রিলিজ করো ক্লাচ।'

সৌভাগ্যক্রমে কোনও গড়বড় হলো না, ছন্দপতন না ঘটিয়ে গিয়ার বদলাতে পারল রানা।

চাচা বললেন, 'সাবাস! এই তো হয়েছে!'

এবারও প্রশংসাটা অপয়া প্রমাণিত হলো। ঠিক সামনেই একটা ভেড়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেল রানা। তাড়াতাড়ি সর্বশক্তিতে চেপে ধরল ব্রেক প্যাডাল। আবারও ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়াল গাড়ি। প্রতিবাদ করে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

'সরি, চাচা,' লজ্জিত গলায় বলল রানা।

'কোনও ব্যাপার না, বেটা,' স্নেহমাখা গলায় ওকে আশ্বস্ত করলেন চাচা।

উঁচু গলায় ডাক শোনা গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মাঠের ওপাশ থেকে ফুপুকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। কাছে এসে বললেন, 'কী শুরু করলি, এরফান? ছেলেটাকে খুন করবি নাকি? ও ড্রাইভিঙের কিছু জানে?'

'না শেখালে জানবে কী করে?' গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন চাচা। পিছু পিছু রানা। 'তা ছাড়া এত ভয়েরও কিছু নেই। খুব চালু আমাদের ভাতিজা। অলরেডি ড্রাইভিঙের বেসিক নিয়মকানুন শিখে ফেলেছে। ক'দিনের মধ্যেই পাকা ড্রাইভার হয়ে যাবে।'

'বুঝেছি, এবার ক্ষান্ত দে,' বললেন ফুপু। 'বাড়ি চল্।'

'এখুনি? শরীরটা আজ বেশ ভাল লাগছে, একটু হাঁটাহাঁটি করব ভেবেছিলাম। অন্য সময় তো পারি না।'

'ঠিক আছে, চল্। আমিও যাব। গাড়িটা এখানেই থাক, পরে

এসে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

রানাকে নিয়ে মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন চাচা আর ফুপু। শেষ বিকেলের আলোয় রাঙা হয়ে আছে সব। বইছে মৃদুমন্দ হাওয়া। শহরের দূষণ নেই, আলো-বাতাস সবই নির্মল... প্রাকৃতিক। খুব ভাল লাগছে রানার। মাঠ পেরিয়ে গাছপালার সারি, তারপর বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর—ঘাস, ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মে ঢাকা। তার কিনারে পৌঁছে থামল ওরা। সূর্য তখন ডুবু ডুবু। প্রান্তরের ওপাশের পাহাড়সারি কালচে লাল বর্ণ ধারণ করেছে সেই আলোয়।

মাথার উপর একটা বাজপাখি উড়ছে—বাতাসে মেলে দিয়েছে চওড়া ডানা, পেয়েছে উড়োজাহাজের আকৃতি। তীক্ষ্ণ, গগনবিদারী ডাক ছাড়ল পাখিটা, পাক খেয়ে চলে গেল আরেক দিকে। এরপর সব আবার চুপচাপ।

নিস্তব্ধ প্রান্তরের দিকে ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে রইল রানা, প্রকৃতির বিশালত্বের সামনে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। দূরে কোথাও আগুন জ্বালানো হয়েছে, আকাশের গায়ে উঠে এসেছে সরু এক ধোঁয়ার রেখা; এ ছাড়া কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। সব প্রকৃতির দখলে।

'সুন্দর না?' নীরবতা ভেঙে বললেন চাচা। 'বিশ্বাস করা কঠিন, এত সুন্দর জায়গার কোনও মালিক থাকতে পারে। কিন্তু আছে। যা দেখছ সব লর্ড গ্রিফিনের সম্পত্তি।'

'দুর্গটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'পাহাড়গুলো দেখছ?' ছড়ি তুলে ইশারা করলেন চাচা। 'ওগুলোর পিছনে একটা লেক আছে—সিলভারব্যাক লেক। পানির মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপের মত আছে, সেখানেই লর্ড গ্রিফিনের দুর্গ। গ্রাম থেকে ওখানে যাবার একটা রাস্তা আছে, তবে সেটা খুব বেশি ব্যবহার হয় না। দুর্গটাকে বাকি পৃথিবীর কাছ

থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন ভদ্রলোক।'

ড্যানির কথা ভাবল রানা। কীভাবে যেন বার বার ওদের ভাগ্য জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে।

ঘড়ি দেখলেন ফুপু। 'ফেরা যাক, অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যায় আবার সার্কাসে যাবার কথা আছে।'

'হুঁ,' বলে উল্টো ঘুরলেন চাচা।

রানাও ঘুরল, তবে তার আগে কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে রইল পাহাড়শ্রেণীর দিকে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—যাবে ও... যাবে ওই রহস্যময় দুর্গটা দেখতে।

এগারো

সারাদিনের হাঁটাচলায় কাহিল হয়ে পড়েছেন এরফান চৌধুরি, সার্কাসে যাবেন না বলে জানালেন। ডিনার খেয়ে চলে গেলেন নিজের কামরায়—শুয়ে পড়বেন। চাচার জন্য মায়া হলো রানার, অল্প ক'দিনেই কেমন বুড়িয়ে গেছেন। কখনও ভাবেনি ছটফটে, প্রাণচঞ্চল মানুষটাকে এমন করুণ অবস্থায় দেখবে।

খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর ফুপুর বেন্টলি গাড়িতে চেপে রওনা হলো সার্কাস দেখতে।

'কেমন লাগছে তোমার?' ফুপু জানতে চাইলেন।

'ভাল,' রানা জানাল। 'বিশেষ করে গাড়ি চালিয়ে খুব মজা পেয়েছি আজ বিকেলে।'

'যাক, বাঁচা গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ফুপু। 'আমি তো দুশ্চিন্তা করছিলাম—সমবয়েসী কেউ নেই, বড়দের সঙ্গে সময় কাটাতে তোমার বিরক্তি লাগবে কি না।' আঁকাবাঁকা রাস্তা থেকে চোখ সরাচ্ছেন না তিনি। 'এরফানও খুব এনজয় করছে। এখানে আসার পর থেকে আজকের মত হাসিখুশি আর কখনও দেখিনি ওকে। তুমি আসায় ওর জন্যেও সত্যিই খুব ভাল হয়েছে।'

'হুঁ।'

আর কোনও কথা হলো না। ড্রাইভিঙে মনোযোগ ফুপুর। রানা তাকিয়ে আছে বাইরে। আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে এলাকার চেহারা। গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় রোডলাইট নেই, তাই চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কদাচিৎ চোখে পড়ে দূর থেকে ভেসে আসা আলোর রেখা। হেডলাইটের আলো দেখে মনে হচ্ছে কোনও সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে চলেছে ওরা। মৃদু গুঞ্জন করছে বেন্টলির ইঞ্জিন, কোনও ছন্দপতন নেই। ফুপুর হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পাকা ড্রাইভার তিনি। সিটে শরীর এলিয়ে দিল রানা।

একটু পরেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল ওরা। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে উদ্ভাসিত হলো সার্কাসের বিশাল তাঁবু—ডোরাকাটা, আলো ঝলমলে। কোনও দৈত্যের ফেলে যাওয়া বিশাল এক বার্থডে কেক যেন

ঘাসে ঢাকা জমিতে গাড়ি পার্ক করলেন ফুপু। রানাকে নিয়ে মিশে গেলেন স্থানীয় লোকজনের জটলায়। প্রচুর জনসমাগম হয়েছে, রানার মনে হলো পুরো এলাকাই ভেঙে পড়েছে সার্কাস দেখতে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ... সব ধরনের মানুষ দেখা যাচ্ছে আশপাশে। সবার মাঝেই চাপা উত্তেজনা।

কাউন্টার থেকে দুটো টিকেট কিনলেন ফুপু, তারপর লাইন ধরলেন তাঁবুতে ঢোকার জন্য। কাছেই কোথাও একটা জেনারেটর

চলছে, তার আওয়াজে কান ঝালাপালা। আশপাশে ছোট ছোট আরও কিছু তাঁবু, ওয়্যাগন আর স্টল চোখে পড়ল রানার—শুটিং রেঞ্জ, আয়নাঘর, হস্তরেখা গণনা... এমনতরো বিভিন্ন আইটেমের জন্য। খেলনা, চকোলেট আর খাবার-দাবারও বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। ভেবেছিল এসবে মজা পাবার বয়স পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এখন রানাও উত্তেজনা অনুভব করছে। ফুপুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাখল, সার্কাস দেখা শেষ হলে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখবে।

মূল তাঁবুর ভিতরে ম্লান আলো, জেনারেটরের ক্ষমতার তুলনায় বেশি বালব লাগানো হয়েছে। বাতাসে ভাসছে সার্কাসের জীবজন্তু আর মাটিতে বিছানো খড় ও কাঠের গুঁড়োর গন্ধ। সামনের দিকের একটা বেঞ্চ দখল করলেন ফুপু। তার খানিক পরে শুরু হলো অনুষ্ঠান। বাদ্য বাজাতে বাজাতে মার্চ করে মাঝখানের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ঝলমলে পোশাক পরা বাদকদল। তাদের পিছু পিছু পারফর্মারদের মিছিল নিয়ে উদয় হলো মোটাসোটা রিংমাস্টার। বাজনা থামলে দর্শকদের স্বাগত জানাল, তারপর পরিচয় করিয়ে দিল অ্যাক্রোব্যাট, ট্র্যাপিজ আর্টিস্ট, জাগলার, ক্লাউন... এমনকী ঘোড়া, হাতি আর প্রশিক্ষিত বানরদলের সঙ্গে। করতালির মাঝ দিয়ে এরপর শুরু হলো সার্কাসের মূল পর্ব।

এরচেয়ে ভাল সার্কাস দেখার অভিজ্ঞতা আছে রানার, তাই বলে আজকেরটা উপভোগ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। গ্রাম্য পরিবেশ, অতি-সাধারণ জনতা ও তাদের হৈ-হল্লা মিলিয়ে ভিন্ন এক রোমাঞ্চ অনুভব করছে ও।

প্রথম ইভেন্ট ভারসাম্য রক্ষার। গমগমে গলায় ঘোষণা শেষ হতেই ছুটতে ছুটতে রিঙে ঢুকল তিনটে সাদা ঘোড়া, তাদের পিঠে রুপালি পোশাক পরা তিনটি মেয়ে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে

নানা রকম কসরৎ দেখাতে শুরু করল তারা। এক পায়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনও বা হাতের উপর ভর দিয়ে উল্টে থাকছে, এক পর্যায়ে এক ঘোড়ার পিঠ থেকে আরেক ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে জায়গা বদল করল।

মুহুর্মুহু করতালিতে ভরে গেল তাঁবু। স্পটলাইটের আলো ক্ষণিকের জন্য পারফর্মারদের ছেড়ে চলে এল গ্যালারিতে। আর তখুনি ভিড়ের মাঝে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলএকটি মেয়ের মুখ। ওরই মত বয়স, মাথাভরা দীঘল সোনালি চুল—ঝুঁটি করে বেঁধে রেখেছে পিছনে। অ্যাক্রোব্যাটদের পোশাকের রূপালি চুমকিতে প্রতিফলিত হয়ে ঝিকমিকে আলো খেলা করছে সুন্দর মুখটায়। চোখদুটো পান্নার মত সবুজ... অমন গাঢ় সবুজ চোখ আগে কখনও দেখেনি রানা। ওর ঠিক উল্টোদিকে, একেবারে মুখোমুখি বসে আছে মেয়েটি, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে ঘোড়া ও তার আরোহীদের দিকে।

খেলা শেষ করে তিন ঘোড়সওয়ার রিং থেকে বেরিয়ে গেলে স্পটলাইট সরে গেল। মেয়েটি হারিয়ে গেল ছায়ার মাঝে, তাকে আর দেখতে পেল না রানা। গ্যালারির অন্য একটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল এবার। তার মাঝখানে নতুন একজনের উপর নজর পড়ল ওর। বিশালদেহী একজন পুরুষ, পুরু গোঁফজোড়া নেমে এসেছে ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে। মাথায় ফ্ল্যাট ক্যাপ, গায়ে টুইডের নতুন জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স... যেন এইমাত্র কিনে এনেছে দোকান থেকে। চারপাশের সাধারণ বেশভূষার মানুষের মাঝে বিসদৃশ হয়ে উঠেছে। মনে হলো স্কটিশ সাজবার চেষ্টা করছে সে, যদিও আদপে স্কটিশ নয়।

বেশিক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না রানা, কারণ ট্র্যাপিজের খেলা শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুর উঁচু ছাতের কাছে স্থাপন করা রিগিঙের মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে ট্র্যাপিজ আর্টিস্টেরা। ক্ষণে

ক্ষণে আঁতকে ওঠার মত শব্দ করল দর্শকেরা, এই বুঝি উপর থেকে পড়ে যায় ওরা... কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে সবাইকে মাতিয়ে তুলল ট্র্যাপিজ দলের সদস্যরা। খেলা শেষ হলে হাততালি আর প্রশংসার ঢেউ বয়ে গেল।

এরপর আরও কিছু খেলা দেখানো হলো, তার মাঝে রানা সবচেয়ে মুগ্ধ হলো সার্কাসের শক্তিমানবের কার্যক্রমে। *মাইটিডোনোভান* নাম তার, বাস্তবেও ভয়ানক শক্তিশালী। স্রেফ দাঁত দিয়ে কামড়ে ভারী ভারী জিনিস তুলে ফেলল। ওয়েটলিফটিঙের ভারী চাকতি দিয়ে জাগলিং করল, খালি হাতে রিঙের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল একটা ট্রাক! তালি দিতে দিতে হাত ব্যথা করে ফেলল রানা।

সবমিলিয়ে চমৎকার সময় কাটল ওর। প্রদর্শনী শেষ হলে ফুরফুরে মনে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। আর তখুনি দেখা হয়ে গেল রব রাইলি ওরফে রেডের সঙ্গে। শুকনোমত এক মহিলার সঙ্গে সে-ও সার্কাস দেখতে এসেছে,নিশ্চয়ই ওর বিধবা চাচি। চাচির চেহারা বিমর্ষ, বোঝা যাচ্ছে সার্কাস তাঁকে টানছে না।

'তোমার ট্রেনের বন্ধু না?' ওদেরকে দেখতে পেয়ে বললেন ইসমাত ফুপু। 'সঙ্গে দেখছি অ্যানি রাইলি! চলো দেখা করি।'

ভিড় ঠেলে এগোল দু'জনে। কাছাকাছি যেতেই রানাকে দেখতে পেয়ে রেড হাসিমুখে বলল, 'হাই, মেইট! কেমন আছ?'

'ভাল,' রানা বলল। 'তোমরা ভিতরে ছিলে? দেখতে পাইনি তো!'

'আমি দেখেছি তোমাকে। হাতও নেড়েছিলাম, তুমি লক্ষ করোনি। যাক গে, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার চাচি—মিসেস অ্যানি রাইলি।'

'হ্যালো, অ্যানি,' হাসিমুখে বললেন ফুপু। 'রডনির কোনও খবর পেলে?'

'না,' যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন অ্যানি। 'ছেলেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।'

রানার হাতে কিছু খুচরো টাকা গুঁজে দিলেন ফুপু। বললেন রেডকে নিয়ে ঘুরে আসতে। অ্যানির সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর তোমার, রেড? কাজ কিছু এগোল? তোমার চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পেরেছ?'

'নাহ,' মাথা নাড়ল রেড। 'সবে তো এলাম, খোঁজখবর নিতে সময় লাগে না?'

শুটিং রেঞ্জে থামল রানা। এয়ারগান দিয়ে দশ গজ দূরে ঝোলানো বেলুন ফুটো করতে হবে। অ্যাটেনডেন্টকে টাকা দিয়ে তুলে নিল একটা বন্দুক। নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়ল। প্রথমটা লাগাতে পারল না, তবে বুঝে নিল কীভাবে কোথায় মারতে হবে। সেইমত কারেকশন দিয়ে ছুঁড়ল পরের চারটে গুলি, ফুটো করে দিল চারটা বেলুন। তিনটা ফাটালেই পুরস্কার পাওয়া যায়, কাজেই রেঞ্জের একপাশে রাখা শেলফ থেকে ওকে পুরস্কার বেছে নিতে বলল অ্যাটেনডেন্ট।

ইউনিফর্ম পরা সৈনিকের ছোট্ট একটা মূর্তি নিল রানা, বাড়ি ফিরে চাচাকে উপহার দেবে। নিশ্চয়ই খুশি হবেন তিনি।

'দারুণ শুট করেছ,' রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে বলল রেড। 'শিকার-টিকার করো নাকি?'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'স্কুলের একটা কম্পিটিশনে শুটিং করতে হয়েছিল। তখন খানিকটা শিখেছি।'

'বলো কী!' কপালে চোখ তুলল রেড। 'তোমাদের স্কুলে গোলাগুলির কম্পিটিশন হয়?'

হাসল রানা। 'হ্যাঁ,' বলে আরও ভড়কে দিল বন্ধুকে।

খাবারের স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। কাঁচের

বুদেসাজানো বাহারি মিষ্টি আর চকোলেট থেকে কোন্‌টা নেবে ভাবছিল, এমন সময় দৃষ্টি চলে গেল হস্তরেখা-বিশারদের তাঁবুর দিকে। পর্দা ঠেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে ড্যানি গ্রিফিন, সঙ্গে স্থানীয় দুটো ছেলে। সাগরেদ জুটিয়ে নিয়েছে ছুটিতে এসেও।

কনুই দিয়ে রানাকে গুঁতো দিল রেড। 'ওই দেখো। তোমার ট্রেনের সেই বন্ধু!'

এক পলক তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল রানা। বলল, 'এদিকেই থাকে ও। গ্রিফিন এস্টেটের দুর্গে।'

'তাই নাকি?'

'চেনো জায়গাটা?'

'না। এই প্রথম শুনলাম।'

রানা আর রেডকে ড্যানিও দেখতে পেয়েছে। থমথমে হয়ে উঠেছে চেহারা। ওদিকে আড়চোখে তাকাতেই দুই সাগরেদের কানে কানে তাকে কিছু বলতে দেখল রানা। পাত্তা দিল না। ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল ধনীর দুলাল।

বাছাই করে কিছু চকলেট আর স্ন্যাকস কিনল রানা, রেডকে নিয়ে চলে এল তাঁবুর সারি থেকে একটু দূরে। একটা গাছতলায় বসল বন্ধুকে নিয়ে। তারপর খেতে শুরু করল দু'জন। একই সঙ্গে চলল গল্প।

'আমার চাচার ধারণা, গ্রিফিনদের এলাকায় গিয়ে থাকতে পারে রডনি—মাছ ধরতে,' রানা বলল। 'ওদিকে একটা বড় লেক আছে... সিলভারব্যাক লেক। গিয়ে দেখে আসা যায়। কী বলো?'

'হুম,' মুখের খাবার গিলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রেড। 'মাছ ধরার শখ ছিল রডনির। যেতেও পারে। ওদিকে একবার ঢুঁ মেরে এলে মন্দ হয় না। আগামীকাল যেতে পারবে? কোনও কাজ আছে?'

'না। কাজ কীসের? কালই যাব।'

আরও কিছু বলতে চাইছিল রানা, বাধা পেল উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পেয়ে।

'ওই যে, শালারা! পেয়েছি!'

ঘাড় ফিরিয়ে ড্যানির দুই সাগরেদকে দেখতে পেল, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে এদিকে। এরা ইটনের ছেলেদের মত পরিশীলিত নয়, হাট্টাগাট্টা গাঁয়ের ছেলে। রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে রুক্ষ চেহারা, পরিশ্রমে গড়া পেশিবহুল সুঠাম দেহ। হাত তো নয় যেন হাতুড়ি একেকটা।

খাবারের প্যাকেট নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রেড। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কী খবর, দোস্ত?'

'দোস্ত-ফোস্ত রাখো!' খেঁকিয়ে উঠল একটা ছেলে, মুখভরা বসন্তের দাগ। 'বিদেশিদের সঙ্গে দোস্তি করি না আমরা... বিদেশিদের দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'কে বিদেশি?'

'তুমি, আইরিশ কুত্তা! আর তোমার সঙ্গের ওই ইণ্ডিয়ান বাঁদরটা!'

রানাও উঠে দাঁড়াল। কিছু বলবে ভেবেও নিরস্ত করল নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে এরা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে এসেছে... আর কেন এসেছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার

রেডের মুখের হাসি মলিন হয়নি। সে বলল, 'বেশ, দোস্তি না করলে নাই। গালাগালির তো কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'তা হলে মার খাবে?' মুঠো পাকিয়ে দেখাল দ্বিতীয় ছেলেটা, গলা বকের মত লম্বা।

'নিতান্ত বাধ্য না হলে মারামারি করি না আমরা।'

'জানতাম, তোমরা কাপুরুষ।' বলেই রানার বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল লম্বা গলার ছেলেটা। তাল হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল ও। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাগে মাথায় আগুন জ্বলছে।

'ও, বাবা! এ দেখি আবার চোখ রাঙায়!' বলল লম্বা গলা। 'তবে রে...'

ঘুষি চালাল সে। স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে নিচু হয়ে গেল রানা, মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দিল ঘুষিটাকে। পরমুহূর্তে নিজে ঘুষি চালাল—হাতের মুঠো দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করল ছেলেটার উন্মুক্ত পেটে। হুঁক করে একটা শব্দ করল সে—যত না ব্যথা পেয়েছে, অবাক হয়েছেতারচেয়ে বেশি। শহুরে ছেলে এভাবে পাল্টা আক্রমণ করবে ভাবতে পারেনি। পেট চেপে ধরে পিছিয়ে গেল দু'পা।

আর মারল না রানা, তাকাল রেডের দিকে। কী করেছে সে কে জানে, মাটিতে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে বসন্তের দাগঅলা ছেলেটা। রক্ত গড়াচ্ছে নাক দিয়ে। দু'হাতে তলপেট চেপে ধরে ককাচ্ছে সে। সঙ্গীর এ-দশা দেখে সাহস হারাল লম্বা গলা। তাড়াতাড়ি বন্ধুকে ধরে দাঁড় করাল।

'তুমি ঠিক আছ, অ্যাঙ্গাস?' জিজ্ঞেস করল সে, গলা কাঁপছে।

'হ্যাঁ,' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাক থেকে রক্ত মুছল প্রথম ছেলেটা। 'আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে।'

দু'জনে উল্টো ঘুরল।

'কিছু মনে কোরো না, দোস্ত,' পিছন থেকে পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল রেড। 'আজকের ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো।'

কিছু না বলে চলে গেল ছেলেদুটো।

'চলো, আমাদেরও ফেরা দরকার,' রানাকে বলল রেড। 'চাচি-ফুপুরা দুশ্চিন্তা শুরু করবার আগেই।'

খাবারের প্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

প্রশংসার গলায় রানা বলল, 'দেখালে বটে! ছেলেটাকে ওভাবে ঘায়েল করলে কীভাবে, একটু বলবে?'

'আরে দূর!' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রেড। 'আমি

আর কী করেছি, তুমিও তো দেখলাম আচ্ছামত ঝেড়ে দিলে লম্বুটাকে।'

'ওতে ওর কিচ্ছু হয়নি। পেট তো না, মনে হলো ময়দার একটা বস্তায় মেরেছি । ভয় না পেলে আমাকে তুলোধুনো করতে পারত। আর ভয়টা পেয়েছে তোমার জন্য। যেভাবে ওর দোস্তকে মাটিতে ফেলে দিলে...'

'লড়াইয়ে জিততে চাইলে প্রথম কৌশল ওটাই। প্রতিপক্ষকে শুরুতেই ঘাবড়ে দিতে হবে, যাতে সে তোমার দুর্বলতা বুঝে ওঠার সময় না পায়।'

ইসমাত ফুপু আর রেডের চাচিকে পাওয়া গেল পার্ক করা গাড়ির পাশে। লিফট দিতে চাইলেন ফুপু, রেডের চাচি আপত্তি করলেন না। সবাই উঠে পড়ল বেন্টলিতে। রওনা হলো কিথলির উদ্দেশে। এক ফাঁকে অনুমতি চাইল রানা—পরদিন রেডের সঙ্গে ঘুরতে যাবে। রাজি হলেন ফুপু, তবে জানিয়ে দিলেন, সন্ধ্যা নামার আগেই ফিরে আসতে হবে।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে ড্যানি গ্রিফিনের কথা ভাবল রানা। সন্দেহ নেই, গাঁয়ের ছেলেদুটোকে সে-ই লেলিয়ে দিয়েছিল ওর আর রেডের পিছনে। ওদের মাঝে শত্রুতা দিন দিন বাড়ছে আরও। চেষ্টা করেও এড়ানো যাচ্ছে না ছেলেটাকে। অদৃশ্য কোনও শক্তি যেন খেলছে ওদেরকে নিয়ে... রানাকে পরিচালিত করতে চাইছে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে। কী সেটা? গ্রিফিনদের রহস্যময় দুর্গ?

সার্কাস থেকে জেতা মূর্তিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল রানা, এবার রেখে দিল বেডসাইড টেবিলে, পানির জগের পাশে। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে এক চিলতে চাঁদের আলো, মেঝেতে পড়ে নাচছে যেন। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ মুদে এল রানার।

হঠাৎ শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার। তন্দ্রা টুটে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল রানা। আবারও হলো চিৎকারটা। এবার বুঝল: শেয়ালের ডাক। নিশিরাতে এভাবেই ডাকে ওরা, আগেও শুনেছে। তাই বলে বুকের ধড়ফড়ানি কমল না। জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে খেল ঢকঢক করে। শুয়ে পড়ল ফের।

উত্তেজনা অনুভব করছে রানা। একটু ভয় ভয়ও করছে।

আগামীকাল গ্রিফিনদের রহস্যময় দুর্গ দেখতে যাবে ও। কী আছে ওখানে?

বারো

সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠল রানা, হাত-মুখ ধুয়ে হাজির হলো কিচেনে—ব্রেকফাস্টের জন্য। এরফান চৌধুরি আগেই উঠেছেন, পত্রিকা পড়তে পড়তে অপেক্ষা করছেন ওর জন্য। মোটাসোটা এক মহিলারও দেখা মিলল, কিচেন পরিষ্কার করছে।

'গুড মর্নিং, চাচা।'

'গুড মর্নিং, রানা। হাতে কী?'

মূর্তিটা নিয়ে এসেছে রানা, তুলে দিল চাচার হাতে। 'গতকাল সার্কাসে শুটিং করে পুরস্কার পেয়েছি। তোমার জন্য নিয়ে এলাম।'

'থ্যাঙ্কস,' বললেন চাচা। নেড়েচেড়ে দেখলেন মূর্তিটা, তারপর নামিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর। 'তাড়াতাড়ি নাশতা

সেরে নাও। গাড়ি চালানোর প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে। মাছ ধরতে যাবারও ইচ্ছে আছে। দেখি, তোমাকে দু-চারটে কৌশল শেখানো যায় কি না।'

ইতস্তত করল রানা। 'ইয়ে... কিছু মনে কোরো না, চাচা... আমার আসলে অন্য প্ল্যান আছে। একজন বন্ধু পেয়েছি, তার সঙ্গে আজ একটু ঘুরতে যাবার কথা।'

হতাশার একটা ছায়া চকিতে খেলা করে গেল চাচার চেহারায়। পরমুহূর্তে হাসলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। 'অবশ্যই! এই বয়সে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াই উচিত। আমার মত বুড়োহাবড়ার সঙ্গে সারাক্ষণ কাটালে বিরক্তি তো লাগবেই...'

'আমি মোটেই বিরক্ত হইনি!' প্রতিবাদ করল রানা।

'কথার কথা বলেছি। যাও, ঘুরে এসো। আমারও বিশ্রাম দরকার। গতকালকের ছোটাছুটিতে কাহিল লাগছে এমনিতেই। তোমার কথা ভেবে ড্রাইভিং আর মাছ ধরতে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম।'

'মন খারাপ করোনি তো?'

'আরে নাহ্! মার্থা, নাশতা দাও আমাদের। ভাল কথা, পরিচয় হয়েছে তোমাদের? রানা, এ হলো মার্থা বার্লি—এখানকার হাউসকিপার। তোমার ফুপু যখন থাকে না, ও আর ওর স্বামী এই এস্টেটের দেখাশোনা করে। মার্থা, এ হলো আমাদের ভাতিজা—মাসুদ রানা।'

'হ্যালো!' মোটা মহিলাটির দিকে মাথা ঝাঁকাল রানা।

মার্থাও নড করল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' কেমন যেন রসকষহীন গলা। চেহারাও রুক্ষ। তবে ক'দিন পরেই রানা জানতে পারবে, বাইরেটা কঠিন হলেও মহিলার মন খুব নরম।

'ফুপু কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'বাজারে গেছে,' চাচা বললেন। 'সকাল সকাল না গেলে কিছু

পাওয়া যায় না। তুমি যাবে কীভাবে?'

'গতকাল রাস্তা চিনে নিয়েছি, হেঁটে চলে যাব কিথলিতে। এখান থেকে খুব বেশি দূরও নয়। আশা করি অসুবিধে হবে না।'

বেলা দশটায় কিথলির টাউন হলের সামনে পৌঁছুল রানা। রেডের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটু পরেই শিস বাজাতে বাজাতে হাজির হলো সে।

'গুড মর্নিং, মেইট!' রানাকে দেখতে পেয়ে সম্ভাষণ জানাল স্বভাবসুলভ কায়দায়। 'অভিযানে যাবার জন্য প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ,' পিঠে ঝোলানো ন্যাপস্যাকের দিকে ইশারা করল রানা। দু'জনের লাঞ্চ নিয়ে এসেছে, সেইসঙ্গে কম্পাস আর স্থানীয় ম্যাপ—চাচা দিয়েছেন। সেই তুলনায় রেডের প্রস্তুতি নেই বললেই চলে, এক জোড়া বুট পরে এসেছে কেবল।

'কোন্‌দিকে যাব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রেড, কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। এলাকার কিছুই চেনে না সে।

'এসো, দেখাচ্ছি।' ন্যাপস্যাক নামিয়ে ম্যাপ বের করল রানা। বিছাল টাউন হলের বারান্দায়। দু'জনে হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে।

'কী কাণ্ড!' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রেড। 'সব ফকফকা। অথচ লণ্ডনের ম্যাপ খুললে দেখবে ঘরবাড়ি আর রাস্তাঘাট গিজগিজ করছে। এখানে দেখছি কিছুই নেই।'

সত্যিই তা-ই। ম্যাপে অল্প কিছু পাহাড়, গাছপালা আর সরু রেখা দিয়ে আঁকা রাস্তা ছাড়া কিছু নেই। বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা।

'আমরা এখানে,' আঙুল দিয়ে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্র আঁকা একটা অংশ দেখাল রানা, ওটা কিথলি গ্রাম। 'আর এটা হলো দুর্গে যাবার রাস্তা।' আঁকাবাঁকা একটা রেখার উপর এবার আঙুল

চালাল ও।

'খুব প্যাঁচানো রাস্তা,' মন্তব্য করল রেড। 'সরাসরি যাবার উপায় নেই?'

'না,' রানা মাথা নাড়ল। 'ওদিকে জলাভূমি আর জঙ্গল আছে, সেগুলোকে এড়াবার জন্যে ঘুরপাক খেয়েছে রাস্তা। ছড়ানো-ছিটানো কিছু খামার আর ঘরবাড়িও আছে ওদিকে, এই রাস্তা সংযুক্ত করছে সবক'টাকে। নদী পার হবার জন্যে আছে ব্রিজ...'

'নদীও আছে?'

'হ্যাঁ। স্কটিশ ভাষায় ওটার নাম *আবহাইন ডাব*... ইংরেজিতে ব্ল্যাক রিভার। শুনেছি নদীর পানি খুব কালো, তাই অমন নাম। আমার ফুপুর বাড়ির কাছ দিয়ে গেছে নদীটা।'

'এই ঘুরপাক খাওয়া রাস্তা ধরে গেলে সারাদিন লেগে যাবে,' গুঙিয়ে উঠল রেড। 'পরিশ্রমের কথা বাদই দিলাম।'

'রাস্তা দিয়ে যাব না আমরা, শর্টকাট নেব,' বলল রানা। 'সময় কম লাগবে। তবে জলাভূমি পেরুনোর সময় সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে এই জায়গাটা...' ম্যাপের একটা অংশ দেখাল ও। 'স্থানীয়রা বলে *আম বগলাকডাব*... ইংরেজিতে ব্ল্যাক মায়ার, মানে কালো কাদা। অগভীর একটা অংশ আছে ওটার পাশে, সেখান দিয়ে পার হব নদী। এরপর একটা সরু উপত্যকা পড়বে, সেটা ধরে পৌঁছুব একটা পুরনো মঠের ধ্বংসাবশেষে। এই যে, এখানে।' আরেকটা জায়গা দেখাল রানা। 'তারপর থেকে উঁচু জমি পাব, জলার কাছে আর যেতে হবে না। পাহাড়ি রিজ ঘেঁষে এগোলে পৌঁছুব *আম বাল্লা জিইল*... মানে সাদা গিরিপথে। ওটা পেরুলেই সিলভারব্যাক লেক।'

'মাছের ছবি কেন?' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রেড।

'মাছ না, লেকের আকৃতিই অমন,' রানা ব্যাখ্যা করল।

'স্কটিশ পুরাণের এক দানবীয় মাছের নামে রাখা হয়েছে লেকের নাম। তোমার ভাই রডনি হয়তো ওখানেই মাছ ধরতে গিয়েছিল। এই যে, মাছের চোখটা যেখানে দেখছ, সেখানেই গ্রিফিন কাসল।'

'বাপ রে, তুমি দেখি পুরো এলাকার উপর গবেষণা করে এসেছ!' বিস্ময় ফুটল রেডের গলায়।

'নতুন কোথাও যাবার আগে জায়গাটা সম্পর্কে ভালমত জেনে নেয়ার চেষ্টা করি,' রানা বলল। 'তাই ম্যাপ পেয়ে চাচার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করে এসেছি।'

'তা হলে ম্যাপ-রিডিঙের দায়িত্ব তুমিই নাও। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই দেখো, কাসল শব্দের বানানটা পর্যন্ত ভুল লিখেছে—কেইস্টিল।'

'স্কটিশ বানান। সিলভারব্যাককেও লিখেছে *ইটেরেয়াজিড*।'

'আমি এত কিছু মনে রাখতে পারব না। ম্যাপটা তুমিই রাখো।'

'ঠিক আছে।' ম্যাপ ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা। উঠে দাঁড়াল। 'রওনা হওয়া যাক।'

হেঁটে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে, ঢুকে পড়ল জঙ্গলে বার্চ, হ্যাযেল আর নাম না জানা হাজারো গাছের মিছিল ভেদ করে একটু পর বেরিয়ে এল বিশাল প্রান্তরের কিনারে। পুরো প্রান্তর উঁচু ঘাসে ঢাকা।

'টাওয়ার দেখতে পাচ্ছ?' হাত উঁচিয়ে দূরে ইশারা করল রানা। 'ওটাই সেই মঠ। চাচা বলেছেন, টাওয়ার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ওখানে। আপাতত ওটাই আমাদের লক্ষ্য। মঠ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলে বাকিটুকু ছেলেখেলা।'

'তোমার কথাই সই, মেইট। চলো এগোই।'

হাঁটতে থাকল দু'জনে। একটু পরেই মাটি ভিজে উঠল পায়ের

তলায়। অভিযোগ জানাল রেড, তার বুটের ভিতর পানি ঢুকে পড়ছে; কিন্তু কিছু করার নেই। যেখান দিয়ে নদী পার হবে, সেখানে পৌঁছে থমকে যেতে হলো। কীসের নদী... ডাঙা আর জলের সীমানা এক হয়ে গেছে, সবখানে থই থই পানি। সাবধানে জায়গাটা পার হলো ওরা, পা ফেলার জন্য ব্যবহার করল বড় পাথরের টুকরো। দু-দুবার আছাড় খেল রেড, শাপ-শাপান্ত করে উঠল গলা ছেড়ে। না শোনার ভান করল রানা। ও নিজে গামবুট পরে এসেছে, এ-ধরনের পথে চলবার জন্য আদর্শ। খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না তাই।

নদী পেরুবার পর দেখা দিল সত্যিকার অসুবিধে। জলাভূমির সবচেয়ে বিশ্রী অংশ ওটা—ব্ল্যাক মায়ার, বা কালো কাদা। বাস্তবেও তাই। বিশাল এক জমি জুড়ে থিকথিকে কালচে কাদার রাজত্ব, গভীরতা প্রায় হাঁটু সমান। পা ফেললেই আটকে যাচ্ছে কাদায়, পরের কদম ফেলতে হচ্ছে অতি কষ্টে। আরও আছে পোকামাকড়। ক্ষণে ক্ষণে উড়ে এসে বসছে উন্মুক্ত চামড়ায়, হুল ফোটাচ্ছে নির্দয়ভাবে।

জলার মাঝখান থেকে আগাছার কিছু পাতা ছিঁড়ে নিল রানা। হাতে ডলে রস বের করল, মাখল হাতে-মুখে। রেডকেও দিল।

'রসটা মেখে নাও,' বলল ও। 'গন্ধে পোকামাকড় পালাবে। কামড়াবে না আর।'

'কীভাবে জানলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রেড।

'স্কাউটসে ছিলাম এককালে, ক্যাম্পিঙে যেতে হতো। সেখানে শিখেছি।'

'থ্যাঙ্কস। কিন্তু এই দুর্গন্ধঅলা জিনিস মাখবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। তারচেয়ে পোকার কামড় খাওয়া ভাল।'

'যার যেমন মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। আবার পা বাড়াল সামনে।

চল্লিশ মিনিট লাগল কাদার সাগর পেরুতে। এরপর একটা পাহাড়ি ঢালের গোড়ায় পৌঁছুল ওরা। এই পাহাড়ের উপরেই মঠের ধ্বংসাবশেষ। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ঢাল বাইতে শুরু করল দু'জনে।

বাতাস ঠাণ্ডা, কিন্তু দরদর করে ঘামছে রেড। অর্ধেকের মত উঠেই গাল দিয়ে উঠল সে। বসে পড়ল ধপ করে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘোড়ার ডিম!' রাগী গলায় বল্‌ল রেড। 'হাঁটতে হাঁটতে জিভ বেরিয়ে গেছে। জীবনে এত হাঁটিনি আমি। আর কতদূর?'

'অর্ধেক পথ এসেছি,' আন্দাজ করল রানা। 'তবে পাহাড় পেরুলে এগোনো সহজ হবে অনেক।'

'পেরুলে মানে? এখনও কি পেরোইনি?'

'শুরু করেছি। আরও খাটতে হবে একটু পর, ঢাল আরও খাড়া হবে কিনা।'

'কী করে বুঝলে? ম্যাপে লেখা আছে?'

'লেখা নেই, আঁকা আছে। এসো দেখাই।' ম্যাপ মেলে ধরল রানা। 'রিঙের মত দাগগুলো দেখছ? এগুলো উচ্চতা নির্দেশ করে। দুই রিঙের মাঝে দূরত্ব যত কম, ঢাল তত খাড়া। আমরা এখন এখানে। দেখতেই পাচ্ছ, পরের রিংদুটো...'

'নিকুচি করি রিঙের! আগে গলায় কিছু ঢালি।' কোটের পকেট থেকে বিয়ারের একটা বোতল বের করল রেড।

রানা ভুরু কুঁচকে বলল, 'এসব খাওয়া ঠিক না। তাও আবার এ-পরিস্থিতিতে।'

'কচু জানো। পেটে অ্যালকোহল পড়লে শরীর গরম হয়। খাটুনি আর গায়ে লাগে না।'

'এত কথা শুনতে চাই না,' বলল রানা কড়া গলায়। 'ফেলো... ফেলো ওটা!'

'ফেলো মানে!'

'মানে এ-ই!' রেডের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিল রানা। 'যতক্ষণ আমার সঙ্গে আছ, এসব চলবে না। আর কিছু আছে সঙ্গে?'

মুখ কাচুমাঁচু করল রেড। 'ইয়ে... সিগারেট এনেছি। বেশি না, মাত্র দুটো স্টিক।'

'ওগুলোও ফেলো।'

'মাফ করে দাও না, দোস্ত। এই-ই শেষ। আর কোনোদিন...'

'আগে ফেলো, তারপর বাকি কথা।'

মুখ কালো করে সিগারেট ফেলে দিতে বাধ্য হলো রেড। রানার ধমক খেয়ে বাধ্য হলো পিছু পিছু হাঁটতে। খাড়া ঢাল বেয়ে কষ্টেসৃষ্টে দু'জনে উঠে এল পাহাড়ি রিজে। এদিকটা সমতল, শুকনো। মোটামুটি সহজে এগোনো গেল। মঠের ধ্বংসাবশেষকে পিছনে ফেলে হাঁটতে থাকল ওরা।

'আর পারছি না!' এক পর্যায়ে বিরক্ত গলায় বলল রেড। 'অসহ্য লাগছে এই পাহাড়ি পরিবেশ। ঘাস, মাটি আর পাথর ছাড়া কিচ্ছু নেই এদিকে। মানুষ কোথায়? ঘরবাড়ি কোথায়? উফ্! পায়ে আবার কী লাগল এসব? চুলকাচ্ছে কেন?'

'চোরকাঁটা,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'চুলোয় যাক চোরকাঁটা! তার ওপর আছে পোকামাকড়!' চটাস করে ঘাড়ে চাপড় দিল রেড। 'নরক... থেকে নরকে এসে পড়েছি। একটা ব্যাপার আজ বুঝতে পারলাম, দোস্ত—গ্রাম আর প্রকৃতির দৃশ্য ছবিতেই ভাল, বাস্তবে না। কোন্ কুক্ষণে যে...'

ওর কথায় আর কান দিল না রানা, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। রেডের চিন্তাধারার সঙ্গে একদম মিলছে না ওরটা। ক্লান্তিও লাগছে না অতটা। বরং মুক্ত বাতাসে বেরুতে পেরে শান্তি লাগছে ওর, উপভোগ করছে পরিবেশটা। অনেকটাই উপরে উঠে

এসেছে ওরা, এখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে চারপাশের অবারিত প্রাকৃতিক দৃশ্য। দক্ষিণে নদী, অরণ্য আর গ্রাম; উত্তরে রাজসিক পাহাড়শ্রেণী, ধূসর মেঘে ঢাকা। পশ্চিমে পর্বতমালার ঢাল নেমে গেছে উপকূল পর্যন্ত, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সাগরের পানিতে রোদের ঝিলিক।

বড় করে শ্বাস নিল রানা। অনাবিল প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল দেহ-মনে। নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন মনে হচ্ছে। আর কী চাই?

আর তখুনি টগবগ জাতীয় একটা ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ শুনতে পেল ও। শব্দের উৎসের দিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল ছায়ামূর্তি। পিঠে সওয়ারী নিয়ে একটা কালো ঘোড়া ছুটে আসছে ওদের দিকে।

'রেড!' ডাকল রানা। 'দেখো।'

রেডও তাকাল। চোখ পিটপিট করে বলল, 'মেয়ে মনে হচ্ছে... সুন্দরী মেয়ে।'

'এসব ব্যাপারে তোমার নজর দেখছি দারুণ চোখা!' ঠাট্টা করল রানা।

তবে ভুল বলেনি রেড। সত্যিই একটা মেয়ে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। বাতাসে উড়ছে তার সোনালি চুল। একেবারে কাছে এসে রাশ টানল ঘোড়ার। একটু চমকাল রানা—মেয়েটাকে চিনতে পেরে। গতকাল সন্ধ্যায় সার্কাসের গ্যালারিতে একেই দেখেছিল ও... সবুজ চোখের সেই রূপসী!

ঘোড়া থামিয়ে এক লাফে স্যাডল থেকে নামল মেয়েটি, দক্ষ ভঙ্গিতে। বোঝা গেল, পাকা ঘোড়সওয়ার।

'হাই!' হাত নাড়ল মেয়েটি। 'তোমরা কি ঘুরতে এসেছ এদিকে?'

'হ্যাঁ,' ভারিক্কি গলায় বলল রেড। 'সকালের হাওয়া খেতে

বেরিয়েছি। স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।'

'এখন তো দুপুর হয়ে গেছে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রেড। তাড়াতাড়ি বলল, 'ওই হলো আর কী। তাজা হাওয়া তো!'

'তোমাদেরকে আগে কখনও দেখিনি,' পালা করে রানা আর রেডের মুখের দিকে তাকাল মেয়েটি। 'নতুন এসেছ?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'কিথলিতে বেড়াতে এসেছি। আমার নাম রানা... মাসুদ রানা—মিসেস ইসমাত আরার ভাইপো। তাঁকে চেনো?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'হুঁ। তুমি যে আসবে, এ-খবর শুনেছিলাম।'

'আর আমি রানার বন্ধু,' যেচে নিজের পরিচয় দিল রেড। 'রব রাইলি। তবে তুমি আমাকে রেড বলে ডাকতে পারো।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি পেনিলোপি ম্যাকিনটশ, সংক্ষেপে পেনি।' নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি। ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বোলাল। 'এ আমার ঘোড়া—মার্টিনি। তোমরা কি কোথাও যাচ্ছ, নাকি এমনিতেই...'

'না, না,' বলল রানা, 'এমনিতেই ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে এসেছি।'

'ভাল করেছ, জায়গাটা খুব সুন্দর,' বলল পেনি। 'আমি প্রায়ই আসি। এখানে এলে মন ভাল হয়ে যায়। সচরাচর কাউকে দেখা যায় না এদিকে। তাই দূর থেকে তোমাদেরকে দেখে ছুটে এসেছি। বিরক্ত হওনি তো?'

'উঁহুঁ, বিরক্ত হব কেন? আচ্ছা, কখনোই কি কাউকে আসতে দেখোনি এদিকে?'

'খুব কম। মাঝে মধ্যে গরুছাগল হারালে চাষিরা হয়তো খোঁজাখুঁজি করতে আসে, কিংবা কদাচিৎ আসে তোমাদের মত

হাইকাররা।'

'রডনি রাইলির ব্যাপারে কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল রেড। 'ওই যে, যে-ছেলেটা হারিয়ে গেছে?'

'জানব না কেন? এখানকার সবাই জানে।'

'ও আমার চাচাতো ভাই।'

'ও! দুঃখিত। বেচারা হারিয়ে গেল... ঘটনাটা খুব দুঃখজনক।'

'কখনও ওকে এদিকে আসতে দেখেছ?'

'কী জানি!' একটু ভাবল পেনি। 'বেশ কয়েকদিন আগে এখানে রাইডিং করার সময় দূর থেকে একটা ছেলেকে দেখেছি পিঠে ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে। রডনি ছিল কি না বলতে পারব না, চেহারা দেখতে পাইনি। ব্যাপারটা নিয়ে তখন মাথাও ঘামাইনি। রডনি নিখোঁজ হবার আগের ঘটনা সেটা।'

'কাউকে বলোনি ব্যাপারটা?'

'এখানকার লর্ডকে বলেছিলাম।'

'লর্ড গ্রিফিন?' নিশ্চিত হতে চাইল রানা।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল পেনি। 'এদিকেই পেয়েছিলাম তাঁকে—সঙ্গে কিছু লোক নিয়ে পাহাড়ে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। মনে হলো রডনিকেই খুঁজছেন, তাই এগিয়ে গিয়ে সেদিনের ঘটনাটা বলেছিলাম তাঁকে। ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, পুলিশে জানাবেন খবরটা।'

'জানিয়েছিলেন?'

'তা জানি না,' শ্রাগ করল পেনি। 'থাক গে, এবার আমাকে যেতে হয়। পরে আবার দেখা হবে, কেমন?' ঘোড়ার দিকে ঘুরতে গিয়ে থেমে গেল ও। রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'তোমার বন্ধুকে কাহিল দেখাচ্ছে। খেয়াল রেখো ওর দিকে।'

স্টিরাপে পা গুঁজে এক লাফে স্যাডলে উঠে বসল মেয়েটা,

লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল, তারপর গোড়ালির গুঁতো দিল ওটার পেটে। হ্রেষাধ্বনি ছাড়ল মার্টিনি, খুরের আওয়াজ তুলে ছুট লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। বাতাসে ফের উড়ল পেনির সোনালি চুল। একটু পরেই দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়া ও তার সওয়ারী।

শিস দিয়ে উঠল রেড। 'দারুণ মেয়ে। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস।'

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে ফিরল রানা। 'মানে?'

'কী সুন্দরী, দেখলে না? কী মনে হয় তোমার? আমাকে পছন্দ করেছে?'

'সেটা আমি কী করে বলব? ওকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে!'

'এসব বুঝে নিতে হয়,' বলল রেড, 'আর বুঝতে হলে চোখ থাকা চাই। আমার দিকে কীভাবে তাকাচ্ছিল, সেটা খেয়াল করোনি বোধহয়?'

'মাথাটা গেছে তোমার,' বলল রানা। 'চলো, যাওয়া যাক।'

নড়ল না রেড। দু'চোখ স্বপ্নালু হয়ে উঠেছে তার, ভাসছে কল্পনার সাগরে।

'কী হলো? চলো!' ধমকে উঠল রানা।

হাঁটতে শুরু করল রেড। তবে এবার আর হাঁপাচ্ছে না, অভিযোগও করছে না পরিশ্রমের জন্য; যেন হাওয়ায় ভেসে এগোচ্ছে। অনবরত কথা বলছে সদ্য পরিচয় হওয়া মেয়েটিকে নিয়ে।

'ওর পা দেখেছ? কী সুন্দর... লম্বা পা! চোখদুটোও অপূর্ব। অমন সবুজ চোখ আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি...'

পরের বিশ মিনিট এভাবেই কাটল। এর মাঝে পাহাড় পেরুল ওরা, অতিক্রম করল *আম বালা জিইল* নামের গিরিপথ, দেখা পেল সিলভারব্যাক লেক আর তার মাঝে মাথা তুলে

দাঁড়ানোগ্রিফিন কাসলের।

উঁচু দুর্গ, ধূসর রঙের গ্র্যানিট পাথরে গড়া। দু'ভাগে বিভক্ত ওটা, দেখে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো ব্লকের মত লাগল। তুলনামূলকভাবে উঁচু ব্লকটার ঢালু ছাতের চারকোণে ট রেট দেখা গেল, এককালে কামান বসানো হতো ওখানে, এখন অবশ্য নেই। টাওয়ারও নেই কোনও। দেয়ালগুলো মসৃণ, সমান; অল্প কিছু জানালা আছে কেবল। সব মিলিয়ে শীতল, প্রাণহীন দেখাল দুর্গটাকে।

ছোট্ট একটা দ্বীপের মাঝে বানানো হয়েছে দুর্গ, ডাঙার সঙ্গে দ্বীপটা যুক্ত হয়েছে সরু একটা কজওয়ে দিয়ে। কজওয়ের মাথায় নতুন কয়েকটা বিল্ডিং দেখা গেল; আর আছে প্রাচীন একটা পাইন গাছ—বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছে পানির ওপর, যেন যে-কোনও মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর রেড, সেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লর্ড গ্রিফিনের তৈরি করা কাঁটাতারের ফেন্স। পুরো লেককে ঘিরে রেখেছে ওটা; ঘিরে রেখেছে দুর্গে যাবার রাস্তাকেও।

একটু অপেক্ষা করে লেকের দিকে রওনা হলো দু'বন্ধু। কিন্তু যত এগোল, ততই অস্বস্তি হতে থাকল রানার। হঠাৎ করে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য, নেমে এসেছে গাঢ় ছায়া। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে কোত্থেকে যেন, গা কাঁপছে। লেকের চারপাশের পাহাড়গুলো যেন গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, চেপে ধরতে চাইছে। রানার মনে হলো, আড়াল থেকে কেউ তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, যদিও তেমন কোনও আলামত পেল না। তারপরেও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল—কেন, বলতে পারবে না। এখানে এসে ওরা কোনও অপরাধ তো করেনি!

ফেন্সের পাশে পৌঁছুল দু'জনে। দূর থেকে যতটা মনে

হয়েছিল, তারচেয়েও উঁচু বেড়াটা।

রেড বলল, 'এ-বেড়া টপকানো আমার কম্মো না। রডনিও এত কষ্ট করে মাছ ধরতে যাবে বলে মনে হয় না।'

'মৎস্যশিকারিদের ব্যাপারে কিছুই জানো না তুমি,' রানা বলল। 'মাছ ধরা ওদের নেশা। তার জন্য এ-রকম দু-চারটে বেড়া টপকাতে দ্বিধা করবে না।'

'বুঝলাম। কিন্তু...'

'এসো, একটু ঘুরে দেখি। বেড়ার মাঝে ফাঁকফোকর থাকতে পারে। তা হলে আর ওপাশে যাবার জন্য টপকাতে হয় না।'

ফেন্সের পা ঘেঁষে ধরে হাঁটতে থাকলদু'জনে। একটু পরেই পৌঁছে গেল সাইনবোর্ড লাগানো একটা জায়গায়, যেখানে কাঁটাতারের সঙ্গে বেশ কিছু মৃত প্রাণীর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

'বাহ্!' চেহারায় তিক্ততা ফুটিয়ে বলল রেড। 'অতিথিদের জন্য দেখছি খাবারের আয়োজন করে রাখা হয়েছে। ট্রাই করে দেখতে চাও?'

'মাফ চাই,' রানা বলল। 'স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসেছি, আর কিছুর দরকার নেই।'

সাইনবোর্ড পড়ল রেড, 'প্রবেশ নিষেধ... ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তি... অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করা হবে!' রানার দিকে তাকাল। 'কঠিন সতর্কবাণী। বোঝা যাচ্ছে, বাইরের লোকের আনাগোনা পছন্দ করে না। চলে যাবে নাকি? ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না আমার কাছে।'

রানা তখন নিচু হয়ে মাটি পরীক্ষা করছে। রেডের কথা কানে না তুলে বলল, 'দেখে যাও। তাজা মাটি।'

'তাতে কী হয়েছে?' এগিয়ে এল রেড।

'ফেন্সের এপাশ-ওপাশ... দু'পাশেই দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কেউ মাটি খুঁড়েছিল ফেন্সের তলা দিয়ে ওপাশে যাবার জন্য,

পরে আবার ভরে দিয়েছে গর্তটা।'

'শেয়ালের কাণ্ড হতে পারে,' রেড অনুমান করল। 'শেয়াল এভাবে গর্ত খোঁড়ে বলে শুনেছি।'

'মুরগি চুরি করার জন্য,' রানা যোগ করল। 'এখানে কোনও মুরগি নেই। তা ছাড়া...'

'চুপ!' ওর কথা শেষ হবার আগেই চাপা গলায় বলে উঠল রেড। বন্ধুকে টান দিয়ে নিয়ে এল একটা ঝোপের আড়ালে।

'কী হয়েছে?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল রানা।

'একদম নোড়ো না,' বলল রেড। 'কে যেন আসছে ওদিক থেকে!'

তেরো

ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে রইল রানা, পাতার ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করল কে আসছে। কেউ কি অনুসরণ করছে ওদেরকে? নাকি লর্ড গ্রিফিনের এস্টেটের কোনও পাহারাদার? একটু পরেই মানুষটার পা দেখতে পেল। চিনতেও পারল তাকে। গতকাল সন্ধ্যার সেই মোটা লোকটা, বেমানান বেশভূষা নিয়ে যে বসে ছিল সার্কাসের তাঁবুতে। পরনে এখনও গত সন্ধ্যার সেই পোশাক। অবাক হলো রানা, এ-লোক কী করছে এখানে?

পাতা সরিয়ে ভালমত লোকটাকে লক্ষ করল ও। ঝোপের ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছে সে, পরিশ্রমে মৃদু হাঁপাচ্ছে। মোটা মানুষ,

অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। রুমাল বের করে মুখ আর ঘাড় মুছল। তা দিল পাকানো গোঁফে। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে থাকল আশপাশ। কিছু খুঁজছে... কিন্তু কী? ওদেরকেই নয়তো?

ভয় লাগছে না রানার, বরং হাসি পাচ্ছে। সার্কাসের দর্শক গ্রামবাসীদের মাঝে যতটা বেমানান লাগছিল তাকে, এখন লাগছে তারচেয়েও বেশি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শহুরে লোক... গ্রামগঞ্জের কিছুই জানে না। পাহাড়ঘেরা লেকের কিনারের চাইতে তাকে লণ্ডনের অভিজাত কোনও হোটেল বা পার্কে বেশি মানাবে। অবশ্য ঠিক ব্রিটিশ বলেও মনে হচ্ছে না তাকে। আইরিশ? উঁহুঁ, আমেরিকানও হতে পারে।

এক হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসল লোকটা, কী যেন দেখল, তারপর উঠে দাঁড়াল ফের। টুপি খুলে মাথার টাক চুলকাল, হাই তুলল বড় করে, এরপর হেলেদুলে চলে গেল সাইনবোর্ডের সামনে। সময় নিয়ে পড়ল সেটা।

না, এস্টেটের পাহারাদার হতে পারে না... ভাবল রানা। কিন্তু কে সে? এখানেই বা এসেছে কেন?

আবারও হাই তুলল লোকটা, ঘাড় ফিরিয়ে ঝোপের দিকে তাকাল এক পলক, তারপর সোজা করল মাথা। অন্যদিকে তাকিয়েই বলল, 'এবার বেরিয়ে আসতে পারো। আমি জানি তোমরা ওখানেই লুকিয়ে আছ।'

এক মুহূর্তের জন্য থমকাল রেড, পরক্ষণে চেঁচাল, 'সাহস থাকে তো নিজেই এসো। দেখো কী হাল করি তোমার।'

'আহ্, খামোকা উত্তেজিত হচ্ছ। আমি তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি।' গলাটা রুক্ষ, উচ্চারণে আমেরিকান টান স্পষ্ট।

'সাবধান! আমাদের সঙ্গে ছুরি আছে!' হুমকির সুরে বলল রেড। ছোট একটা পকেটনাইফ বের করে হাতে নিল।

'আর আমার আছে একটা ভয়ঙ্কর পোষা কুকুর।'

'কোথায়?'

'বাড়িতে রেখে এসেছি।'

'মানে!'

'বাজে কথায় তুমি যেমন সময় নষ্ট করছ, আমিও করলাম। এবার বেরিয়ে এসো। ছুরি-টুরির প্রয়োজন হবে না তোমাদের, কথা দিচ্ছি।' পকেট থেকে একটা সিগার বের করল লোকটা, দাঁত দিয়ে কামড়ে গোড়া ছিঁড়ল, তারপর আগুন ধরিয়ে টানতে থাকল আপনমনে।

'কী করবে?' ফিসফিসিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল রেড।

'লুকিয়ে থেকে লাভ নেই, চলো, দেখি কথা বলে,' রানা বলল।

মাথা ঝাঁকাল রেড। দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপের পিছন থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। 'আগেই আন্দাজ করেছিলাম, তোমরা ছাড়া কেউ না। পাহাড়ের মাথা থেকে দেখতে পেয়েছিলাম তোমাদের। এখানে আসবে ভাবিনি, তাই এগিয়ে গিয়ে আর কথাও বলিনি। এনিওয়ে, পরিচয়টা এখন সেরে নেয়া যেতে পারে, কী বলো?' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

রেড সাড়া দিল না, কিন্তু রানা এগিয়ে গিয়ে হাত মেলাল। একই সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখল লোকটাকে। বোঁচা নাক তার... জন্মগত নয়, ঘুষি খেয়ে থেবড়ে গিয়েছিল কোনোকালে। গালের একপাশে একটা কাটা দাগ। একটা চোখ লাল, আঘাত পেয়ে চোখের সূক্ষ্ম রক্তনালী ফেটে গেলে ঘটে এমনটা... সারে না কোনোদিন। বোঝা যাচ্ছে, এককালে প্রচুর লড়াই করেছে সে। কিন্তু এখনকার শরীরের দিকে তাকালে সেটা বোঝার উপায় নেই—অযত্নে-অবহেলায় থলথলে হয়ে গেছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ। লোকটা অ্যালকোহলিক। রুমাল দিয়ে বার বার মুছছে মুখ

আর ঘাড়।

'আমি কোবি জোন্স,' নিজের পরিচয় দিল লোকটা। 'লোকে বলে, *হ্যামার জোন্স*। কেন? একসময় বক্সিং করতাম বলে। হাতুড়ির মত চলত আমার হাতদুটো।'

রানা আর রেডও নিজেদের নাম বলল।

'নাইস টু মিট ইউ,' বলল হ্যামার। মুখ দিয়ে ভক ভক করে ছাড়ল এক রাশ ধোঁয়া। 'তো যা বলছিলাম... তোমরা এখানে আসবে ভাবিনি। কিন্তু খানিক আগে ট্র্যাক দেখতে পেয়ে ধারণা পাল্টাল। তাই খুঁজে বের করলাম তোমাদেরকে।'

'কোথায় ট্র্যাক?'

'পুরোদস্তুর ট্র্যাক বলা যাবে না, পায়ের ছাপ পেয়েছি একটা। এসো দেখাই।'

রানা আর রেডকে বেড়া থেকে কিছুদূর নিয়ে গেল হ্যামার জোন্স, মাটির দিকে ইশারা করল। ছোট আকারের একটা পায়ের ছাপ ফুটে আছে ওখানে।

'এই যে,' গর্বের সুরে বলল লোকটা। 'কিছুই আমার চোখ এড়ায় না। ভবিষ্যতে সাবধানে থেকো, ছাপ ফেলে যেয়ো না কোথাও।'

চোখ পিটপিট করল রানা। এক্সপার্ট নয় ও, তারপরেও বুঝতে পারছে, ছাপটায় গড়বড় আছে। এক মুহূর্ত লাগল সমস্যাটা ধরতে। ছাপটা শুকনো, চারপাশের মাটি শক্ত হয়ে গেছে। তারমানে ওটা তাজা নয়, অন্তত কয়েকদিনের পুরনো। মাটি যখন ভেজা ছিল, তখন কেউ পা ফেলেছিল এখানটায়। তা ছাড়া ওর গামবুট বা রেডের চামড়ার বুটের আকৃতির সঙ্গেও মেলে না ছাপটা।

হ্যামার ততক্ষণে বেড়ার কাছে ফিরে গেছে। তারকাঁটার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে হ্রদের দিকে।

'জায়গাটা খুব নির্জন, তাই না?' বলল সে। 'কী করছ তোমরা এখানে?'

'কিছু না। হাঁটতে এসেছি,' বলল রানা। রেডকে ইশারা করে দেখাতে চাইল পায়ের ছাপের অসঙ্গতি, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

হ্যামার নড়ছে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হ্রদের দিকে।

ফিসফিসিয়ে রেডের উদ্দেশে রানা বলল, 'ভাল করে দেখো, ছাপটা আমাদের কারও নয়।'

এবার বুঝল রেড। ছাপের উপর রাখল নিজের এক পা, আকার মিলল না। 'আরে, তাই তো!' বিস্মিত গলায় বলে উঠল সে।

ঘুরে দাঁড়াল হ্যামার। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ঝোপের ভিতরে লুকিয়েছিলে কেন?'

'আপনাকে আসতে দেখে,' রানা জানাল।

'আমাকে দেখে লুকাতে হবে কেন?'

'আপনাকে এখানকার পাহারাদার ভেবেছিলাম। সাইনবোর্ডটা দেখেছেন? আর ঝোলানো মরা জানোয়ারগুলো? ভয় পাওয়াই কি স্বাভাবিক নয়?'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করল হ্যামার। 'ব্যাপারটা সত্যি খুব অদ্ভুত। এখানে বেড়ার কী দরকার? আশপাশে কোনও জনবসতি নেই, এখান দিয়ে কেউ চলাফেরাও করে না। বেড়া দিয়ে কার কাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে জায়গাটা?'

'যিনি করেছেন, তিনিই বলতে পারবেন।'

আচমকা হেসে উঠল হ্যামার, চাপড় মারল রানার পিঠে... এত জোরে, আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ত ও। হাসতে হাসতেই লোকটা বলল, 'নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে তোমাদের? জানতে ইচ্ছে করছে না, আমি এখানে কেন ঘুর ঘুর

করছি?’

‘তা তো করছেই,’ রেড বলল। ‘আপনাকে স্থানীয় কেউ বলে মনে হচ্ছে না।’

‘ঠিক ধরেছ,’ সিগারে বড় করে টান দিল হ্যামার। ‘আমি নিউ ইয়র্কের মানুষ। ব্রঙ্কসে জন্ম, বড়ও হয়েছি ওখানে। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষেরা আইরিশ ছিলেন।’

‘তাই নাকি?’ খুশি খুশি গলায় বলল রেড। ‘আমিও আইরিশ। গ্যালওয়ে-তে আমাদের বাড়ি।’

বিনা নোটিশে ওকে জড়িয়ে ধরল হ্যামার। ‘তুমি তো আমার দেশি ভাই, হে! আমার দাদু শ্যাননে থাকতেন।’

আলিঙ্গনের ভিতরে হাঁসফাঁস করে উঠল রেড। ‘জেনে খুশি হলাম, স্যর। এবার আমাকে ছাড়ুন!’

ওকে ছেড়ে দিল হ্যামার। পকেট থেকে একটা বিয়ারের বোতল বের করে বলল, ‘এই আনন্দে দু’ঢোক হয়ে যাবে নাকি?’

রেড সায় দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল রানার চোখ রাঙানো দেখে। দমে যাওয়া গলায় বলল, ‘না, ধন্যবাদ। আপনিই খান।’

‘ভাল ছেলে,’ মন্তব্য করল হ্যামার। ‘এ-বয়সে বিয়ার-টিয়ার না খাওয়াই ভাল।’ মুখ খুলে বোতলের পুরোটাই এক ধাক্কায় সাবাড় করে দিল সে। ‘আহ্, কী শান্তি!’

‘এবার বলুন তো, আপনি এখানে কী করছেন,’ বলল রেড।

একটা হেঁচকি তুলল হ্যামার। বলল, ‘বলা উচিত না, কিন্তু দেশি ভাইয়ের কাছে কী আর লুকাব? তুমি আমার ক্ষতি করবে বলেও মনে হয় না। বেশ, তা হলে শোনো। আমি একজন ডিটেকটিভ—নিউ ইয়র্কের একটা এজেন্সিতে কাজ করি। এখানে এসেছি একটা কেসের তদন্তে।’

‘কী কেস?’ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল রানা।

একটু দ্বিধা করল হ্যামার। 'তোমরা কাউকে বলে দেবে না তো? আসলে ব্যাপার হয়েছে কী... যিনি এই বেড়া আর এলাকার মালিক, তাঁর বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছি আমি।'

'লর্ড গ্রিফিন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল হ্যামার। 'নিশ্চয়ই জানো, ভদ্রলোক আগে আমেরিকায় থাকতেন?'

'জানি।'

'এক ভাই ছিল তাঁর—এডগার গ্রিফিন'। শিক্ষিত, সুদর্শন, অত্যন্ত ভদ্র এক যুবক। অনেকদিন থেকে কোনও খোঁজ নেই তার। নিরুদ্দেশ। আমাদের কাছে কেসটা নিয়ে আসেন লর্ড গ্রিফিনের স্ত্রী—লিডিয়া। যদ্দূর জানতে পেরেছি, বিয়ের আগে গ্রিফিনদের দু'ভাই-ই এই ভদ্রমহিলার পাণিপ্রার্থী ছিলেন; আর তিনিও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন কাকে বিয়ে করবেন তাই নিয়ে। এডগারকে তিনি একটু বেশি পছন্দ করতেন, কিন্তু রেজিনাল্ডের চাপাচাপিতে তাঁকেই বিয়ে করেন। বিয়ের পর এডগারের সঙ্গে মেলামেশাও করেননি আর। সমস্যা হলো, রেজিনাল্ড সবসময় সন্দেহের চোখে দেখতেন দু'জনকে... ঈর্ষা করতেন। তাঁদের ঘরে এক সন্তানের জন্ম হবার পরেও কমেনি রেজিনাল্ডের সন্দেহ। দিনে দিনে অসহনীয় হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তারই এক পর্যায়ে উধাও হয়ে যায় এডগার। ব্যাপারটা নিয়ে লিডিয়া নাড়াচাড়া শুরু করতেই খেপে যান রেজিনাল্ড। অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যে অভিযোগ তুলে ডিভোর্স দেন স্ত্রীকে। তারপর নিজের ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছেন স্কটল্যাণ্ডে। এখানকার লর্ড উপাধি কিনে নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছেন ওই দুর্গে।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি ভাইসহই দুর্গে উঠেছিলেন লর্ড গ্রিফিন,' রানা প্রতিবাদ করল। 'এখানে আসার কিছুদিন পর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এডগার।'

ঠোঁটের এক কোণ বেঁকে গেল হ্যামারের। 'মজার ব্যাপার কি, জানো? এডগার গ্রিফিনকে এখানকার কেউ কোনোদিন দেখেনি। কোন্ দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে, কিংবা কোথায় তাকে কবর দেয়া হয়েছে—কেউ জানে না। জানার চেষ্টাও করেনি। লর্ডদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গ্রামবাসীরা কখনও ঘাঁটাঘাঁটি করে না।'

'তা হলে?'

'পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়। আমেরিকায় জমজমাট ব্যবসা ছিল লর্ড গ্রিফিনের। সেসব ছেড়ে কেন তিনি এই দুর্গম, নির্জন এলাকায় এসে ঘাঁটি গাড়লেন, তার কোনও সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জানা যাচ্ছে নাতাঁর ভাইয়েরই বা কী হলো?'

'আপনার কী ধারণা?'

'আন্দাজে কিছু বলা ঠিক না। হতে পারে মিসেস গ্রিফিন আর এডগারের মধ্যে গোপন প্রণয় ছিল, খেপে গিয়ে ভাইকে খুন করেছেন রেজিনাল্ড, তারপর পালিয়ে এসেছেন স্কটল্যাণ্ডে... ধরা পড়ে যাবার ভয়ে। আবার এমনও হতে পারে, কোনও এক্সপেরিমেন্টে মারাত্মক গড়বড় করে ফেলেছেন তিনি...'

'কীসের এক্সপেরিমেন্ট?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'আমি তো জানতাম ভদ্রলোক অস্ত্র তৈরি করেন।'

'শুধু তৈরি না,' বলল হ্যামার, 'নিত্যনতুন টেকনোলজিও আবিষ্কার করেন রেজিনাল্ড, যাতে সবচেয়ে আধুনিক... সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিক্রি করতে পারেন তিনি। তার জন্য এক্সপেরিমেন্ট তো করতেই হয়।'

'কী বানাচ্ছেন তিনি?' কৌতূহল প্রকাশ করল রেড। 'নতুন ধরনের কোনও বোমা?'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যামার। 'বোমা, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন... কে বলতে পারে? অদৃশ্য বিমান আবিষ্কার করে বসলেও অবাক হব

না, লোকটা প্রতিভাবান।' তিক্ত হাসি হাসল। 'যা-ই আবিষ্কার করুক, জেনে রেখো, সেটা মানুষ মারার অভিনব কোনও হাতিয়ারই হবে।'

সদ্য পাওয়া তথ্যগুলো মাথায় নাড়াচাড়া করছে রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়, লর্ড গ্রিফিন তাঁর গোমর লুকানোর জন্য কাউকে খুন করতে পারেন?'

পুরু গোঁফে আঙুল বোলাল হ্যামার। 'ভাল প্রশ্ন,' একটু বিরতি নিয়ে বলল সে। 'সহজ জবাব হলো, আমার জানা নেই। তবে লোকটা যদি সত্যিই তার ভাইকে খুন করে থাকে, আরও করতে অসুবিধে কী? তা ছাড়া তাকে ঘিরে অ্যাকসিডেন্টের গুজব আছে, আগেও তার ক'জন কর্মচারী নিখোঁজ হয়েছে; যদিও তার সঙ্গে রেজিনাল্ডের সম্পর্ক খুঁজে পায়নি কেউ। মিসেস লিডিয়ার দাবি, রেজিনাল্ড তাঁকেও একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য ক্ষিপ্ত একজন স্ত্রীর কথা কতটুকু বিশ্বাস করা যায়, সেটাও প্রশ্ন। তবে এখন পর্যন্ত নিরেট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে রেজিনাল্ড কাউকে কখনও খুন করেছেন।'

'রডনি রাইলি নামে একটা ছেলের কথা শুনেছেন?' জানতে চাইল রানা। সেই সঙ্গে খুলে বলল ওর আর রেডের সিলভারব্যাক লেক দেখতে আসার পিছনে আসল কারণ।

পালা করে ওদের দু'জনকে দেখল আমেরিকান ডিটেকটিভ। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'হুম, তা হলে এজন্যেই এখানে তোমাদের আগমন? গোয়েন্দা সাজতে চাইছ?'

'গোয়েন্দাগিরি না,' বলল রানা, 'তবে আমরা একটা সূত্র পেয়েছি। আসুন, দেখাচ্ছি।'

হ্যামারকে বেড়ার কাছের সেই তাজা মাটির কাছে নিয়ে গেল ওরা। ওদের সন্দেহের কথা জানাল। জায়গাটা ভাল করে দেখল ডিটেকটিভ। তারপর রুমালে মুখ মুছে বলল, 'যদি তোমাদের

সন্দেহ ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে বলতেই হয়—লর্ড গ্রিফিন অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ। ওঁর এলাকায় উঁকি-ঝুঁকি মেরে তোমরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনছ।'

'সে তো আপনিও আনছেন।'

'বিপদ মোকাবেলার প্রস্তুতি আমার আছে।' ট্রাউজারের পা গোটাল হ্যামার। দেখা গেল, তার গোড়ালির ঠিক উপরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা চামড়ার হোলস্টারে একটা ছোট্ট, সাদা হ্যাণ্ডেলের রিভলভার রয়েছে।

'ওটা কি ডেরিঞ্জার?' জিজ্ঞেস করল রেড।

'হ্যাঁ।'

হাসল রেড। 'আমি জানতাম ডেরিঞ্জার মেয়েরা ব্যবহার করে।'

'হেসো না। দেখতে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এই ছোট্ট অস্ত্রটাই বহুবার আমার জীবন বাঁচিয়েছে। যাক গে, আমাকে এবার কাজে নামতে হয়।'

'আমরা সঙ্গে থাকি?' রানা অনুরোধ করল। 'একাকী ঘুরপাক খাওয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গে গেলে কিছু লাভ হতে পারে। বিরক্ত করব না, প্রমিজ!'

ঠোঁট কামড়াল হ্যামার। তারপর বলল, 'বেশ, আসতে পারো... যদি সতর্ক থাকো, আর আমার কথা শোনো। আগেই বলে রাখি, ঝামেলার আভাস দেখলেই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে। তখন কোনও গড়িমসি চলবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তা হলে এসো।'

আশপাশের পুরো এলাকা খুঁটিয়ে তল্লাশি করল হ্যামার, ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে গেল গল্প। গোয়েন্দা পেশার দশ বছরে যত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে, সবই বলল ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে।

ধাওয়া, গোলাগুলি আর হাতাহাতি লড়াইয়ের সেসব কাহিনি শুনে উত্তেজিত হলো দুই কিশোর শ্রোতা। একের পর এক প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত রাখল আমেরিকান ডিটেকটিভকে। তাতে বিরক্ত হলো না হ্যামার, আড্ডাপ্রিয় মানুষ বোঝাই যায়, স্কটল্যাণ্ডের বনে-বাদাড়ে কথা বলবার মত দু'জন সঙ্গী পেয়ে সে মহা খুশি, হোক না তারা বয়সে ছোট।

তল্লাশি শেষ হলে পাহাড়ের ছায়ায় ফেন্সের পাশ ঘুরে দুর্গের দিকে এগোল তিনজনে। একটু পর পৌঁছুল একটা খরস্রোতা ঝরনার পারে। লেক থেকে বেরিয়ে কয়েক মাইল দূরের ব্ল্যাক রিভারে গিয়ে মিশেছে ঝরনাটা। বেশ চওড়া, তবে পার হবার জন্য ছোট একটা সেতু রয়েছে ওর উপরে।

সেতুর মাঝামাঝি পৌঁছে থেমে গেল হ্যামার। গোঁফের দু'প্রান্ত মোচড়াতে মোচড়াতে তাকাল দূরে, যেখানে ঝরনা জলাভূমি স্পর্শ করছে। সিমেন্ট ব্লক, কাঠের রানওয়ে আর নেট দিয়ে অদ্ভুত একটা কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে ওখানে।

'কী ওটা?' বলল সে। 'কিছু বুঝতে পারছ?'

'বাঁধের মত লাগছে,' রেড বলল।

'কিন্তু পানি আটকাচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'হয়তো মাছ আটকাচ্ছে,' রানা অনুমান করল। 'লেকের মাছ নদীতে যেতে দিচ্ছে না।'

'কিংবা নদীর মাছকে লেকে আসতে,' গম্ভীর গলায় বলল হ্যামার। 'যাক গে, মাছ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আরও জরুরি বিষয় আছে।'

আবার হাঁটতে শুরু করল তিনজনে। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা হাঁটার পর পৌঁছুল দুর্গের কাছাকাছি, খুঁজে পেল নজর রাখার জন্য চমৎকার এক জায়গা—তিনদিক ঘেরা, ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় গ্রিফিন কাসল। আশ্রয় নিল সেখানে। বিনকিউলার বের

করল হ্যামার, চোখে ঠেকিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দুর্গটা। নিজের দেখা শেষ হলে রানার হাতে দিল।

'ভাল করে দেখো,' বলল সে। 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু চোখে পড়লে বোলো। আমার চোখ হয়তো এড়িয়ে গেছে সেটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিনকিউলারের আইপিসে চোখ রাখল রানা, ফোকাস সেট করল দুর্গের ছাতে। ওখান থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামল। কজওয়ে ধরে যেতে হয় দুর্গে। ওপাশে বড়সড় একটা পার্কিং এরিয়া আছে। পার্কিং এরিয়ার শেষ প্রান্তে দুর্গের মেইন এণ্ট্র্যান্স, ছোট একটা সেতু পেরোতে হয়। ড্রব্রিজ নয়, পাথর-সিমেন্ট দিয়ে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা সেতু। দুর্গের নিচতলার জানালাগুলোয় গরাদ লাগানো হয়েছে, তবে উপরেরগুলো উন্মুক্ত। গেটহাউসটা পুরনো আমলের, তবে সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে। প্রথম গেট পেরুলে দ্বিতীয় গেট... এটা সম্ভবত আগে ছিল না... নতুন ফেন্সের গায়ে তৈরি করা হয়েছে। একটা সেন্ট্রি বক্স দেখা গেল, ভিতরে হান্টিং রাইফেল নিয়ে একজন প্রহরী বসে আছে। ব্যাপারটা হ্যামারকে জানাল রানা।

'তাই নাকি?' নড়েচড়ে বসল আমেরিকান ডিটেকটিভ। 'দেখিনি তো! কোথায়?'

'গেটহাউসের পাশে দেয়াল খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে, ভালমত না তাকালে দেখা যায় না।'

বিনকিউলার নিয়ে তাকাল হ্যামার। 'আরে, তাই তো! তোমার নজর তোখুব চোখা, রানা!'

'থ্যাঙ্কস।'

বিনকিউলার ফিরিয়ে দিল হ্যামার। 'দেখো, আর কিছু মিস করে গেছি কি না।'

তাকাল রানা। আর তখুনি খুলে গেল দুর্গের ভারী দরজা। রক্তমাখা ওভারঅল পরা একজন লোক বেরিয়ে এল ভিতর থেকে,

হাতে একটা বড়সড় বালতি। কাকে উদ্দেশ্য করে যেন কথা বলল, কিছু বোঝা গেল না এতদূর থেকে; তারপর সেতুতে উঠে বালতিটা উপুড় করে দিল পানিতে। মনে হলো মাছ-মাংসের উচ্ছিষ্ট ছিল বালতিতে, ওগুলো নিচে আছড়ে পড়তেই পানিতে আলোড়ন উঠল। ধূসর রঙের কতগুলো প্রাণী হুটোপুটি করছে।

'লেকে কী যেন আছে,' রানা বলল। 'খাবার ফেলা হলো ওগুলোর জন্য।'

'যা খুশি ফেলুক,' হ্যামার বলল। 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। চলো, দুর্গের অন্য পাশে গিয়ে কিছু দেখা যায় কি না দেখি।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল রানা। 'আরও কেউ বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে।'

দুটো ছায়ামূর্তি বেরুল দুর্গ থেকে। হেঁটে সেতুতে এসে উঠল। লর্ড গ্রিফিন ও তাঁর গুণধর পুত্র ড্যানি। দু'জনের হাতেই রাইফেল—একই ভঙ্গিমায় কনুইয়ের ভাঁজে আটকে রেখেছে। ক্রুদ্ধ দেখাল লর্ড গ্রিফিনকে, কড়া গলায় কী যেন বলছেন; বাপের বকাবকির মুখে নার্ভাস হয়ে আছে ড্যানি। থামল দু'জনে। পরমুহূর্তে রেগেমেগে ছেলের মাথার পিছনে চাঁটি মারলেন লর্ড, ড্যানির টুপি উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। সেটা তুলবার জন্য নিচু হতেই লাথি খেল পাছায়। বেচারা মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন লর্ড, তারপর গটমট করে হাঁটতে শুরু করলেন আবার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ড্যানি। গা থেকে ধুলো ঝাড়ল, মাথায় দিল টুপি, এরপর রাইফেল তুলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে পিছু নিল পিতার।

সেতু থেকে নামতেই তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাত হলো বাপ-ছেলের, গেটহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। অদ্ভুত এক লোক—বেঁটেখাট, কুঁজো... হাতদুটো এমনভাবে সামনে

ঝুলিয়ে রেখেছে যেন সে একটা বানর। নাকটা লম্বা, পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো। মাথায় দিয়েছে পুরনো এক বোউলার হ্যাট। ফ্যাকাসে চামড়া, অসংখ্য ভাঁজে ভরা, বয়স আন্দাজ করা কঠিন। চারটে টেরিয়ার কুকুর রয়েছে তার সঙ্গে, প্রতিটার চেহারা ভয়ঙ্কর... খুনে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে বলে ধমকে উঠল সে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলো পায়ের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে কুঁই কুঁই করে উঠল।

লর্ড গ্রিফিনের সামনে গিয়ে কুর্নিশের ভঙ্গিতে সালাম ঠুকল লোকটা। সসম্ভ্রমে মনিবের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে নিল। সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকে কিছু বললেন লর্ড গ্রিফিন, তারপর হনহন করে হেঁটে ঢুকে গেলেন গেটহাউসে। তাঁকে অনুসরণ করল ড্যানি আর বানর-মানব।

হ্যামার আর রেডের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল রানা, তিনজনে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। পাহাড়ের কিনার ধরে এগোতে শুরু করল, অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে দুর্গের অন্যপাশে যাবার ইচ্ছে। একটু পরেই দেখা পেল কাঁচা রাস্তার, গাড়ির চাকার গভীর দাগ তার গায়ে; এই রাস্তাটাই কিথলি থেকে দুর্গ পর্যন্ত এসেছে। এক ছুটে রাস্তা পেরুল ওরা, চলে এল আরেক পাশে আর তখুনি শোনা গেল ইঞ্জিনের গর্জন তাড়াতাড়ি একটা বড় পাথরের পিছনে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। কয়েক মুহূর্ত পর একটা বড় ট্রাক বেরিয়ে এল দুর্গ থেকে, ঝাঁকি খেতে খেতে চলে গেল কিথলির দিকে।

'আরেকটু হলেই দেখে ফেলত,' হাঁপ ছেড়ে বলল রেড।

'হুঁ। সাবধানে এগোতে হবে,' হ্যামার বলল।

আবার শুরু হলো পথচলা। দুর্গের অন্যপাশটায় পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আরেকটু ওপরে উঠল ওরা। উঁচু জায়গা থেকে ভিতরটা ভালমত দেখা যাবে। পাহাড়ি

একটা চাতাল খুঁজে নিয়ে তাতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিনজনে।

দুর্গের পিছনের কম্পাউণ্ডের অংশবিশেষ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দ্বীপের মধ্যে নয় ওটা, বাইরে। কম্পাউণ্ড আর দুর্গের মাঝখানে লেকের পানি, সেতু দিয়ে পেরুতে হয়। কাঁটাতারের বেড়ার পিছনে দ্বিতীয় আরেকটা ফেন্স খাড়া করা হয়েছে কম্পাউণ্ডকে ঘিরে—বারো ফুট উঁচু, কাঠের তৈরি, ডগায় লাগানো হয়েছে ইস্পাতের অসংখ্য ধারালো ফলা, যাতে কেউ টপকাতে না পারে। ফেন্সের গায়ে গেট আছে, আর আছে কাঠ দিয়ে বানানো একটা মেকশিফট গার্ডহাউস, সেই সঙ্গে উঁচু এক টাওয়ার—সেখানে পাহারায় রয়েছে দু'জন অস্ত্রধারী লোক, সিগারেট ফুঁকছে।

'দুর্গ, না জেলখানা?' বিস্মিত গলায় বলে উঠল রেড। 'পাহারার নমুনা দেখেছ?'

রানা কিছু বলল না, ওর চোখ চলে গেছে পাহাড়ের ছায়ায় সরু এক চিলতে জমির উপর। ঘাস ছেঁটে রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে ওখানে, এক প্রান্তে নিথর দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা দু-ইঞ্জিনের বিমান।

হ্যামারও দেখেছে। শিস দিয়ে বলল, 'আরে, বাবা! বিমানও আছে দেখছি। কিন্তু বেড়ার ওপারে কী, দেখা দরকার।'

পাহাড়ি চাতালের একপাশে একটা রোয়ান গাছ আছে, সেটায় চড়বার চেষ্টা করল সে। কিন্তু বেশিদূর উঠতে পারল না। মোটা মানুষ, গাছে চড়বার অভ্যেস নেই। রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পারবে?'

যেন মাছকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে—সাঁতার কাটতে পারে কি না। একসময় প্রতিবেশীর গাছে উঠে আম-জাম চুরি করা ছিল রানার নিত্যদিনের কাজ। সে-স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় মুচকি হাসল ও। বলল, 'পারব।'

'তা হলে ওঠো।' ওর গলায় বিনকিউলার ঝুলিয়ে দিল হ্যামার।

তরতর করে মগডালে উঠে গেল রানা। বিনকিউলার তুলে উঁকি দিল দ্বিতীয় ফেন্সের ওপাশে। এক লাফে দুর্গের মূল কম্পাউণ্ড চলে এল চোখের সামনে। কুৎসিতদর্শন কয়েকটা কংক্রিটের বিল্ডিং দেখতে পেল ও। পুরনো আমলের কিছু পাথুরে কাঠামোর চারদিকে সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে ওগুলো। নুড়ি-বিছানো একটা আঙিনা আছে, তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটা থেকে চলছে আনলোডিং।

'কী আনলোড করছে?' রানার মুখে বর্ণনা শুনে জানতে চাইল হ্যামার।

'পশুপাখির খাবার মনে হয়।'

'পশুপাখির খাবার!'

'হ্যাঁ। খোঁয়াড়ের মত দেয়ালঘেরা একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি। জীবজন্তু রাখার জন্য ওটার পিছনদিকে ছাউনিও আছে।'

'আর কিছু?'

ভাল করে তাকাল রানা। ছোটখাট এক সেনা-ঘাঁটির মত লাগছে জায়গাটা। ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে লোকজন, সবার পরনে টুইডের ইউনিফর্ম, কোমরে বা কাঁধে ঝুলছে আগ্নেয়াস্ত্র। কদাচিৎ চোখে পড়ছে সাদা ওভারঅল আর রাবারের বুট পরা দু-একজন মানুষ—এক বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আরেক বিল্ডিঙে ঢুকছে তারা।

'বিল্ডিংগুলো কীসের, কিছু বুঝতে পারছ?' দ্বিতীয় দফা রিপোর্ট শুনে জানতে চাইল হ্যামার।

'দুটো বিল্ডিঙে ডরমিটরি—থাকার জায়গা।' জানালা দিয়ে খাট দেখতে পাচ্ছে রানা। 'একটা হলো গার্ডহাউস। আর দুর্গের কাছাকাছি বড় বিল্ডিংগুলো সম্ভবত ফ্যাক্টরি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তবে ওগুলোর আকার দেখে মনে হচ্ছে না ভেতরে ট্যাঙ্ক

বা বিমান বানানো সম্ভব।'

'ঠিক আছে, নেমে এসো।'

যেভাবে উঠেছিল, সেভাবেই ঝটপট নেমে এল রানা।

হ্যামার প্রশংসার সুরে বলল, 'তুমি দেখছি গাছে চড়ার ওস্তাদ! আমি একদমই পারি না। আসলে... আমি শহরের মানুষ। যানজটে ভরা রাস্তা আর মানুষের ভিড়ে অভ্যস্ত। এখানকার পরিবেশে একটু অসুবিধেই অনুভব করছি; গ্রামাঞ্চলে কখনও কোনও তদন্ত করিনি কিনা! শহরে সাক্ষীর অভাব হয় না, কিন্তু এখানে সাক্ষী বলতে স্রেফ পশুপাখি... ওদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। স্থানীয় লোকজন তো আমার সঙ্গে কথাই বলে না। কিথলি এলাকায় প্রচুর দান-খয়রাত করেন লর্ড গ্রিফিন, গ্রামবাসীর চোখে তিনি মহাপুরুষ। এমন লোকের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে রাজি নয়।'

আকাশের দিকে তাকাল রানা। বেলা পড়ে এসেছে। সাঁঝ নামার আগে বাড়ি ফিরতে চাইলে এখুনি রওনা হওয়া দরকার। কথাটা হ্যামারকে জানাল ও।

'বেশ, যাও,' বলল আমেরিকান ডিটেকটিভ। 'সাবধানে যেয়ো।'

'আপনি কী করবেন?' রেড জিজ্ঞেস করল।

'আমি এখান থেকে নড়ছি না। ক্যাম্প করে নজর রাখব দুর্গের ওপর। দেখি, গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করা যায় কি না।'

'আমাদের কোনও সাহায্য চান?'

'পারলে গ্রামে একটু খোঁজখবর নিয়ো। তোমরা ছোট মানুষ, লর্ড গ্রিফিনের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কেউ কিছু মনে করবে না। মুখ ফসকে কিছু বলেও ফেলতে পারে। তবে হ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে কিছু করতে যেয়ো না। বিপদ-আপদ মোকাবেলা করা আমার পেশা, তোমাদের নয়—বুঝতে পেরেছ?'

বিদায় নিয়ে কিথলির পথ ধরল রানা আর রেড। হাঁটতে হাঁটতে একটু দুশ্চিন্তা অনুভব করল রানা—বুনো এলাকায় রাত কাটাবার মত প্রস্তুতি নেই হ্যামারের। নেই কোনও তাঁবু বা রসদ। কীভাবে থাকবে? কাঁধ ঝাঁকাল খানিক পর, এ-নিয়ে ভেবে লাভ নেই। পোড়-খাওয়া লোক, এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি সামলাবার অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই।

রেডের দিকে তাকাল রানা। সে আপন চিন্তায় মত্ত। দিনটা খুবই রোমাঞ্চকর ছিল তার জন্য। কল্পনার সাগরে ভেসে গিয়ে ভাবছে গ্রিফিন কাসল আর পেনিলোপি ম্যাকিনটশের কথা। কিন্তু রানা অতটা উচ্ছ্বসিত হতে পারছে না। ওর মনে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে মাটিতে দেখা অচেনা পায়ের ছাপ আর রক্তমাখা কভারঅল পরা লোকটার কীর্তি।

কে ফেলেছে ওই পায়ের ছাপ? রডনি রাইলি? লেকের পানিতেই বা কী ফেলছিল লোকটা? কীসের জন্য?

চোদ্দ

রাজকীয় ভঙ্গিমায় পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে একটা মদ্দা হরিণ—সোজা করে রেখেছে ঘাড়, একটা পা তুলে দিয়েছে ছোট এক বোল্ডারের উপর, পাথরটার শরীর গোলাপি ফুলে ভরা লতা দিয়ে ঢাকা। নিচে সবুজ জমিন। দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবি তোলার জন্য পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়সড় এক লাল হরিণ

ওটা, প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, মাথার দু'পাশে শাখা বিস্তার করেছে ভারী দুটো শিং। অপূর্ব দৃশ্য।

নাক টেনে বাতাস শুঁকল হরিণ, ডাক ছাড়ল একটা, বোধহয় বিপদের গন্ধ পেয়েছে। এরা অত্যন্ত সাবধানী, নাক আর দৃষ্টির তুলনা হয় না। বিপদের আভাস দেখলেই বিদ্যুদ্বেগে ছুট লাগিয়ে মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে যাবে।

হরিণ থেকে বেশ কিছুটা দূরে, সংকীর্ণ এক পাহাড়ি ফাটলে লুকিয়ে আছে তিনজন মানুষ। তাদের গায়ে শিকারির পোশাক। সবার সামনে লর্ড রেজিনাল্ড গ্রিফিন, উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন শুকনো পাতার বিছানায়, চোখে ছোট একটা টেলিস্কোপ লাগিয়ে দেখছেন হরিণটার মতিগতি। তাঁর পাশে, একটু পিছনে রয়েছে ড্যানি, শিকারের সবক নেবার চেষ্টা করছে পিতার কাছ থেকে। দলের তৃতীয় সদস্য, ক্লিণ্ট কালহুন, বসে আছে একটা বড় পাথরের পিছনে। লর্ড গ্রিফিনের খাস অনুচর সে, এস্টেটের পশু ও মৎস্য শিকারের তদারক করে।

মগ বের করে তাতে উইস্কি ঢালছে কালহুন, তার দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করল ড্যানি। লোকটাকে কখনও কিছু খেতে দেখেনি ও, এই উইস্কিই তার তিনবেলার খাবার। মদ খেতে খেতে বিকটদর্শন চেহারা হয়েছে তার, ঝুলে পড়েছে চামড়া, চোখদুটো চিরস্থায়ী রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে।

'দেখতে পাচ্ছ?' ছেলের উদ্দেশে উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফিসফিস করলেন লর্ড গ্রিফিন। হরিণের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটু নড়লেন রক্তচলাচল স্বাভাবিক রাখতে। 'চোদ্দটা মাথা আছে ওর শিঙে। এ কোনও সাধারণ হরিণ নয়... রাজ-হরিণ!'

'খাঁটি কথা বলেছেন,' তোয়াজের সুরে বলল কালহুন। উইস্কির একটা মগ এগিয়ে দিল মনিবের দিকে, আরেকটা দিল

ড্যানিকে। নিজেও নিয়েছে একটা।

পানির মত এক চুমুকে পুরো উইস্কি গলায় চালান করে দিলেন লর্ড গ্রিফিন। ড্যানিও তা-ই করল, কিন্তু মুখ বাঁকাল একই সঙ্গে। বিচ্ছিরি স্বাদ, গলা জ্বলে যায়... কিন্তু না খেয়েও উপায় নেই। শিকারি হতে চাইলে, সত্যিকার পুরুষ হতে চাইলে পিতাকে অনুকরণ করতেই হবে তার।

'ডিসট্যান্স কত?' জানতে চাইলেন লর্ড গ্রিফিন।

'আশি গজ,' না তাকিয়েই বলল কালহুন। নিজের মগে চুমুক দিচ্ছে সে।

'শট নেয়া যাবে?'

'নিলে এখুনি নেয়া ভাল।' ড্যানির হাতে একটা রাইফেল তুলে দিল কালহুন। 'এখন খোলা জায়গায় আছে শিকার, পরে না-ও থাকতে পারে। তা ছাড়া আমরা ফাটলের ভিতরে থাকায় বাতাসে আমাদের গন্ধ যাচ্ছে না ওর দিকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ড্যানির দিকে তাকালেন লর্ড গ্রিফিন। হাসলেন। পুরু গোঁফের নিচে ঝিকিয়ে উঠল দাঁত।

'গুলি করো, ড্যানি,' বললেন তিনি। 'ও তোমার।'

'আ... আমার ভয় করছে, বাবা,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল ড্যানি। 'দূরত্বটা বড্ড বেশি।'

হাসি নিভে গেল লর্ডের মুখ থেকে। চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'পারতেই হবে তোমাকে! পাখি শিকারের দিন শেষ, আজই হরিণ মারবে তুমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাইফেল তুলল ড্যানি। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে ওর। সেই সকালবেলায় হরিণটার পিছু নিয়েছে ওরা, এখন সূর্য ডুবু ডুবু। দুপুরে শুকনো বিস্কুট ছাড়া খাবারও মেলেনি। লেক আর দুর্গ ছেড়ে পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে ওরা। এখানে তাপমাত্রা কম, তার ওপর হালকা বৃষ্টিতে

জামাকাপড় ভিজে অসহনীয় এক অবস্থায় পড়েছে ওরা সবাই।

রাইফেলের সাইটে চোখ রাখল ড্যানি, তাকাল হরিণের দিকে। মাথা নামিয়ে ঘাস খাচ্ছে ওটা। নিরীহ প্রাণীটাকে খুন করতে বাধছে ওর, কিন্তু জানে, না করে পার পাবে না। লর্ড গ্রিফিন একেই সবচেয়ে পুরুষোচিত কাজ বলে মনে করেন। বহুবার ছেলেকে বুঝিয়েছেন তিনি, 'বুঝলে, ড্যানি, আমরা হলাম জংলি মানুষের মত। সভ্য সমাজের বাজে নিয়মকানুনের কথা ভুলে যাও, আমাদের জীবন চলে জঙ্গলের নিয়মে। অর্থাৎ মানুষ বনাম পশু... এ-ই দুনিয়ার রীতি। যদি পশু শিকার করতে শেখো, তা হলে তোমার শত্রুকেও খতম করতে শিখবে। আমরা আসলে জন্মগতভাবে শিকারি। এই শিকারের মাঝ দিয়েই আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুণ অর্জন করতে পারি। শিকার তোমাকে ধৈর্য, শক্তি, মনোযোগ, স্থিরতা আর কিছুর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর দিতে শেখাবে। এ-সবই তোমার প্রয়োজন হবে বাস্তব জীবনে...'

ঘাস খাওয়া থামিয়ে হরিণটা হঠাৎ হাঁটতে শুরু করল। ঢাল ধরে উঠে যাচ্ছে উপরে।

'খুব বেশি নড়ছে,' ড্যানি বলল। 'না থামলে...'

শব্দ করে থুতু ফেলল কালহুন। বলল, 'হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে তো এ-ই হবে! যা করার তাড়াতাড়ি করো, বাছা। ঢাল পেরিয়ে ও পগার পার হবার আগেই।'

খোঁটা মারা কথা শুনে প্রতিক্রিয়া হলো না ড্যানির। জানে, লোকটা পছন্দ করে না ওকে। লর্ড গ্রিফিন ছাড়া কাউকেই পছন্দ করে না সে। মদ্যপ, বদ স্বভাবের লোক সে; পুরনো লর্ড তাকে কড়া শাসনে রাখতেন। কিন্তু গ্রিফিন এসে যথেচ্ছ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন তাকে, করে তুলেছেন নিজের ডান হাত। ফলে দিনে দিনে বেয়াড়াপনা বাড়ছে লোকটার। দেখেও না দেখার ভান করেন লর্ড। এলাকায় তিনি নতুন। জমিজমার বিস্তার ও শিকারের

খোঁজখবর প্রতিনিয়ত রাখবার জন্য পুরনো, অভিজ্ঞ লোক চাই। হোক কালহুন মদ্যপ, তার কাছ থেকে কাজ তো আদায় করতে পারছেন।

'গুলি করো!' হুকুমের সুরে ড্যানিকে বলল কালহুন। 'এক্ষুণি! এটাই শেষ সুযোগ!'

হরিণের সামনের পায়ে নিশানা স্থির করল ড্যানি, দম আটকে সাইট তুলতে শুরু করল উপরে। নিয়মটা জানা আছে ওর—পা থেকে ধীরে ধীরে উপরে ওঠাতে হবে দৃষ্টি... সাইটে দেহটা দেখামাত্র চাপতে হবে ট্রিগার।

নার্ভাস বোধ করছে ও, ঘেমে যাচ্ছে হাতের তালু। ধক ধক করছে বুক। মিস করা যাবে না... মিস করলে ওকে আস্ত রাখবেন না বাবা। সাইটে হরিণের পা আর দেহের সংযোগস্থল দেখতে পেয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলল, যা থাকে কপালে ভেবে টিপে দিল ট্রিগার।

কড়াৎ করে বজ্রপাতের মত আওয়াজ হলো। সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ের গায়ে। কাঁধে রাইফেলের বাটের ধাক্কা খেয়ে অস্ফুট গোঙানি বেরুল ড্যানির মুখ দিয়ে। যখন চোখ খুলল, সামনের ঢালে হরিণটাকে দেখতে পেল না আর।

বুক হিম হয়ে এল ওর। কী হয়েছে? হরিণটা পালায়নি তো?

বাবাকে হাততালি দিতে শুনল। 'ওয়েল ডান, বয়! ওয়েল ডান!'

এবার সাইটে হরিণের প্রাণহীন দেহ দেখতে পেল ড্যানি—লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

'ক্লিন শট!' কালহুনও প্রশংসা করল। 'বাপের ব্যাটা আর কাকে বলে!'

ফাটল থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে তিনজনে এগোল ঘায়েল হওয়া শিকারের দিকে। ওখানে পৌঁছে হরিণের লাশের পাশে হাঁটু

গেড়ে বসলেন লর্ড গ্রিফিন। পরখ করলেন ক্ষতটা।

'একেবারে হৃৎপিণ্ড বরাবর লেগেছে,' সন্তুষ্ট গলায় বললেন তিনি। 'সাবাস!' ক্ষত দিয়ে বেরুনো রক্তে হাত ভেজালেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে মাখিয়ে দিলেন ছেলের মুখে। 'প্রথম রক্ত। আজ তুমি সত্যিকার শিকারি হয়ে উঠলে।'

গা ঘিনঘিন করে উঠল ড্যানির, চটচটে গরম রক্তের স্পর্শে। বাবার ভয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারল না।

হলুদ দাঁত বের করে কালহুন বলল, 'এখন তোমাকে সত্যিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মতন লাগছে।'

ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলছে। এরপর লাশটা নিয়ে যাবে পাহাড়ের গোড়ায়, ঘোড়ার পিঠে তুলবে দুর্গে নেবার জন্য।

এ-সবই ছ'মাস আগের ঘটনা। শিকার করা সেই হরিণের স্টাফ করা মাথা এখন ঝুলছে গ্রিফিন কাসলের ডাইনিং হলে। ওটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি গ্রিফিন, ভাবছে সেই দিনটির কথা। হরিণের প্রাণহীন, শীতল চোখদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎই নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগল ওর, মনে পড়ল মায়ের কথা।

সব এই দুর্গের দোষ। ঘৃণা করে ও এই দুর্গকে, এর দরজা-জানালা আর ভারী দেয়ালগুলোকে। ছায়াঢাকা আবছা অভ্যন্তরের প্রতিটি ইঞ্চি এখন অসহ্য লাগে ওর। শুরুতে এমন ছিল না। অল্পবয়েসী এক কিশোরের জন্য রোমাঞ্চকর এক আবাস ছিল এই দুর্গ। টারেট, কজওয়ে, লুকানো পথ আর গুপ্তকক্ষ মিলিয়ে অজানা এক আকর্ষণ অনুভব করত। কল্পনা করত প্রাচীন আমলের নাইটদের কথা, তাদের লড়াই আর যুদ্ধের দৃশ্য। একাকী খেলত দুর্গের আনাচে-কানাচে। কিন্তু ধীরে ধীরে সঙ্গীহীন

খেলাধুলাপানসে হয়ে এসেছে, দুর্গ হারিয়েছে তার সব আবেদন। এখন জেলখানার মত লাগে জায়গাটা। আনন্দময় কিছুই নেই এখানে; আছে শুধু অস্ত্র-শস্ত্র, মৃত জীবজন্তু আর মান্ধাতা আমলের নিষ্প্রাণ সব আসবাবপত্র। কথা বলার কেউ নেই, আদর করার কেউ নেই; রুক্ষ স্বভাবের লোকজনে দুর্গ ভরে রেখেছেন লর্ড গ্রিফিন। সমবয়েসী তো দূরের কথা, একজন নারীও নেই এখানে।

কেঁপে উঠল ড্যানি—ঠাণ্ডায়। পুরু দেয়ালের কারণে তাপ ঢোকে না দুর্গের ভেতরে, তাপ বেরুতেও পারে না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা... সারা বছরই তাই আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয় ফায়ারপ্লেসে। পুরনো আমলের দুটো বর্ম সাজিয়ে রাখা হয়েছে ফায়ারপ্লেসের দু'পাশে, উপরের দেয়ালে ঝুলছে একটা তৈলচিত্র—বয়সের ভারে কালচে হয়ে এসেছে। নৃশংস এক দৃশ্য ফুটে আছে ছবিটায়, ঐতিহাসিক এক মুহূর্ত—নিষ্পাপদের হত্যাকাণ্ড। প্রাচীনকালে ইহুদি রাজা হেরড এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন, খুব শীঘ্রি তাঁর রাজ্য বেথলেহেমে নাকি এমন এক শিশু জন্মাবে, যে একদিন দখল করবে সিংহাসন। সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি করেন তিনি—দু'বছরের নিচে যত ছেলে-শিশু আছে রাজ্যে, সবাইকে হত্যা করতে হবে। তৈলচিত্রে সেই ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে, দেখা যাচ্ছে রোমান সৈনিক আর পুরোহিতের সাজে একদল লোক... তলোয়ার আর খাটো বর্শা নিয়ে আক্রমণ করেছে নিরীহ কিছু নারী ও শিশুকে। নারীরা চিৎকার করছে আতঙ্কে, চেষ্টা করছে সন্তানকে বাঁচাবার। ছবির মাঝখানে একটা লোক দু'হাতে উঁচু করে ধরেছে এক সদ্যোজাত বাচ্চাকে, তার পায়ের নিচে দলিত-মথিত হচ্ছে অসংখ্য শিশুর লাশ। ভয়াবহ, নৃশংস ব্যাপার!

খাবারের কক্ষে এ-ধরনের বীভৎস ছবি টাঙানো উচিত কি না, এ-নিয়ে অনেকবার ভেবেছে ড্যানি। কিন্তু সাহস করে বাবাকে বলতে পারেনি কথাটা। তিনি কোনোদিন ছবির দিকে ফিরেও

তাকিয়েছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ড্যানি তাকায়... তাকায় বিশেষ এক নারীর কারণে।

ছবির এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মহিলাটিকে। আতঙ্কে সাদা হয়ে আছে মুখ। কেন যেন তাকে দেখলেই মায়ের কথা মনে হয় ওর। মায়ের কোনও ছবি নেই ওর কাছে, লর্ড গ্রিফিন রাখতে দেননি। চেহারায় সামান্য মিল থাকা আতঙ্কিত মহিলাটিই এখন ওর জন্য মায়ের প্রতিচ্ছবি। ব্যাপারটা সুখকর নয় মোটেই।

পাঁচ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে আসার সময় মাকে আমেরিকায় ফেলে এসেছে ওরা। লর্ড গ্রিফিন সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'ওকে আর কোনোদিন দেখবে না তুমি।'

বয়স কম ছিল তখন ড্যানির, বাবাকে অতটা ভয় পেতে শেখেনি। সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'ওকে আর প্রয়োজন নেই আমাদের। তোমার মা ছিল একজন দুর্বল, বাজে মহিলা।'

'এমনভাবে বলছ, যেন মা মরে গেছে!'

'তোমার জন্যে তো সে মৃতই। আর কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হবে না তোমাদের, আমি সেটা নিশ্চিত করব। অন্য কোনও মহিলাও আমাদের জীবনে বাগড়া দিতে আসবে না।'

কী হয়েছিল তার কিছুই জানে না ড্যানি। ভাসা ভাসা কথা শুনেছে কেবল। কোর্টে নাকি মামলা ঠুকেছিলেন ওর বাবা—মায়ের বিরুদ্ধে। ডাকসাইটে উকিল নিয়োগ করে জিতে নিয়েছিলেন কেস, সেইসঙ্গে ওর কাস্টডি। কাস্টডি শব্দটার অর্থই জানত না তখন; পরে জেনেছে, এককভাবে ওকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছেন বাবা।

অল্পবয়সে পিতার মস্ত ভক্ত ছিল ড্যানি, পুজো করত তাঁকে। নতুন জায়গায় এসে তাই মহা আনন্দে কাটিয়েছে বেশ কয়েক বছর, একবারও ভাবেনি আমেরিকায় ফেলে আসা মায়ের কথা।

কিন্তু হঠাৎ করে, ছ'মাস আগেকার সেই দিনটিতে, মুখ থেকে রক্ত মুছতে গিয়ে... বাবা আর কালহুনকে মরা হরিণের লাশ টানতে দেখে... কী যেন ঘটে গেছে বুকের ভিতর। হাহাকার করে উঠেছে অন্তরাত্মা, অনুভব করেছে বিশাল এক শূন্যতা। মনে হয়েছে জীবনের মস্ত এক অংশে কেউ নেই। অংশটা মায়ের।

এসব কথা কাউকেই বলতে পারবে না ড্যানি, বললে বিদ্রূপ করা হবে তাকে... শাস্তি দেয়া হবে। বেশ কিছুদিন আগে এক রাতে মাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল ও, ঘুমাতে পারেনি আর, রাতভর বিছানায় বসে কেঁদেছে; সকালে নাশতার টেবিলে বাবাকে সেটা বলতেই বেত এনে বেধড়ক পেটান ওকে লর্ড গ্রিফিন। ওকে মেরুদণ্ডহীন দুর্বল প্রাণী বলে গাল দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ছেলেমানুষি ছেড়ে সত্যিকার পুরুষের মত শক্ত হতে। সে-ই শেষ, আর কোনোদিন মায়ের নাম মুখে আনেনি ও।

পিছনে দরজা খোলার আওয়াজ হলো, ঘুরে দাঁড়াল ড্যানি। লর্ড গ্রিফিন এসে ঢুকেছেন সাপারের জন্য, সঙ্গে ড. হিদোশি সোতো—এখানকার চিফ সায়েন্টিস্ট। জাতিতে জাপানি, বয়স চল্লিশের ঘরে, মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। চোখে ভারী চশমা। দুর্গের বাসিন্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র ড. হিদোশি ওদের সঙ্গে রাতের খাবার খায়। দিনভর কাজের অগ্রগতি নিয়ে খাওয়ার সময় তার সঙ্গে আলোচনা করেন লর্ড গ্রিফিন।

সারা দুনিয়ার চোখে ড. হিদোশি সোতো এক ঘৃণিত ব্যক্তি। বিজ্ঞানীমহল থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে তাকে—অমানবিক বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালাবার অভিযোগে। প্রাণঘাতী একাধিক রাসায়নিক ও বায়োলজিক্যাল এজেন্ট তৈরি করেছে সে... চড়া দামে সেসব বিক্রি করেছে দুনিয়াজোড়া বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের কাছে। গবেষণার সময় নিরীহ মানুষের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালাত, বিভিন্ন লড়াইয়ে তার

বানানো অস্ত্রে মারা গেছে বহু মানুষ। তবে নিরেট তথ্যপ্রমাণ না থাকায় কেউ শাস্তি দিতে পারেনি তাকে, স্রেফ বিজ্ঞানের জগৎ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। এমন অবস্থায় লোকটাকে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছেন লর্ড গ্রিফিন। হিদোশিও সানন্দে যোগ দিয়েছে তাঁর সঙ্গে। স্কটল্যাণ্ডের এই নির্জন জায়গায় গবেষণা চালিয়ে যেতে পারছে নির্বিঘ্নে। মানুষের সংস্পর্শ পছন্দ নয় তার, কাসল গ্রিফিনের পরিবেশ তার জন্য আদর্শ।

খাওয়ার টেবিলে বসে হিদোশিকে ভাল করে দেখল ড্যানি। ছুরি দিয়ে এমনভাবে প্লেটে পরিবেশন করা মাংস কাটছে, যেনল্যাবরেটরিতে শব ব্যবচ্ছেদ করছে কোনও প্রাণীর। লোকটার খাওয়ার ভঙ্গিতেও অশুভ কী যেন আছে। পিশাচের মত চিবায়, হিংস্র হয়ে ওঠে চেহারা। চোখ ফিরিয়ে নিল ও।

রোজকার মত আজও রোস্টেড বিফ দেয়া হয়েছে সাপারে। বিস্বাদ এক বস্তু, খেয়ে কোনও মজা নেই। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল ওর, যখন মা খাবার রান্না করতেন। হরেক রকমের সুস্বাদ পদ চেখে দেখবার সুযোগ ছিল তখন, এখন আর নেই। জীবনের মত দৈনন্দিন আহারও হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যহীন।

খেতে খেতে গল্প করছে ড. হিদোশি। '...বুঝলেন, স্যর, ক্ষমতার পট পরিবর্তন হচ্ছে পুরো দুনিয়ায়। আমেরিকানদের বানানো নিয়মকানুন আর মানছে না কেউ। অগ্রাহ্য করছে কেমিক্যাল আরবায়োলজিকাল ওয়েপনের সবরকমের নিষেধাজ্ঞা। আমাদের ব্যবসা বাড়ানোর এমন চমৎকার সুযোগ আর পাবেন না। উৎসাহী ক্রেতারা টাকার থলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে...'

'এসব আমি জানি,' বাধা দিয়ে বললেন গ্রিফিন। 'কিন্তু বোকার মত যার-তার সঙ্গে জোট বাঁধলে হিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি। তারচেয়ে এমন কারও কাছে অস্ত্র বিক্রি করা ভাল, যারা বিপদ দেখা দিলে আমাদের পাশে দাঁড়াবে... যাদের

নিজেদের অস্তিত্ব কোনোদিন হুমকির মুখে পড়বে না। টাকাপয়সার আমদানি নাহয় একটু কমই হলো।'

'কিন্তু ওরা আপনাকে প্রয়োজনীয় লাইভ সাবজেক্ট দেবে না। আমাদের সবচেয়ে বড় রিকোয়্যারমেন্ট কিন্তু সেটাই...'

ড্যানির উপর চোখ পড়ল লর্ডের। 'কী ব্যাপার, তুমি খাচ্ছ না?'

'ইয়ে, আমার খিদে নেই, বাবা,' ইতস্তত করে বলল ড্যানি।

'খিদে না থাকলেও খেতে হবে,' হুকুমের সুরে বললেন লর্ড। 'মাংস খাওয়া দরকার তোমার। ওতে আয়রন আছে—পেশি আর হাড় গঠনে সহায়তা করবে।'

মুখ কালো করে এক টুকরো মাংস মুখে পুরল ড্যানি, আর তখুনি টোকা পড়ল দরজায়। বনমানুষের মত কুঁজো হয়ে ভিতরে ঢুকল কালহুন। লর্ড গ্রিফিনের কাছে এসে কানে কানে কী যেন বলল।

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল লর্ডের, কপালে দেখা দিল ভ্রূকুটি। জলদগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

আবারও কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসাল কালহুন।

ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে পড়লেন গ্রিফিন। ড্যানিকে বললেন, 'খাওয়া শেষ করো।' তারপর বেরিয়ে গেলেন কালহুনের সঙ্গে।

হিদোশি তখনও বকবক করে চলেছে। আসন্ন শ্রোতা উঠে যাবার পরেও কথা বলে চলল, '...সবকিছুর চাবিকাঠি জেনেটিক্স। তবে এখনও তার রহস্য ভেদ করতে পারিনি আমরা। জানেন তো, ঈল দিয়ে বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আমাদের চাই মানুষ...'

কালহুনের সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন লর্ড গ্রিফিন, সাপারের অনেকক্ষণ পরেও ফিরলেন না। সাহস করে তাঁর অফিসে ঢুকে পড়ল ড্যানি। জানে, ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু পরোয়া করছে

না। একসময় তাঁকে খুশি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইটনের সেই টুর্নামেন্টের পর বোঝা হয়ে গেছে, সব চেষ্টা অর্থহীন। কোনোদিন বাবার কাঙ্ক্ষিত টার্গেটে পৌঁছুতে পারবে না ও। অযথা খেটে কী লাভ?

বাবার ডেস্ক ঘাঁটতে শুরু করল ড্যানি। তালা দেয়া নেই কোনও ড্রয়ারে, তার প্রয়োজনও নেই। কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অফিসে বিনা-অনুমতিতে ঢোকার ব্যাপারে, কেউ সে-নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে না। দুরু দুরু বুকে সবক'টা ড্রয়ার দেখল ও, পেল না যা খুঁজছিল। তাই চলে গেল জানালার পাশে রাখা ফাইলিং কেবিনেটের সামনে। লেবেল লাগানো আছে সবক'টা ড্রয়ারে।

এস্টেট বিজনেস—কাজে লাগবে না ওর।

সিলভারব্যাক—গবেষণা সংক্রান্ত কাগজপত্র। লেকের নামে সাম্প্রতিক প্রজেক্টের নাম রেখেছেন লর্ড গ্রিফিন। ড. হিদোশি তার প্রধান। দুর্গের তলায় গোপন ল্যাবরেটরিতে চলছে গবেষণা। তবে ওতে কোনও আগ্রহ নেই ড্যানির।

তৃতীয় ড্রয়ারে লেখা—*ব্যক্তিগত*। টান দিয়ে ওটা খুলল ও। ভিতরের হাজারো কাগজপত্র ঘেঁটে বের করে আনল একটা ফোল্ডার, আমেরিকার মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র রয়েছে ওতে। ফোল্ডার খুলে একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টাল। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল যা খুঁজছিল... বস্টনে ওর মায়ের ঠিকানা।

কয়েকবার পড়ে ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল ড্যানি। কাগজপত্র সব সাজিয়ে রাখল আগের মত। এরপর ডেস্কে এসে তুলে নিল এক টুকরো কাগজ আর কলম। লিখতে শুরু করল চিঠি।

প্রিয় মা,

এই প্রথমবারের মত চিঠি লিখছি তোমাকে। হয়তো ভাবছ আগে কেন লিখিনি। আসলে...

ধুমধাম করে বাইরে থেকে ভেসে এল আওয়াজ। আঁতকে উঠল ড্যানি। তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম লুকিয়ে ফেলল পকেটে। এখানে না। চিঠিটা লিখতে হবে লুকিয়ে। কিথলিতে গিয়ে পোস্টও করতে হবে গোপনে। দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল। শুনতে পেল দুর্গের সদর ফটক খুলে যাবার আওয়াজ। হৈ-হল্লা করছে কারা যেন। খানিক পর সব নিশ্চুপ হয়ে গেলে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। এক ছুটে চলে গেল নিজের কামরায়। দরজা আটকে ফের লিখতে থাকল চিঠি।

ভাল লাগছে ওর, অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করছে হৃদয়ে। চিঠির পাতায় প্রকাশ করতে পারছে নিজের কথা। ইশ্‌শ্‌, মুখেও যদি বলা যেত কাউকে! কিন্তু বলবে কী করে? এখানে সবাই ওর অচেনা।

না, একটু ভুল হলো। মাসুদ রানার কথা মনে পড়ল ওর। স্কুলের সেই বেয়াড়া ছেলেটা। সার্কাসে গিয়ে তাকে দেখে প্রথমটায় ভেবেছিল মিটমাট করে নেবে সব, ভাল একটা সঙ্গী পাওয়া যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই রক্ত চড়ে গিয়েছিল মাথায়। ওই ছেলে ওর জন্মের শত্রু... ওর কারণে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে তাকে, ছোট হতে হয়েছে বাবার চোখের সামনে। স্থানীয় যে-দুটো ছেলেকে লর্ড গ্রিফিন ওর সঙ্গী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাদেরকে পয়সা খাইয়ে পাঠিয়েছিল রানাকে তুলোধুনো করতে। শেষে ওরাই তাদেরকে... যাক, সেসব আর ভাবতে চায় না ও।

মাথা গরম স্বভাবটাই সব গড়বড়ের মূল, বুঝতে পারে ড্যানি। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, পরে মনে মনে পস্তায়। এখন কল্পনা করছে, শত্রুতা ভুলে যদি এগিয়ে যেত রানার দিকে... হাত মেলাত, কত ভালই না হতো! ছুটির এই প্রাণহীন দিনগুলোয় একজন বন্ধু পাওয়া যেত। কিন্তু না, নিজের

অহম্‌বিসর্জন দিয়ে শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। বাবা জানতে পারলে পিঠের চামড়া তুলে নেবেন।

নিচতলা থেকে ভেসে আসা নতুন শব্দে মনোযোগ টুটে গেল ড্যানির। ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, সেইসঙ্গে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। শাস্তি দেয়া হচ্ছে কাউকে। ওয়ার্কারদের কেউ বোধহয়। এসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা—নিয়ম ভাঙে ওরা, তার জন্য শাস্তিও পায়। কালহুন একটা রক্তলোলুপ পিশাচ, দয়ামায়া বলে কিছু নেই তার ভিতরে; এ-ধরনের ঘটনায় তার হাতেই দোষীকে তুলে দেন লর্ড গ্রিফিন।

শব্দগুলো অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করল ড্যানি। নিজেকে ব্যস্ত রাখল চিঠি লেখায়। মনের সব কথা উগরে দিচ্ছে কাগজে। হঠাৎ কে যেন টোকা দিল দরজায়। ঝট করে ওদিকে তাকাল ও। ছায়া দেখল দরজার তলা দিয়ে। পাল্লার গায়ে গা ঘষছে ওটা, ফোঁস ফোঁস করে ফেলছে ভেজা নিঃশ্বাস। ওপাশে কী দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পেরে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল ওর। জানে, তারপরেও স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না ওটাকে। ভয় করে।

দরজা খুলল না ড্যানি। ঝুঁকে পড়ল আবার চিঠির উপর।

মা, আমি আর পারছি না...

পনেরো

'রেডি, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন এরফান চৌধুরি। 'এবার চেষ্টা

করতে চাও?'

'অবশ্যই, চাচা,' বলল রানা দৃঢ় গলায়।

'তা হলে শুরু করো।'

ক্লাচ টিপে গাড়ির গিয়ার শিফট করল রানা, রিলিজ করল হ্যাণ্ডব্রেক, তারপর ধীর গতিতে এগোতে শুরু করল ড্রাইভওয়ে ধরে। গত দু'দিন থেকে সকালবেলায় কটেজের পিছনে মাঠে ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করছে ও, বিকেলে তালিম নিচ্ছে ইঞ্জিন সম্পর্কে। চাচ'র সঙ্গে নানা রকম যন্ত্রাংশ খুলেছে গাড়ি থেকে, সেগুলো পরিষ্কার করে লাগিয়ে দিয়েছে ফের। ওকে অয়েল পাম্প দেখিয়েছেন চাচা; ড্রাইভশাফট চিনিয়েছেন; ব্যাখ্যা করেছেন চাকার ডিফারেনশিয়াল, যা দিয়ে একেকটা চাকার ঘূর্ণন কমিয়ে-বাড়িয়ে সমান তালে মোড় ঘোরে গাড়ি। শুরুতে মাথায় কিছু না ঢুকলেও এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে সব।

চাচাও ওর উন্নতি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই মাঠ ছেড়ে ওকে নিয়ে এসেছেন রাস্তায়। স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরে রানা ড্রাইভ করছে, মনোযোগ রাস্তার উপর নিবদ্ধ। কোনও ভুল করতে চায় না। মাঠের তুলনায় রাস্তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। খোলামেলা জায়গা নেই এখানটায়, দু'পাশে গাছের সারি, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে এক চিলতে পথ। মসৃণ নয়, এবড়ো-খেবড়ো। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, হাত ছুটে যেতে চাইছে স্টিয়ারিং হুইল থেকে। তারপরেও নিরাপদেই পৌঁছুতে পারল এস্টেটের ফটক পর্যন্ত।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার জন্য জায়গা বদল করলেন চাচা। বললেন, 'ভালই চালিয়েছ, তবে খুব আস্তে। ফেরার পথে আর কিছুটা স্পিড বাড়িয়ে চেষ্টা কোরো, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

দু'দিন কেটে গেছে লর্ড গ্রিফিনের এলাকা ঘুরে আসার পর। এর মাঝে রেড বা হ্যামার জোন্স... কারও তরফ থেকে কোনও

খবর পায়নি ও। অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ড্রাইভিং শিখছে মনকে ব্যস্ত রাখার জন্য। কিন্তু লর্ড গ্রিফিন বা তাঁর দুর্গকে ভুলতে পারছে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে রডনিকে খুঁজে বের করবার জন্য ওর পক্ষ থেকে কিছু করা জরুরি। কিন্তু হ্যামার যতক্ষণ না ডেকে পাঠাচ্ছে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

পরের এক ঘণ্টা ড্রাইভ করল রানা। আত্মবিশ্বাস বাড়ল। চাচা এবার উৎসাহ দিলেন টপ গিয়ারে ড্রাইভ করবার।

'তুমি পারবে, রানা,' বললেন তিনি। 'শুধু খেয়াল রেখো গাড়ির মতিগতির দিকে... রাস্তার দিকে। কাজটা কঠিন না।'

মনে মনে তৈরি হলো রানা। রাস্তাটা মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। জানে কোথায় উঁচু-নিচু আছে, কোথায় মোড় নিতে হবে, কোথায় গতি বাড়াবার মত সরল বিস্তার পাওয়া যাবে। গাড়িটাও কোন্ পরিস্থিতিতে কীভাবে সাড়া দেয়, বুঝে ফেলেছে। ইঞ্জিন নিউট্রালে রেখে অ্যাকসেলারেটর চাপল ও কয়েকবার, যেন হুঙ্কার ছাড়ল। কল্পনার চোখে নিজেকে রেসিং কারের ড্রাইভারের জায়গায় দেখছে। সন্তুষ্ট হয়ে রিলিজ করল ব্রেক, গিয়ার বদলে চাপ দিল অ্যাকসেলারেটরে—একই সঙ্গে ধীরে ছাড়ল ক্লাচ।

ছুটল আলফা রোমিও। গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। ফার্স্ট গিয়ার থেকে সেকেণ্ড গিয়ারে গেল রানা, এরপর থার্ড গিয়ারে। এসে গেল প্রথম মোড়। আলতো করে ব্রেক চেপে গতি কমাল ও, বন বন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং। চমৎকার দক্ষতায়, নিপুণভাবে পেরিয়ে এল মোড়। পরক্ষণে আঁতকে উঠল।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে একটা কালো ঘোড়া। গাড়ি দেখে হ্রেষারব করে উঠেছে, শূন্যে তুলে ফেলেছে দু'পা। ব্রেক চেপে ধরল রানা, মিশিয়ে দিল ফ্লোরবোর্ডে। একই সঙ্গে পাগলের মত ঘোরাল স্টিয়ারিং। মাটিতে স্কিড করে ঘুরে গেল গাড়ি, কোনোমতে সংঘর্ষ এড়াল ঘোড়ার সঙ্গে, দশ ফুট

দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল বিশ্রী আওয়াজ তুলে।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে রানার, শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। আরেকটু হলেই...

ঘাড় ফেরাল ও। ঘোড়া ও তার আরোহীকে চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। মার্টিনির পিঠে পেনিলোপি ম্যাকিনটশ। ঘোড়াটা এখনও লাফাচ্ছে, তবে দক্ষ হাতে তাকে শান্ত করল পেনি। বাধ্য করল থামতে।

'সরি!' জানালা দিয়ে গলা চড়িয়ে বলল রানা।

'হওয়াই উচিত,' রাগী গলায় বলল পেনি। 'দেখে চালাতে পারো না?'

'গাড়ির আওয়াজ দূর থেকেই শোনা যাবার কথা,' দরজা খুলে নামল রানা। এগোল মেয়েটার দিকে। 'সরে যেতে পারতে।'

'সরবার জায়গা কোথায়?'

তাকাল রানা। রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়। সত্যিই যাবার জায়গা নেই।

'সরি,' আবারও বলল ও।

রানার পিছু পিছু এরফান চাচাও নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। তাঁর সঙ্গে পেনির পরিচয় করিয়ে দিল ও। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হঠাৎ এখানে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল পেনি। 'জানতাম না মরতে বসব।' রানাকে জিভ কামড়াতে দেখে হাসল। 'আমার সঙ্গে একটু হাঁটবে? কথা আছে।'

চাচার দিকে তাকাল রানা। এরফান চৌধুরি বললেন, 'অসুবিধে নেই, তোমরা গল্প করো। আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। লাঞ্চে দেখা হবে।'

চলে গেলেন তিনি। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করল পেনি, পাশে রানা। রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ছায়ায় নামল দু'জনে।

ঘোড়াটাকে মুগ্ধ চোখে দেখছে রানা, তা লক্ষ করে পেনি প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'ঘোড়ায় চড়তে জানো?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল রানা, যদিও পারে না। সুন্দরী একটি মেয়ের সামনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে চাইছে না।

'তা হলে কখনও-সখনও আমার সঙ্গে ঘুরতে যেতে পারো। ঘোড়া ধার দিতে পারব।'

'ভেবে দেখি,' ভাব নিল রানা।

'আমি কিন্তু এ-ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি,' তাড়াতাড়ি বলল পেনি। সবুজ চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। 'হয়েছে কী, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার পর কিথলি থানার সার্জেন্ট মরোর সঙ্গে কথা বলেছি। জিজ্ঞেস করেছিলাম লর্ড গ্রিফিনের বিষয়ে।'

'কী জানতে পারলে?'

'থানায় কিছুই জানাননি লর্ড... ওই যে, লেকের ওদিকে রডনিকে যে দেখেছিলাম, সে-ব্যাপারে।'

'পুলিশের কাছে সেটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি?'

'পাগল হয়েছ? লর্ডের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই শুনবে না সার্জেন্ট মরো। তার ধারণা, ভদ্রলোক একজন মহাপুরুষ।'

'এত উঁচু ধারণা কেন?'

শুকিয়ে যাওয়া একটা ঝরনার পাশে পৌঁছেছে ওরা। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ লুকোচুরি খেলছে ওখানে। পেনি বলল, 'পুরনো লর্ড মারা যাবার পর সবাই ভেবেছিল, গ্রামটা শেষ হয়ে যাবে। এলাকার উন্নয়ন করবে না আর কেউ। কিন্তু লর্ড গ্রিফিন এসে টাকা ছড়াতে শুরু করলেন—প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে।

লোকের মুখে হাসি ফিরে এসেছে। হাসির পিছনে আছে ভয়, লর্ড যদি গ্রামে টাকা দেয়া বন্ধ করে দেন! তাই কেউ কিছু বলতে বা শুনতে রাজি নয়। আমার কি ধারণা, জানো? ভদ্রলোক টাকা ওড়াচ্ছো এই কারণেই। যাতে কেউ তাঁর কাজে নাক না গলায়, প্রতিবাদ না করে। তাঁকে দেখো বা না-দেখো, নিশ্চিত থাকতে পারো, পুরো এলাকা কিনে রেখেছেন তিনি।'

'কিন্তু যতকিছুই হোক, তুমি যে-ইনফরমেশন দিয়েছ, সেটা তো অগ্রাহ্য করা সম্ভব না। পুলিশ নিশ্চয়ই খোঁজখবর নেবে?'

'কে, সার্জেন্ট মরো?' বিদ্রূপের সুরে বলল পেনি। 'কোনোদিন দেখেছ তাকে?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'সমস্যা কী তার?'

'ব্যাটা একটা মোটা শুয়োর, অকর্মার ধাড়ি, আলসের হদ্দ। তা ছাড়া প্রতি ক্রিসমাসে গ্রিফিন কাসল থেকে উপহারের ঝুড়ি পায় সে। মাসে মাসে মাসোহারাও পায় বোধহয়। আর যা-ই ঘটুক, তদন্ত করতে গিয়ে লর্ড গ্রিফিনকে চটাবে না ও কিছুতেই। না, রানা, পুলিশি সাহায্য যদি চাও, নিজেকেই পুলিশ হতে হবে তোমার। কারণ সার্জেন্ট মরো আর একটা কলাগাছের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

'আমি এমনিতেও নিজ থেকে খোঁজখবর নেবার কথা ভাবছি,' রানা জানাল।

'তা হলে সাবধান থাকবার পরামর্শ দেব তোমাকে,' রানার কাঁধে হাত রাখল পেনি। কণ্ঠে আন্তরিকতা। 'কারণ লোকে যা-ই বলুক, লর্ড গ্রিফিন মোটেই সুবিধের মানুষ নন।'

'মানে?'

সামনে এক টুকরো ঘাসে ঢাকা জমি দেখতে পেয়ে মার্টিনির লাগাম ছেড়ে দিল পেনি। এগিয়ে গিয়ে ঘাস খেতে থাকল ঘোড়াটা। মাটির একটা ঢিবির উপর পাশাপাশি বসল রানা আর

পেনি।

'পুরনো লর্ডের এস্টেট ম্যানেজার ছিল আমার বাবা,' পেনি বলল। 'সবকিছুর দেখাশোনা করত। লর্ড গ্রিফিন আসার পরও প্রথম কিছুদিন পালন করেছে দায়িত্বটা। ভদ্রলোক প্রচুর টাকা খরচ করছিলেন এস্টেট, দুর্গ আর গ্রামের পিছনে; সেসব দেখে বাবাও শুরুতে পছন্দ করেছিল তাঁকে। কিন্তু যত দিন গেল, ততই পছন্দ কমতে থাকল। লর্ডের আসল চেহারা প্রকাশ পেতে থাকল বাবার সামনে। দয়ামায়া বলে কিছুই নেই লোকটার ভিতরে, কারও আবেগের পরোয়া করেন না। আচরণ করেন মনিবের মত, যেন আমার বাবা তাঁর ক্রীতদাস। এসব নিয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে খিটিমিটি লাগত বাবার। একদিন দু'জনে রাইডিঙে বেরুল, এস্টেটের চারধারে যে-বেড়া তৈরি হচ্ছিল তা দেখবে বলে। হঠাৎ কেন যেন ভয় পেয়ে লর্ডের ঘোড়া তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়। ব্যস, আর যায় কোথায়? লর্ডের মাথায় রক্ত চড়ে গেল, হাতের লাঠি দিয়ে বেদম পেটাতে শুরু করলেন ঘোড়াকে। বাবা বাধা দিতে গেলে এক কথায় চাকরি থেকে বের করে দিলেন। চিন্তা করো ব্যাপারটা! বেকার হয়ে গেল বাবা। অনেকদিন কোনও কাজ খুঁজে পায়নি, খুব খারাপ সময় গেছে আমাদের। শেষে গ্লেনকো-তে ছোট একটা চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয়েছে তাকে। ছুটিছাটায় আসে, নইলে বাবার দেখা পাই না। এসব কিছুর জন্যে দায়ী লর্ড গ্রিফিন। লোকটাকে আমি পছন্দ করি না, রানা। বিশেষ করে যে-লোক ঘোড়ার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুরতা করতে পারে, তাকে কখনোই আমার পক্ষে পছন্দ করা সম্ভব না।'

'হুম,' রানা মাথা ঝোঁকাল। 'তা হলে... ধরো সেদিন যদি তুমি সত্যিই রডনিকে দেখে থাকো, আর ও যদি লর্ড গ্রিফিনের লেকে মাছ ধরতে গিয়ে ধরা পড়ে থাকে... কী ঘটতে পারে বলে মনে হয়? লর্ড গ্রিফিন কি খারাপ কিছু করবেন ওর সঙ্গে?'

'অসম্ভব বলে মনে করি না,' পেনি বলল। 'ওখানকার পরিস্থিতি নিশ্চয়ই দেখেছ। এত গোপনীয়তা... তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। লর্ড সেটা কাউকে জানতে দিতে চান না। পুলিশও তাঁকে ঘাঁটাতে যায় না।'

'ভাবছি রেডকে নিয়ে আবার যাব ওখানে,' রানা বলল। 'আমাদেরকে জানতেই হবে, রডনির ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

চোখ উজ্জ্বল হলো পেনির। 'আমাকে নেবে তোমাদের সঙ্গে? তিনজনে ভালই দল হবে আমাদের। তা ছাড়া মার্টিনি থাকায় যেখানে-সেখানে দ্রুত যাওয়া-আসা করতে পারব আমি।'

'কিন্তু তুমি তো মেয়ে,' ওর উৎসাহে পানি ঢেলে দিল রানা। 'এসব কাজে মেয়েদের থাকা উচিত না। কাজটা পুরুষের।'

ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল পেনি। তারপর হেসে উঠল হা হা করে। 'বলে কী ছেলে? তুমি পুরুষ? পুঁচকে ছোঁড়া একটা! হাতের জোর, পায়ের জোর, গলার জোর... সবদিক দিয়েই আমি তোমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। যে-কোনও কাজই তোমার চেয়ে ভাল করতে পারি আমি।'

'অসম্ভব!'

'শোনো, বাড়িতে প্রতিদিন ভারী কাজ করি আমি। ভারী ভারী বস্তা আর খড়ের গাদা টানি গোলাঘরে। মার্টিনির স্টল সাফ করি, ওর পরিচর্যা করি, রাইডও করি রোজ। তিন-তিনটা ভাই আছে আমার, লড়তে হয় ওদের সঙ্গেও। চ্যালেঞ্জ ধরে বলতে পারি, তোমার মত একটা নাজুক শহুরে ছেলের চেয়ে গায়ের জোর অনেক বেশি আমার।'

'কী বললে? আমি নাজুক?' ঝট করে উঠে দাঁড়াল রানা। রেগে গেছে।

পেনিও উঠল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না?দেখো তা হলে।'

পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল মেয়েটার দেহে। রানা কিছু বুঝে

ওঠার আগেই পেনির ল্যাং খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ল মাটিতে। ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পেনি, মাটিতে চেপে ধরতে চায়। ঝটকা দিয়ে ওকে ফেলে দিল রানা, চেষ্টা করল গড়ান দিয়ে পাল্টা গায়ের উপর উঠতে। সফল হলো না। পেনিও গড়ান দিল। জাপটাজাপটি করে দু'জনে গড়াগড়ি খেল কিছুক্ষণ। শেষে রানার হাত মুচড়ে দিল পেনি, সে-অবস্থাতেই চিৎ করে ফেলল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে বসল বুকের উপর। নড়বার আর উপায় রইল না রানার। হাঁ করতেই ওর মুখে এক মুঠো মরা পাতা গুঁজে দিল পেনি।

থু দিয়ে মুখ থেকে মরা পাতা ফেলল রানা। চেহারা বিকৃত করে ফেলেছে।

হাসতে হাসতে পেনি বলল, 'কী, হলো তো প্রমাণ? গাঁয়ের মেয়েদের আর কোনোদিন অবজ্ঞা করবে?'

'ছাড়ো আমাকে!'

'নিশ্চয়ই।' রানাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল দস্যি মেয়েটা। আর কোনও কথা না বলে মার্টিনির পিঠে চড়ল। ঘোড়া দাবড়ে ছুটে হারিয়ে গেল মুহূর্তে।

গা থেকে ধুলোবালি আর মরা পাতা ঝাড়ল রানা। একটু রাগ লাগলেও মেয়েটার প্রতি শ্রদ্ধা চলে এসেছে। ওর দেখা আর দশটা মেয়ের মত লাজুকলতা নয় পেনিলোপি ম্যাকিনটশ। সৌন্দর্যের পাশাপাশি রয়েছে কাঠিন্য। সেই সঙ্গে রয়েছে দুঃসাহস ও ব্যক্তিত্ব। ভাল লেগেছে ওর। রান্নাবাড়া বা পুতুল খেলায় এই মেয়েকে মানায় না।

রেডের কথাই ঠিক—মেয়ে বটে একটা।

সন্ধ্যায়, রাতের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। ফুপুর কাছ থেকে দিকনির্দেশ নিয়ে একটা ম্যাপ এঁকে ফেলেছে, চাচার কাছ

থেকে নিয়েছে একটা টর্চলাইট... সরাসরি হাজির হলো কিথলিতে, রেডের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। পেনির সঙ্গে কথা বলার পর রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে, অপেক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে।

অ্যানি রাইলির বাড়িটা ছোট, গ্রামের এক কোণে অবস্থিত। দেখে বোঝা যায় মালিকের গরিবি দশা। টোকাদিতে রেডই দরজা খুলল। অবাক হলো রানাকে দেখে।

'আরে, দোস্ত! তুমি হঠাৎ কোত্থেকে? এসো, এসো, ভেতরে এসো।'

সামনের কামরায় ছোট তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে ছিলেন মিসেস রাইলি, রানাকে দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন কিছু খেতে দেবেন কি না। মাথা নাড়ল রানা। ঘরের অবস্থা করুণ। ফার্নিচার বলে তেমন কিছুই নেই, একটামাত্র প্রদীপ জ্বলছে। কয়লার আগুন জ্বেলে গরম রাখা হয়েছে ঘর।

রানাকে পিছনের আঙিনায় নিয়ে গেল রেড। ওখানে বসে কথা হলো দু'জনের।

'মিস্টার হ্যামারের কোনও খবর পেয়েছ?' জানতে চাইল রানা।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রেড। দেয়ালের উপর দিয়ে থুতু ফেলল বাইরে। 'ওর কথামত গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি, কিন্তু তেমন কিছুই জানতে পারিনি।'

'কী জেনেছ সেটাই বলো।'

'সত্যি বলতে কী, কিছুই না। সবাই শুধু প্রশংসা করছে লর্ড গ্রিফিনের। একটাও মন্দ কথা শুনিনি। আমার একটু সন্দেহই হচ্ছে, রানা। আমরা ভুল লোকের পিছনে সময় নষ্ট করছি না তো?'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। পেনির কাছে যা

যা শুনেছে, সব খুলে বলল বন্ধুকে।

'কী করতে চাও তা হলে?' জিজ্ঞেস করল রেড। 'হ্যামারের জন্য আরও দু'চারদিন অপেক্ষা করবে, নাকি...'

'ভুলে যাও ওর কথা,' রানা বলল। 'ওর জন্যে সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না। আমরা নিজেরাই এবার যা করার করব।'

'কী হলো মোটকুটার?' রেড দ্বিধান্বিত। 'আমাদেরকে ধোঁকা দেয়নি তো? হতে পারে মিথ্যে কথা বলে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে আমাদের, আসলে চেয়েছে পথ থেকে সরাতে।'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আর কেউই কি ওকে দেখেনি?'

'না। লোকটা গাঁয়ের কোথায় উঠেছে, খুঁজে বের করেছি আমি। পাবের পিছনে একটা কামরা নিয়েছে। এক মাসের ভাড়াও দিয়েছে অগ্রিম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে একবারও ফেরেনি ওখানে।'

'তা হলে তিনটে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি,' রানা বলল। 'হয় তদন্তে ব্যর্থ হয়ে চুপচাপ কেটে পড়েছে, নয় এখনও ওখানে খুঁটি গেড়ে তদন্ত করছে; অথবা...'

'খারাপ কিছু ঘটেছে ওর কপালে,' গম্ভীর গলায় বাক্যটা শেষ করল রেড।

ষোলো

রানা যখন কটেজে ফিরল, ফুপু তখন কিচেনে—বাসনকোসন ধোয়ায় ব্যস্ত। সোজা তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলো ও, অনুমতি চাইল দু'দিনের জন্য রেডের সঙ্গে ক্যাম্পিঙে যেতে। প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করলেও শেষে রাজি হলেন ফুপু, তবে কথা আদায় করে নিলেন, সাবধানে থাকবে রানা, ঝামেলা দেখলেই ফিরে আসবে বাড়িতে। সব শর্ত মেনে নিল রানা, চেপে গেল রডনি রাইলি, হ্যামার আর লর্ড গ্রিফিনের কথা। ওর আসল উদ্দেশ্য জানলে ফুপু ঘর থেকেই বেরোতে দেবেন না ওকে।

দু'জনে যখন কথা বলছে, তখনই গায়ে কম্বল জড়িয়ে কিচেনে উপস্থিত হলেন চাচা। চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাঁর, হাঁটছেন শ্লথপায়ে।

'তোমাদের গলা শুনলাম,' বোনের চোখ রাঙানি দেখে কৈফিয়তের সুরে বললেন তিনি। 'ঘুমাতে পারছিলাম না।'

'বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেয়া উচিত তোর,' বললেন ফুপু।

'জানি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাচা। 'কিন্তু শুয়ে শুয়ে আর কত সময় অপচয় করব? হাতে তো সময় বেশি নেই।'

'বাজে বকিস না তো। ঘুমাতে যা। আমারও ঘুম পেয়েছে!'

'তা হলে তুমি যাও, বুবু। আমি একটু বসি। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।' একটা চেয়ার টেনে নিলেন চাচা।

'আমিও তোমার সঙ্গে বসি?' রানা বলল।

'ইচ্ছে হলো বসো।'

দু'জনের মুখের দিকে পালা করে তাকালেন ফুপু। তারপর বললেন, 'আমি শুতে যাচ্ছি। বেশি রাত জেগো না তোমরা।'

'জাগব না, ফুপু।'

'বেশ। সকালে তোমাকে কিছু খাবার প্যাক করে দেব। একটা ফার্স্ট এইড কিটও রেডি করে দেব। ঠিক আছে? গুড নাইট।'

চলে গেলেন ফুপু। চাচার দিকে ফিরে রানা বলল, 'তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, চাচা। মাঝে মাঝে আমারও ঘুমাতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় ঘুমালেই জীবনের কিছু মিস হয়ে যাবে।'

হাসলেন চাচা। 'তোমার বাবা আর আমি যখন ছোট ছিলাম, এক রাতে বাজি ধরেছিলাম, দু'জনের কেউই ঘুমাব না। খুব চেষ্টা করেছি রাতভর জেগে থাকতে, কিন্তু কখন যে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছি বলতে পারব না। কিন্তু সকালে উঠে আমরা এমন ভাব করলাম যেন ঘুমাইনি, একজন আরেকজনকে দোষ দিলাম ঘুমানোর জন্য। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

'কল্পনা করতে কষ্ট হয়, তোমরা কখনও আমার বয়েসী ছিলে,' রানা বলল।

'সবারই শৈশব-কৈশোর থাকে, রানা,' আগুনের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেলেন চাচা। 'তারপর আসে যৌবন, শেষে বার্ধক্য। এটাই জগতের নিয়ম। আয়নার দিকে তাকালে আজকাল খুব অবাক লাগে, বুঝলে? বিশ্বাস করতে পারি না, ওই বুড়ো লোকটা আমি।'

'তুমি মোটেই বুড়ো নও, চাচা,' রানা প্রতিবাদ করল।

'কিন্তু আজকাল বুড়োর মতই লাগে নিজেকে।' কেশে উঠলেন চাচা। রুমাল বের করে চেপে ধরলেন মুখে।

কেটে গেল কিছুটা সময়। আগুনের দিকে মুখ করে চুপচাপ বসে রইল চাচা-ভাতিজা, বলবার মত কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। একটু পর নতুন প্রসঙ্গ তুললেন চাচা।

'বড় হয়ে কী হতে চাও, কখনও ভেবে দেখেছ, রানা?'

'না, চাচা।'

'কখনও কাউকে দেখে কোনও ইচ্ছেও হয়নি? পুলিশ, সৈনিক বা ফায়ারম্যান?'

'কী জানি!' শ্রাগ করল রানা। 'পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। অভিযাত্রী হতে পারলে মন্দ হয় না।'

'বাহ্! চমৎকার ইচ্ছে তো!'

'কিংবা তোমার মত স্পাই।'

একটু যেন চমকে উঠলেন চাচা। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'আজ কিন্তু ভালই ড্রাইভ করেছ তুমি। আগামীকাল ফের প্র্যাকটিস করলে কেমন হয়? বিকেলে মাছ ধরতেও যেতে পারি। নদীটা আমাকে খুব টানছে।'

আবারও তাঁকে হতাশ করতে হলো রানার। রেডের সঙ্গে ক্যাম্পিঙে যাবার কথাটা বলল তাঁকে।

'ও! তা হলে এজন্যেই খাবার আর ফার্স্ট এইড কিটের কথা বলছিল বুবু!' বললেন চাচা। 'সময় কাটাবার জন্যে দারুণ প্ল্যান করেছ। ছোটবেলায় আমারও ক্যাম্পিঙে যাবার শখ ছিল।'

কথা শেষ করে আবার চুপ হয়ে গেলেন তিনি। ফায়ারপ্লেসের আলোয় গম্ভীর দেখাল চেহারাটা।

নীরবতা ভেঙে একটু পর মুখ খুললেন এরফান চৌধুরি। থমথমে গলায় বললেন, 'তুমি স্পাই হবার কথা বললে, রানা, কিন্তু পেশাটা স্রেফ উত্তেজনা বা রোমাঞ্চ নয়। এতে অনেক বিপদ রয়েছে।'

'জানি। তুমি সেদিন বলেছ।'

'সব বলিনি। কিন্তু বোধহয় বলা দরকার। একবার ধরা পড়েছিলাম আমি শত্রুর হাতে। বড় ভয়ানক সে-অভিজ্ঞতা। শুনবে?'

'যদি তুমি বলো।'

পোকার তুলে ফায়ারপ্লেসের আগুন একটু উসকে দিলেন চাচা। তারপর আয়েশ করে বসলেন চেয়ারে। স্মৃতির স্রোতে ভেসে গিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'পূর্ব ইয়োরোপের ছোট্ট এক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয় আমাকে। জামাকাপড়ও বদলাতে দেয়নি, হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে তুলেছিল একটা ট্রাকের পেছনে। ওদের হেডকোয়ার্টার ছিল মধ্যযুগীয় এক দুর্গে, সেখানে আমাকে নিয়ে যায় ওরা। আটকে শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ—আমার পরিচয়, কার হয়ে কাজ করি, আমার মত আর কতজন এজেন্ট রয়েছে ওদেশে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সেসবের জবাব দিইনি আমি। ফলে মুখোমুখি হতে হলো নির্যাতনের। তার বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ো না... বলতে চাই না আমি। শুধু এটুকু জেনো, দুঃস্বপ্নের মত কতগুলো দিন কেটেছিল আমার। বোধবুদ্ধি হারাতে বসেছিলাম, সময়জ্ঞান ছিল না; ছিল শুধু অসহ্য শারীরিক কষ্ট। মৃত্যুভয় কাকে বলে, সেবারই প্রথম জানলাম। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, রানা, বাঁচব বলে ভাবতে পারিনি।'

'কিন্তু বেঁচে তো আছ। নিশ্চয়ই পালিয়েছিলে ওখান থেকে?'

দুর্বলভাবে হাসলেন চাচা। 'হ্যাঁ। বন্দিশালা আর ইন্টারোগেশন রুম বাদে আর একটা জায়গায় আমাকে যেতে দিত ওরা—বাথরুমে। পুরনো আমলের দুর্গের বাথরুম; দেয়ালগুলো ভেজা, স্যাঁসেঁতে। লক্ষ করলাম, একপাশের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে মরচে পড়া পানির পাইপ, লিক হয়ে দেয়ালটা ভিজিয়ে দিয়েছে একেবারে। দুর্বল হয়ে গেছে পাথরের জোড়াগুলো। সেটা লক্ষ করে ফন্দি এল মাথায়, বুঝতে পারলাম কীভাবে পালানো

সম্ভব। যতবার বাথরুমে গেছি, ততবারই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করেছি জয়েন্টগুলো। সত্যি বলতে কী, পালাবার ওই সম্ভাবনাটুকুই ঠিক রেখেছিল আমাকে, নইলে অত্যাচারের মুখে পাগল হয়ে যেতাম। যত কষ্ট হোক... যত অসুবিধে থাকুক, বাথরুমে গিয়েই কাজে নেমে পড়তাম, প্রহরীদের সন্দেহ না জাগিয়ে যতটা করা যায় আর কী। ওভাবেই এক রাতে দেয়াল থেকে খুলে আনলাম বড় সড় এক পাথর, ফোকর করে ফেললাম বেরুনোর মত।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা।

'ফোকর গলে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়লাম নিচে... বাথরুমের বাইরে দাঁড়ানো দুই প্রহরীর অজান্তে। কপাল ভাল, যেখান দিয়ে বেরিয়েছি, সেটা দুর্গের পিছনদিক। খুব বেশি পাহারা থাকে না ওদিকে। তা ছাড়া সে-রাতে তুষারপাত হচ্ছিল, প্রহরীরা কেউ টহল দিচ্ছিল না দুর্গের চারপাশে। তাই পালানোর ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই ঢুকে যেতে পারলাম জঙ্গলে। গা ঢাকা দিলাম। শত্রুরা পরে তল্লাশি চালাতে এসেছিল, তবে লুকোচুরি করে ফাঁকি দিয়েছি ওদের। ওরা হতাশ হয়ে চলে গেলে হাঁটতে শুরু করেছি। দিন তিনেক চলার পর পৌঁছেছি একটা গ্রামে। সেখান থেকে আমার ঊর্ধ্বতন অফিসারকে ফোন করলে তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে উদ্ধার করেন।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল রানা। চাচার কথা শেষ হলে বলল, 'দারুণ ব্যাপার! একেবারে গল্প-কাহিনির মত!'

'ব্যাপারটা মোটেই দারুণ নয়, রানা। ভয়ঙ্কর। এসব কথা কেউ জানে না, শুধু তোমাকেই বললাম।'

'কেন?'

'কী জানি!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাচা। 'হয়তো তুমি স্পাই হতে চেয়েছ বলে। এ-পেশার কঠিন দিকটা জানা থাকা উচিত

তোমার।'

'কঠিন হলেও,' রানা বলল, 'অফিসে কেরানিগিরির চেয়ে তো ভাল! আমি জীবনে ভিন্ন কিছু করতে চাই, চাচা। এমন কিছু, যার ছাপ রেখে যেতে পারি মানুষের মনে।'

'সেটা আরও অনেকভাবেই করা যেতে পারে।' উঠে দাঁড়ালেন চাচা। 'যাক গে, রাত অনেক হয়েছে। তুমি তো কাল ক্যাম্পিঙে যাবে, এসো দেখি কিছু সাহায্য করতে পারি কি না।'

রানাকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন তিনি। সুটকেস খুলে বের করে দিলেন ছোট একটা ফোল্ডিং নাইফ। বললেন, 'ক্যাম্পিঙের জন্য ছুরি খুব দরকারি একটা উপকরণ। এটা রাখো। আমার উপহার।'

'ধন্যবাদ, চাচা,' বলল রানা। ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। 'শুধু ছুরির জন্য নয়, সবকিছুর জন্য। গত কয়েকদিন খুব চমৎকার কেটেছে... বিশেষ করে মাছ ধরা আর ড্রাইভিং শেখাটা।'

'এগুলো আসলে তোমার বাবার কাছ থেকে শেখার কথা,' বললেন চাচা। 'ও নেই বলে আমি শেখাচ্ছি। মাঝে মাঝে খুব মিস করি ভাইয়াকে। তোমার জন্য খারাপ লাগে। বাবাকে প্রয়োজন ছিল তোমার, আমার মত একজন রোগীকে নয়।'

'কীসের রোগ?' খারাপ লাগাটা লুকিয়ে বলল রানা। 'আমার সঙ্গে যখন বেরোও, রোগের তো চিহ্ন দেখি না। বাড়াবাড়ির জন্য ফুপুর বকা খাও।'

হেসে ফেললেন চাচা। হাসিটা আচমকা থেমে গেল কাশি ওঠায়।

তাড়াতাড়ি চাচাকে ধরল রানা। সাবধানে বসিয়ে দিল বিছানায়। কাশি থামলে বলল, 'ক্যাম্পিং থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে সারাদিনের জন্যে মাছ ধরতে যাব আমি। নেবে?'

'নিশ্চয়ই নেব। তোমাকে পাকা মৎস্যশিকারি আর ড্রাইভার না বানিয়ে ছাড়ছি না।' পকেট হাতড়ে একটা লাইটার বের করলেন চাচা। 'এটাও নাও। আগুন জ্বালাতে কাজে দেবে।'

'তোমার লাগবে না?'

'আমার সিগারেট খাবার দিন শেষ,' উদাস গলায় বললেন চাচা। কণ্ঠে কী যেন মিশে আছে। রানার কাঁধে হাত রাখলেন। 'সাবধানে থেকো। ক্যাম্পিঙে গিয়ে আবার ব্যথা-ট্যথা পেয়ো না। তুমি ফিরলে চেষ্টা করে দেখব, নদী থেকে একটা বড়সড় স্যামন ধরা যায় কি না।'

সতেরো

পরদিন।

গিরিপথ থেকে বেরিয়ে থামল রানা। পিঠ থেকে ন্যাপস্যাক নামিয়ে বের করল বিনকিউলার। রেডকে বলল, 'তুমি যদি হ্যামার হতে, কোথায় ঘাঁটি গাড়তে?'

'কিথলির পাবে,' হালকা গলায় বলল রেড।

'ঠাট্টা না, আমি সিরিয়াস,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। চোখে বিনকিউলার ঠেকিয়ে জরিপ করল সামনের দৃশ্য।

নিথর হয়ে আছে হ্রদ। চারদিকে মাথা উঁচু করে রেখেছে ভয়ালদর্শন পাহাড়ের সারি। চূড়া ঢাকা পড়ে আছে মেঘে।

'গতদিন যখন এলাম, ডানপাশে কাউকে দেখিনি আমরা,'

বলল রেড।

'না,' রানা একমত হলো। 'ওদিকে তেমন কোনও আড়াল নেই। হ্যামার নিশ্চয়ই বামে কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল। নইলে ওকে দেখতে পেতাম।'

'তা হলে বামেই কোথাও ক্যাম্প করেছে সে।'

'হুঁ। চলো খুঁজে দেখি।'

ফেন্সের যেখানে মরা পশুপাখি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে চলে গেল ওরা। ফেন্স ঘেঁষে এগোতে থাকল বামদিকে। খানিক পর পৌঁছুল ঘন ঝোপঝাড় আর গাছগাছালি ছাওয়া একটা জায়গায়।

'দেখো,' আঙুল তুলে দেখাল রানা। ঝোপ কেটে সরু একটা রাস্তা করা হয়েছে। মাটিতে পড়ে আছে ডাল আর পাতা। 'সম্প্রতি কাটা হয়েছে। এখনও শুকোয়নি পুরোপুরি।'

'ভিতরে ঢুকে দেখবে?'

'হ্যাঁ। এসো।'

ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল দু'বন্ধু। জায়গাটা ছায়ায় ঢাকা। বাতাসে ভাসছে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। কিছুদূর যেতেই একটা খোলা জায়গা পাওয়া গেল—ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে নেয়া হয়েছে। ছড়ানো-ছিটানো ছাইয়েরও দেখা মিলল। আগুন জ্বালানো হয়েছিল বোধহয়, পরে সেটা নিভিয়ে লাথি দিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ছাইয়ের গাদা।

ভনভন করে মাছি উড়ছে, ক্ষণে ক্ষণে এসে বসছে গায়ে। চাপড় দিয়ে কয়েকটাকে মারল রানা, তারপর রেডকে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে হয়? হ্যামারের ক্যাম্প ছিল এটা?'

হাঁটু গেড়ে মাটি পরীক্ষা করছে রেড।

'তছনছ করা হয়েছে জায়গাটা,' বলল ও। 'তবে কতগুলো গর্ত দেখতে পাচ্ছি—তাঁবুর খুঁটির দাগ হতে পারে।' গোড়ালির

উপরে পোকা কামড়েছে, হাত দিয়ে চুলকাল জায়গাটা। 'হ্যামার যদি এখানে ক্যাম্প করেও থাকে, তার উপস্থিতি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কথা হলো, কে করেছে? হ্যামার নিজে, নাকি অন্য কেউ?'

গম্ভীর হয়ে আশপাশে চোখ বোলাল রানা। কী যেন ঝিলিক দিচ্ছে ঝোপের মাঝে। একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনল জিনিসটা।

'আরে!' বিস্মিত গলায় বলল রেড। 'এ তো হ্যামারের বিনকিউলার!'

মাটিতে মাখামাখি হয়ে আছে বিনকিউলার, কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই। গায়ে খোদাই করা আছে হ্যামারের নামের আদ্যক্ষর। মাটি মুছে পরীক্ষা করল রানা, জিনিসটা অক্ষত।

'যেখানেই যাক, এ-জিনিস ফেলে যাবার কথা নয় হ্যামারের,' রেড বলল।

'ঠিক,' সায় জানাল রানা। 'কোথাও গড়বড় হয়ে গেছে।'

একপাশের ঝোপ নড়ে উঠল হঠাৎ করে। চমকে উঠল দু'বন্ধু। স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল ওদিকে। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। বুনো কোনও প্রাণী বোধহয় ছুটে গেছে ওখান দিয়ে।

'চলো কেটে পড়ি,' কাঁপা গলায় বলল রেড। 'ভৌগতিক সুবিধের ঠেকছে না আমার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। দু'জনে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। ছায়া থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যদিও রোদ নেই। ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। বৃষ্টি নামবে কি না কে জানে।

'এখানটা নিরাপদ নয়,' রানা বলল। 'সহজেই হ্যামারের ক্যাম্পসাইট খুঁজে পেয়েছি আমরা, লর্ড গ্রিফিনের প্রহরীরাও নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছে। যা দেখে এলাম, তা ওদেরই কাণ্ড কি না

কে বলতে পারে? অন্য কোথাও ক্যাম্প করতে হবে আমাদেরকে।'

'এখানে তাঁবু খাটানোর কোনও ইচ্ছেও নেই আমার,' বিরক্ত গলায় বলল রেড। 'যত দেখছি, ততই অপছন্দ হচ্ছে বনজঙ্গল। তারচেয়ে ইঁট-পাথরের বাড়ি অনেক ভাল।'

'এখানে বাড়ি বলতে আছে শুধু ওই দুর্গটা,' গ্রিফিন কাসলের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখানে নিশ্চয়ই রাত কাটাতে চাও না?'

'আদৌ রাত কাটাব কি না তা-ই ভাবছি। সন্ধের আগেই ফিরে গেলে কেমন হয়?'

রানার মনের ভীতু অংশটা সায় দিতে চাইল, কিন্তু দুঃসাহসী অংশটা প্রতিবাদ করে উঠল ভীষণভাবে। ওটারই জিত হলো।

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'খালিহাতে ফিরে যাবার জন্য এতদূর আসিনি আমরা। চলো দুর্গের দিকে যাই। ওখানকার পরিস্থিতি দেখা দরকার। তা হলে পরের পদক্ষেপ ঠিক করতে সুবিধে হবে।'

'তোমার কথাই শিরোধার্য, মেইট!' বাঁকা সুরে বলল রেড। মনে মনে হতাশ হয়েছে।

গতদিনের পথ ধরে হাঁটতে থাকল দু'জনে। দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে তিনদিক ঘেরা সেই জায়গাটায় আশ্রয় নিল। হ্যামারের বিনকিউলার পাওয়ায় দুটো বিনকিউলার এখন ওদের কাছে, দুটোই চোখে লাগিয়ে তাকাল দুর্গের দিকে।

সবকিছু নিথর, নিস্তব্ধ। কিছুই ঘটছে না। সেন্ট্রিবক্সে রাইফেল হাতে অলসভাবে বসে থাকা প্রহরী ছাড়া আর কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

একটু পরেই অধৈর্য হয়ে উঠল রেড। বলল, 'অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা। এভাবে বসে থাকলে কোনও কাজই হবে না। কী

করতে হবে, জানো?'

'কী?' ভুরু নাচাল রানা।

'ওখানে ঢুকতে হবে আমাদেরকে। ঘুরেফিরে দেখতে হবে ভিতরটা।'

'চাইলেই ঢুকতে দেবে ভেবেছ?'

'ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে কে?'

'চুরি করে ঢুকবে? সেটা বিপজ্জনক নয়?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রেড। 'কিন্তু তুমিই তো বললে, এতদূর এসে খালিহাতে ফিরতে রাজি নও তুমি। এখানে বসে থাকলে তা-ই ঘটবে। কিছুই জানতে পারব না আমরা।'

'তাই বলে চুরি করে ঢুকব আরেকজনের বাড়িতে? এসবের অভিজ্ঞতাও নেই আমাদের...'

'কে বলেছে নেই?' রানাকে থামিয়ে দিল রেড। মুখে রহস্যময় হাসি।

কথাটার অর্থ বুঝতে এক সেকেণ্ড লাগল রানার। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হলো ওর দৃষ্টি। 'হায়, খোদা! শুধু পকেটমার নও... মানুষের বাড়িতে চুরিও করো তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রেড। 'অবস্থার চাপে পড়ে বেশ কয়েকবার করতে হয়েছে, তোমার কাছে অস্বীকার করব না। কিন্তু আমি পেশাদার চোর নই।'

'চোর তো! অ্যামেচার না প্রফেশনাল, তাতে কী এসে-যায়?'

'আহ্! কেন বাজে কথায় সময় নষ্ট করছ? পেটের দায়ে চুরি আর লোভের বশে চুরির মধ্যে পার্থক্য আছে না? বাদ দাও ওসব। আসল কথা হলো, আঁধার নামার পরে তোমাকে নিয়ে গোপনে দুর্গে ঢুকতে পারব আমি। কেউ কিছু টের পাবার আগে বেরও হয়ে আসতে পারব।'

'এতই সহজ?'

'হুঁ। ফেন্স কীভাবে পেরুব, সেটাই শুধু ভেবে বের করতে হবে।'

তখুনি একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। কাঁচা রাস্তার দিকে বিনকিউলার ঘোরাল দু'বন্ধু।

'পুলিশের গাড়ি,' ফিসফিসিয়ে বলল রেড।

সত্যিই তাই। কালো রঙের একটা স্কোয়াড কার ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে দুর্গের দিকে। ভিতরে দু'জন আরোহী। ফটকের কাছে এসে হর্ন বাজাল। সেন্ট্রিবক্স থেকে প্রহরীকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ঝুঁকে কিছু বলল সে, তারপর খুলে দিল ফটক। কজওয়ে ধরে পার্কিং এরিয়ায় গেল গাড়ি। থামল। দরজা খুলে নেমে এল দু'জন ইউনিফর্মধারী পুলিশ অফিসার। প্রথমজন যুবক, হালকা-পাতলা গড়নের। অন্যজন বয়স্ক, মোটা। ইউনিফর্ম ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে চাইছে তার থলথলে ভুঁড়ি।

'নিশ্চয়ই সার্জেন্ট মরো,' লোকটাকে দেখিয়ে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রেড। 'কিথলিতে দেখেছি। এর কথাই তোমাকে বলেছে পেনি।'

সেতুর দিকে এগোচ্ছে দুই পুলিশ। ওপাশে, পানির ধারে জটলা করছে কয়েকজন মানুষ। কখন এরা উদয় হলো, খেয়াল করেনি রানা বা রেড। সার্জেন্ট ও তার সহকারী সেতু পেরোতেই খুলে গেল দুর্গের দরজা। বেরিয়ে এলেন লর্ড গ্রিফিন। এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন দুই পুলিশ অফিসারকে। সার্জেন্ট মরোকে গদগদ হয়ে যেতে দেখল ওরা। লর্ড গ্রিফিন কী যেন বলতেই সঙ্গীকে নোট নেবার জন্য ইশারা করল। তাড়াতাড়ি নোটবুক আর পেন্সিল বের করল তরুণ অফিসার। লর্ড গ্রিফিন পানির দিকে ইঙ্গিত করে কথা বলতে থাকলেন, ঝড়ের বেগে সেসব টুকে নিল সে।

হঠাৎ চড়া গলায় ডাক শোনা গেল জটলা থেকে। তাড়াতাড়ি

সেদিকে এগোলেন লর্ড গ্রিফিন ও দুই পুলিশ অফিসার। বোটহুক দিয়ে পানিতে কী যেন খোঁচাচ্ছিল একজন, তাঁরা কাছে আসতেই জিনিসটা টেনে তুলল ডাঙায়।

একটা লাশ!

'হা, যিশু!' আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ করল রেড। 'রানা, তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

জবাব দিল না রানা। বিনকিউলারের ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে দৃশ্যটা খুঁটিয়ে দেখছে ও।

লাশটা মোটাসোটা একজন মানুষের। সারা গায়ে সবুজ রঙের কী যেন লেপ্টে রয়েছে, পোশাকটা ছিন্ন-ভিন্ন। তারপরেও চেনা যাচ্ছে বেশভূষা। চেনা যাচ্ছে গোড়ালিতে আটকানো সাদা হাতলঅলা পিস্তলের অবয়বটাও।

'হ্যামার,' থমথমে গলায় জানাল রানা।

'আরে! বেঁচে আছে তো!' বলে উঠল রেড।

ব্যাপারটা তেমনই দেখাল। নড়াচড়া করছে আমেরিকান ডিটেকটিভের হাত-পা। কিন্তু সেটা দেখামাত্র লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ভিড়ের মানুষগুলো। কেউ কেউ চেপে ধরল নাকমুখ। লোকগুলো সরে যাওয়ায় রানাও ভাল করে দেখতে পেল দেহটা। তবে না দেখলেই বুঝি ভাল হতো।

হ্যামার জোন্সের চেহারা দেখল ও। তবে ওটাকে আর মানুষের চেহারা বলে চেনার উপায় নেই। চামড়া-মাংস সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে, উঁকি দিচ্ছে ধবধবে সাদা হাড়। খেয়ে ফেলা হয়েছে মুখের সব মাংস! কীসে খেয়েছে, তাও দেখা গেল। রানার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে হ্যামারের হাঁ করা মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা বিশাল ঈল, আছড়ে পড়ল মাটিতে। তারপর সাপের মত পিছলে নেমে গেল পানিতে।

ওই একটাই নয়। হাত-পা-গলা... সব জায়গাতেই হ্যামারকে

পেঁচিয়ে ধরেছে ঈল। বোটহুক হাতে লোকটা খোঁচা দিতেই খুলে গেল কোট, দেখা গেল লাশের সারা গায়েই কিলবিল করছে বীভৎস ঈলের দল। ওদের নড়াচড়ার কারণেই লাশটা নড়ছে বলে মনে হচ্ছিল।

হতভাগ্য মানুষটার জন্য করুণা হলো রানার। এমন ভয়াবহ মৃত্যু কারও প্রাপ্য নয়।

দুর্গের লোকেরা সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেছে। তরুণ অফিসারটিকে দেখা গেল একপাশে সরে গিয়ে বমি করছে। সার্জেন্ট মরোও মুখের কাছে হাত তুলে রেখেছে। রানারও বমি বমি লাগছে, কিন্তু চোখ থেকে নামাল না বিনকিউলার। লর্ড গ্রিফিনের প্রতিক্রিয়া দেখতে চায় ও।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক, এক চুল নড়েননি। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন খুবলে খাওয়া লাশের দিকে। চেহারায় ঘৃণা, বিবমিষা, দুঃখ, করুণা কিছুই নেই। বরং মনে হলো এক ধরনের চাপা আনন্দ অনুভব করছেন। আশ্চর্য!

এবার বিনকিউলার নামাল রানা। রেডের দিকে ফিরতেই দেখল, ওর বন্ধুটিও একদিকে উবু হয়ে বমি করছে। অগত্যা পিছিয়ে এল ও। চোখ মুদল। চেষ্টা করল মনের ক্যানভাস থেকে হ্যামার জোন্সের বীভৎস ছবিটা মুছে ফেলতে।

পারল না। পারবেও না কোনোদিন।

আঠারো

পরের কয়েক ঘণ্টায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটল না।

লুকিয়ে থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেখেছে ওরা। তার আগেই অবশ্য লাশের শরীর ছেড়ে পানিতে ফিরে গেছে ঘাতক ঈলগুলো। বাধা দেয়নি কেউ। যে-ক'টা রয়ে গিয়েছিল, সেগুলোকেও খুঁচিয়ে তাড়ানো হয়েছে। তারপরেও বিকৃত লাশ দেখে অ্যাম্বুলেন্সের দুই অ্যাটেনডেন্টকে সন্ত্রস্ত হতে দেখেছে রানা। প্রায়-কঙ্কালে পরিণত হওয়া দেহটা বডিব্যাগে ভরেছে তারা, স্ট্রেচারে করে উঠিয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে। ফিরে গেছে যেখান থেকে এসেছে সেখানে।

সার্জেন্ট মরো ও তার তরুণ সহকারী দুর্গের ভিতরে গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, তারাও চলে গেছে ঘণ্টাখানেক পর। দুর্গ ও তার চারপাশের পরিবেশ ফিরে গেছে আগের অবস্থায়—নিথর, নিস্তব্ধ। প্রহরী ছাড়া আর কোনও মানুষ থাকেনি বাইরে।

শেষ পর্যন্ত লুকানোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রানা ও রেড। হ্যামারের প্রাক্তন ক্যাম্পসাইট এড়িয়ে দূরে আরেকটা সুবিধেজনক জায়গা খুঁজে নিয়েছে—এক গুচ্ছ বার্চ গাছের মাঝে, পাহাড়ের গোড়ায়। উপর দিকে ছাতের মত একটা পাহাড়ি চাতাল থাকায় চমৎকার একটা আশ্রয়। রোদ কিংবা বৃষ্টির ঝাপটা লাগবে না সরাসরি। সহজে কেউ দেখতেও পাবে না ওদের।

‘এই নাও তোমার জুতো,’ বলল রেড। ‘দেখো পছন্দ হয় কি না।’

জুতোর পাটিটা হাতে ধরে ভাল করে দেখল রানা। হাসল। ‘দারুণ কাজ করেছ, কবলার ভাই!’

‘কী বললে? আমি মুচি?’ কপট রাগ দেখাল রেড। ‘যাও, আর কোনও কাজ করে দেব না তোমার।’

আধঘণ্টা ব্যয় করে রানার জুতোর হিলে একটা গোপন খুপরি বানিয়েছে ও—ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে ফাঁপা করে নিয়েছে হিল। সেখানে রানার ফোল্ডিং নাইফটা ঢুকিয়ে ফের লাগিয়ে দিয়েছে সুকতলা। আইডিয়াটা অবশ্য রানারই—গল্প-উপন্যাসে পড়েছে, নায়কদের জুতোর ভিতর অস্ত্র লুকানো থাকে... বিপদের সময় কাজে দেয় সে-অস্ত্র। এখানেও ওরা একটা বিপজ্জনক কাজেই এসেছে। হ্যামার জোন্সের মৃতদেহ দেখবার পর ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে আরও।

সূর্য ডুবে গেছে ইতিমধ্যে। জুতোটা পায়ে গলিয়ে ফিতে বাঁধল রানা। রেডকে জিজ্ঞেস করল, ‘কখন যাবে?’

‘আঁধার আরেকটু নামুক,’ বলল রেড।

‘বেশ। হাতে কিছুটা সময় আছে মনে হচ্ছে, আমাকে খালিহাতে লড়াইয়ের নিয়মকানুন শেখাবে? কাজে লাগতে পারে।’

‘লড়াইয়ের আসলে কোনও নিয়মকানুন নেই, দোস্ত,’ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল রেড। ‘লড়াই তুমি করবে জেতার জন্য। নিয়ম-টিয়মের কথা ভুলে যাও, সবকিছুই চলে এসব ক্ষেত্রে—লাথি, ঘুষি, কামড়, খামচি, চিমটি... যখন যেটা পারো। কত দ্রুত প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারো, সেটাই তোমার লক্ষ্য। শরীরের দুর্বল জায়গাগুলোয় আঘাত করবার চেষ্টা কোরো, মানে চোখ, নাক, তলপেট আর...’ একটু হাসল সে, ‘...যেখানে

আঘাত করলে সবচেয়ে বেশি ব্যথা পায় পুরুষমানুষ।'

'দু'পায়ের মাঝখানে?' চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এগজ্যাক্টলি। ঠিকমত যদি মারতে পারো, অন্তত কয়েক ঘণ্টা আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না সে।'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'তবে লড়াই জয়ের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন কোন্‌টা, জানো? ভয়কে জয়।'

'কীসের ভয়? ব্যথা পাবার?'

'উঁহুঁ, ব্যথা দেবার! আরেকজন মানুষকে পেটাতেও যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়, রানা। কারণ তার জন্য একটু হলেও মানবীয় গুণাবলী বিসর্জন দিতে হবে তোমাকে। সচেতনভাবে সেটা পারে না বেশিরভাগ মানুষই। এজন্যেই মাতালরা সবচেয়ে বেশি মারামারি করে, বিবেক বা চেতনা কাজ করে না ওদের।' হাসল রেড। 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি মারামারি এড়িয়ে চলতে পারো। তবে সেটা সম্ভব হবে না অনেক ক্ষেত্রে। আর তখন ভয়টা ঝেড়ে ফেলে হামলা চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'হুম। লেকচার তো অনেক হলো, এবার হাতে-কলমে কিছু দেখাবে?'

'এসো।'

কয়েকটা কৌশল রানাকে দেখিয়ে দিল রেড—কীভাবে কাউকে ছুঁড়ে ফেলতে হয়, পিছন থেকে কেউ জাপটে ধরলে কীভাবে ছাড়া পেতে হয়, কীভাবে হাতে ব্যথা না পেয়ে ঘুষি মারা যায়, ইত্যাদি। পরের এক ঘণ্টা সেসবের প্র্যাকটিস চলল।

ততক্ষণে নেমে এসেছে রাতের আঁধার। আকাশে মুখ দেখাতে শুরু করেছে উজ্জ্বল তারা। চাঁদের আবছা আলোয় ফিকে হয়ে আছে সিলভারব্যাক লেক ও তার আশপাশ।

'এবার রওনা হওয়া যায়,' জানাল রেড।

'ফেন্স কীভাবে পেরুবে, কিছু ভেবেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। হ্যামার কোথা দিয়ে ঢুকেছিল, তা খুঁজে লাভ নেই। এতক্ষণে সে-জায়গা মেরামত করে নিয়েছে ওরা।'

'তা হলে?' জ্বালিয়ে-নিভিয়ে টর্চ পরীক্ষা করল রানা।

'ট্রাকগুলো আছে না?'

'মানে?'

'প্রায়ই আসা-যাওয়া করে ওগুলো। একটায় উঠে লুকিয়ে থাকব। ওটাই আমাদেরকে নিয়ে যাবে কম্পাউণ্ডের ভেতরে।'

'ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যায় না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু উপায় কী? ওয়্যায়ার কাটার নেই আমাদের সঙ্গে, বেড়া কাটতে পারছি না। কোদাল-শাবলও নেই যে তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ব। তারচেয়ে ট্রাকে উঠে হাওয়া খেতে খেতে ভেতরে যাওয়াই কি ভাল নয়? কেউ তো আর আশা করছে না আমাদেরকে।'

উত্তেজনা অনুভব করল রানা। দ্রুততর হয়ে উঠেছে হৃৎস্পন্দন। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় উন্মুখ। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও।

'তা হলে আর দেরি করে লাভ কী? চলো।'

চল্লিশ মিনিট লাগল পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে কম্পাউণ্ডের পিছনের গেটের কাছে পৌঁছুতে। উঁচু খাম্বার ডগায় ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে ভিতরটা দিনের আলোর মত আলোকিত করে রাখা হয়েছে।

আশপাশের এলাকা স্কাউটিঙের জন্য চলে গেল রেড, রানা উঠল একটা গাছের মগডালে, ফেন্সের ওপাশে কী ঘটছে দেখবে। একটু পর ফের একত্র হলো দু'জনে।

'কম্পাউণ্ডে অনেক মানুষ। ব্যস্ত। আসছে-যাচ্ছে সারাক্ষণ।'

রানা জানাল। 'ট্রাক যে-ক'টা দেখলাম সব পার্ক করা। রাতে সম্ভবত আর বেরুবে না। এবার তুমি কী দেখলে বলো।'

ওকে তারকাঁটার ফেন্সের কাছে নিয়ে গেল রেড। আঙুল তুলে বলল, 'নালাটা দেখতে পাচ্ছ? রাস্তার পাশ দিয়ে গেছে ওটা, একেবারে গেট পর্যন্ত। ওখানে নামলে কেউ দেখতে পাবে না আমাদের। হামাগুড়ি দিয়ে গেট পর্যন্ত চলে যেতে পারব। এরপর কোনও ট্রাক থামলেই...'

'ট্রাক যদি না আসে?'

'তা হলে অন্য কিছু ভাবা যাবে। চলো।'

যতদূর পারে, রাস্তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল দু'বন্ধু। এরপর লুকিয়ে পড়ল উঁচু একটা মাটির ঢিবির আড়ালে। ট্রাক আসার অপেক্ষায় রইল।

এক ঘণ্টা পেরুল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে থাকতে হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে যাবার জোগাড়। বেশি নড়াচড়াও করা যাচ্ছে না, গেটহাউস থেকে ওদেরকে দেখে ফেলতে পারে প্রহরী। ফিরে যাবে কি না ভাবছিল, এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল ভারী ইঞ্জিনের গুঞ্জন আর চাকার চড়চড় শব্দ।

হাসি ফুটল রেডের মুখে। জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

'কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'ভাববার যথেষ্ট সময় তো পেয়েছ।'

'একটু বেশিই সময় পেয়েছি। কুফলগুলো দেখতে পাচ্ছি তাই।'

'দূর! তুমি থাকো তোমার কুফল নিয়ে।' আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত নালায় নেমে পড়ল রেড। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রানাও ওর পিছু নিল।

মোটামুটি গভীর নালা, তলায় ইঞ্চি চারেক পানি। উপুড়

হতেই ভিজে গেল শরীরের সামনের দিক। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করল না দু'বন্ধু, হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগোতে থাকল গেটের দিকে। একটু পরেই মাথার উপরে শোনা গেল ভারী চাকা গড়াবার আওয়াজ, ফটকের সামনে পৌঁছে থেমে দাঁড়াল ট্রাকটা। দরজা খুলে নেমে পড়ল ড্রাইভার। তার পরিচয় নিশ্চিত হবার জন্য গেটহাউস থেকে বেরিয়ে এল একজন প্রহরী।

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা আর রেড। মাথা তুলে দেখে নিল দৃশ্যটা। গার্ড আর ড্রাইভার কথা বলায় ব্যস্ত, গুমগুম আওয়াজে কান ঝালাপালা করছে আইড্‌লে রাখা ইঞ্জিন।

'অপেক্ষা করো,' বলে উঠে পড়ল রেড। লাফ দিয়ে উঠল রাস্তায়। এক ছুটে চলে গেল ট্রাকের পিছনে। একটু পর হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে।

ইতি-উতি তাকিয়ে রানাও ছুট লাগাল, পাশে চলে এল বন্ধুর। ট্রাকের পিছনটা ফ্ল্যাপ নামিয়ে ঢাকা, বাঁধন খুলে সামান্য একটু ফাঁক করল রেড। দু'জনে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ট্রাকের পিছনে ছোট-বড় নানা আকারের অনেকগুলো বস্তা রাখা। একটার মুখ খুলে দেখল রানা—আলু। অন্যগুলোতেও খাবার-দাবার আনা হয়েছে বলে মনে হলো। আর সময় নষ্ট করল না ওগুলোর পিছনে। মেঝেতে শুয়ে গায়ের উপর টেনে নিল কয়েকটা হালকা বস্তা। এখন আর ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিলেও দেখা যাবে না ওদের।

একটু পরেই আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়ল কম্পাউণ্ডে। রানার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল রেড, কিন্তু রানা অতটা খুশি হতে পারছে না। কাজটা বোকামিই হলো বোধহয়... কাসল গ্রিফিনে হানা দেয়া... কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কম্পাউণ্ডে ঢোকার কয়েক মিনিট পরেই আবার থেমে গেল

ট্রাক। চুপ হয়ে গেল ইঞ্জিন। গন্তব্যে পৌঁছে ইগনিশন বন্ধ করে দিয়েছে ড্রাইভার। দরজা খুলে ক্যাব থেকে তার নামার শব্দ পেল ওরা। শোনা গেল কয়েকটা কণ্ঠ আর হাসির আওয়াজ। একটু পর সরে গেল পিছনের ফ্ল্যাপ, ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে গেল ট্রাকের পিছনটা।

'ওরে, বাবা, অনেক বস্তা দেখছি!' বলে উঠল একটা কণ্ঠ, স্কটিশ উচ্চারণে কথা বলছে।

'রাতের বেলা এত সব বস্তা টানতে পারব না, বাপু,' বলল আরেকজন। এ আমেরিকান। 'সকালে আনলোড করলেই চলবে। তখন আরও লোক পাওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছ।'

ফ্ল্যাপ নামিয়ে চলে গেল লোকদুটো।

বস্তা সরিয়ে উঠে বসল রেড। 'বাঁচা গেল,' বলল ও। 'চলো এখান থেকে ভাগি... ওরা মত পাল্টে ফিরে আসার আগেই।'

ফ্ল্যাপ সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা আর রেড। বড় একটা শেডের তলায় পার্ক করা হয়েছে ট্রাক। আরও কয়েকটা ট্রাক, কার আর মোটরসাইকেল রয়েছে ওদের পাশে। পিছনের দেয়ালের কাছে স্তূপ করে রাখা হয়েছে বেশ কিছু বাক্স আর ক্রেট শেডের কাছে কেউ নেই। সন্তুষ্ট হয়ে দু'জনে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

ব্যস্ততা কিছুটা কমেছে কম্পাউণ্ডে। ফ্লাডলাইট এখন শুধু আলোকিত করে রেখেছে মাঝখানটা। দুর্গের পাশটা অন্ধকার। সুযোগ বুঝে ওদিকে ছুট লাগাল দু'জনে, চলে এল একটা নিচু বিল্ডিঙের ছায়ায়। বিল্ডিঙের দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে পৌঁছুল কম্পাউণ্ডের এক প্রান্তে।

আবার পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় ঝট করে খুলে গেল সামনের একটা দরজা। বিশালদেহী এক লোক বেরিয়ে এল, হাতে বালতি। আঁতকে উঠে দেয়ালে শরীর মিশিয়ে দিল রানা

ওরেড, হারিয়ে যেতে চাইল ছায়ায়। ওদের দিকে অবশ্য ফিরেও তাকাল না লোকটা, হাতের বালতি থেকে নোংরা পানি ছুঁড়ে ফেলল বাইরে, তারপর ফের বিল্ডিঙে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

একটু পরেই বিল্ডিঙের সারি পেরুল দু'বন্ধু, পৌঁছুল একেবারে অন্ধকার একটা জায়গায়। ওখানে কোনও বাতি জ্বলছে না। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল রানা, গলা শুকিয়ে কাঠ, যেন বালি খেয়েছে। আতঙ্ক আর উত্তেজনায় লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

'এভাবে দুর্গে ঢোকা যাবে না,' রেড বলল। 'লুকানোর একটা জায়গা দরকার। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তারপর বেরুব।'

'আমিও তা-ই ভাবছিলাম,' রানা বলল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুর্গের কালচে কাঠামোর দিকে। রাতের আঁধারে ভয়ঙ্কর লাগছে। কয়েকটা জানালায় আলো জ্বলছে, বাকিগুলো অন্ধকার।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে শুরু করল দু'জনে। আলোকিত জায়গাগুলো সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে। খানিক পর সামনে পড়ল একটা নিচু দেয়াল। বাতাসে ভাসছে পশুর গন্ধ।পাহাড়ি চাতাল থেকে দেখা খোঁয়াড়ের কথা মনে পড়ল রানার—এটা সেই জায়গা। কথাটা রেডকে জানাল।

'হুঁ। দেখতে চাও ভিতরটা?' জিজ্ঞেস করল রেড।

'হ্যাঁ। কী ধরনের জানোয়ার পালছে এরা, জানা দরকার। আর কিছু না হোক, লুকানোর জায়গাও মিলতে পারে।'

'গুড আইডিয়া।' এক লাফে দেয়াল টপকাল রেড। পরমুহূর্তে অস্ফুট গলায় গাল দিয়ে উঠল।

'কী হলো?'

'সাবধানে এসো। কীসে যেন পা পড়েছে আমার। কী দুর্গন্ধ রে, বাবা! ওয়াক!'

দেয়ালে উঠে মাটির দিকে তাকাল রানা। আবছা আলোয় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা পশুর মল চোখে পড়ল। তারই একটায় পা

পড়েছে রেডের। সবকিছু ভুলে ফিক করে হেসে ফেলল।

'খবরদার, হাসবে না!' শাসাল রেড।

'ঠিক আছে,' হাসি চেপে সাবধানে দেয়াল থেকে নামল রানা। খোঁয়াড়ের পিছনের ছাউনি থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ আসছে। বুঝে ফেলল কী রাখা হয়েছে এখানে। শুয়োর... এটা শুয়োরের খোঁয়াড়।'

'নোংরা জানোয়ার!' গাল দেবার ভঙ্গিতে বলল রেড। দেয়ালের গায়ে পা মুছছে। 'দু'চোখে দেখতে পারি না।'

আর তখুনি শোনা গেল কাশির আওয়াজ। কে যেন খোঁয়াড়ের দিকে আসছে। রেডের হাত ধরে টান দিল রানা, ছাউনির পাশে গিয়ে থামল, লুকাল বেড়ার আড়ালে। একটু পর খুলে গেল খোঁয়াড়ের গেট, একজন মানুষ ঢুকল ভিতরে। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, তবে কুঁজো হয়ে হাঁটার ভঙ্গি দেখে চিনতে অসুবিধে হলো না। সেদিনের সেই বানর-মানব... লর্ড গ্রিফিন আর ড্যানির সঙ্গে একে দেখেছিল রানা।

মদ খেয়ে এসেছে লোকটা, হেলেদুলে ছাউনির সামনে এসে থামল। জড়ানো গলায় বলল, 'আমি এসে গেছি, শুয়োরের বাচ্চারা!' হাসল কথাটা বলে। তারপর ঢুকে পড়ল ছাউনিতে।

ভিতর থেকে হুটোপুটির শব্দ ভেসে এল। মিনিটখানেক পর ছাউনি থেকে বেরুল লোকটা, হাতে একটা শুয়োরছানা ধরে রেখেছে—পা ছুঁড়ছে ওটা। আর্তনাদের মত আওয়াজ করল ওটার মা, বাকি বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে এল লোকটার পিছু পিছু। ওদেরকে দেখে খেপে গেল লোকটা। গাল দিয়ে উঠল, 'যা ভাগ!'

লাথি মারল সে। মা-শূকরের মাথার একপাশে লাগল আঘাত। কাতরে উঠে পিছিয়ে গেল প্রাণীটা। কিন্তু তাতে সাধ মিটল না লোকটার। সজোরে আরেক লাথি হাঁকাল একটা বাচ্চাকে লক্ষ্য করে। উড়ে গেল ওটা, আছড়ে পড়ল দেয়ালের

গায়ে। মাটিতে পড়ে আর নড়ল না।

এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় শুয়োরছানাটাকে পরীক্ষা করল বানর-মানব। মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। বিশ্রীভাবে হেসে উঠল সে। আপনমনে বলে উঠল, 'বাহ্! এক ঢিলে দুটো! খাওয়া আজ ভালই জমবে।'

অন্যহাতে দ্বিতীয় ছানাটার লাশ তুলে নিল লোকটা, শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল খোঁয়াড় থেকে।

বেড়ার আড়াল থেকে সবকিছু দেখেছে দু'বন্ধু। বানর-মানব বেরিয়ে যেতেই গজগজ করে উঠল রেড, 'জানোয়ার কোথাকার!'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখানে থাকা নিরাপদ না। আবার আসতে পারে লোকটা।'

'হুঁ। চলো বেরোই।'

খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। আর কোনও ঘটনা ছাড়াই পৌঁছুল লেকের পাড়ে। ওপাশে লর্ড গ্রিফিন আর দুর্গ। দূরত্ব বেশি নয়, সাঁতার কেটে পার হতে এক মিনিটও লাগবে না; কিন্তু কালো পানির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিভরে রেড বলল, 'আমি ওখানে নামতে পারব না।'

'আমিও না,' রানা সুর মেলাল। 'রাক্ষুসে ঈল থাকতে লর্ড গ্রিফিন কেন যে এত পাহারাদার রেখেছেন কে জানে। অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য ওগুলোই তো যথেষ্ট।'

'ঈলের কথা আর মনে করিয়ে দিয়ো না। জীবনে আর কোনোদিন একটা ঈলও দেখতে চাই না আমি, খাওয়া তো দূরের কথা।'

ডানদিকে চোখ গেল রানার। লেকের পাড়ে অনেকখানি জায়গা তার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে—আবর্জনা ফেলা হয় ওখানে। স্তূপ হয়ে থাকা কাগজের বাক্স, খালি টিন আর ভাঙা কাঁচের বোতলের মাঝে মাথা তুলে রেখেছে একটা প্রাচীন,

মৃতপ্রায় পাইন গাছ—ঝুঁকে আছে পানির ওপর। এ-গাছটাও গতদিন দূর থেকে দেখেছে ওরা। তার দিয়ে ঘেরা জায়গার ওপাশে দেখা যাচ্ছে একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিঙের ধ্বংসস্তূপ।

'কী মনে হয়?' রেডকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'লুকানো যাবে ওখানে?'

'দেখতে দোষ নেই। চলো।'

ঘুরে বিল্ডিঙের কাছে চলে গেল দু'বন্ধু। একেবারেই ভগ্নদশা ওটার। সব জানালা ভাঙা, উপরতলার ছাত আর দেয়ালও ভেঙে গেছে অনেকখানি। কোনোমতে শুধু টিকে আছে নিচতলা। সদর দরজায় তালা দেয়া, তবে পাল্লার কাঠ পচে গেছে, ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলা গেল তালাসহ আংটা। ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল দরজা।

ভয়ার্ত চোখে আশপাশে তাকাল দু'জনে, মরচে পড়া কবজা এত আওয়াজ করবে ভাবেনি। কেউ শুনে ফেলেনি তো? নীরবতায় কাটল কয়েক মিনিট। কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না... উদয় হলো না কোনও প্রহরী। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাঙা বিল্ডিঙে ঢুকল দু'জনে।

নিচতলার ছাতও ভেঙে গেছে বেশিরভাগ জায়গায়, অক্ষত আছে শুধু একটা কোনায়। নানা রকম খালি বাক্স আর বস্তা পড়ে রয়েছে যত্রতত্র, মরচে ধরা লোহালক্কড়ও রয়েছে তার মাঝে—বিল্ডিংটা আরেক আঁস্তাকুড়। বস্তা আর বাক্স সাজিয়ে অক্ষত ছাতের নিচে একটা আড়াল বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জন—ওখানেই লুকাবার ইচ্ছে। কিন্তু কয়েকটা বাক্স সরাতেই মেঝেতে একটা ট্র্যাপডোর আবিষ্কার করল রানা। রেডকে ডেকে দেখাল ওটা।

প্রথমবারের মত টর্চ জ্বালানো হলো, ট্র্যাপডোর খুলে নিচে উঁকি দিল ওরা। দেখতে পেল মাটির নিচের সেলার—কতকাল

কারও পা পড়েনি কে জানে। তবে জায়গাটা উপরের তুলনায় সুরক্ষিত, ধুলোবালি ছাড়া জঞ্জালও নেই তেমন। তাই ওখানেই লুকানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

নিচে নেমে ধুলোবালি যতটা পারে পরিষ্কার করল দু'জনে। উপর থেকে বস্তা এনে মেঝেতে পাতল। শুয়ে পড়ল তার ওপর। টর্চ নিভিয়ে দিল রেড। ট্র্যাপডোর আগেই বন্ধ করা হয়েছে, আলো নেভাতেই ঘুটঘুটে আঁধারে ডুবে গেল সেলার।

'ভয় করছে, দোস্ত?' রানাকে জিজ্ঞেস করল রেড।

'না। অন্ধকারে ভয় করে না আমার।'

'বলো কী! অন্ধকারে ভূত-প্রেত থাকে, জানো না?' ভয় দেখাতে চাইছে রেড।

হাসল রানা। 'আলো ছাড়া ওরা আমাকে দেখবে কী করে? খুঁজে পাবে কীভাবে?'

'ভূতেদের আলো লাগে না।'

'না লাগুক। আমার তো লাগে। অন্ধকারে যেহেতু কিছুই দেখি না, অদেখা ভূতকে কেন ভয় পেতে যাব?'

গোঙানির মত আওয়াজ করল রেড। 'মাইরি বলছি, জীবনে এমন অদ্ভুত যুক্তি এই প্রথম শুনলাম।' হার মেনে চুপ করে গেল সে। একটু পর শোনা গেল তার ভারী নিঃশ্বাস। ঘুমিয়ে পড়েছে।

রানা ঘুমাতে পারল না। তন্দ্রায় চোখ মুদে এল কয়েকবার, কিন্তু বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল ছটফট করে। শেষে দুত্তোর বলে উঠে পড়ল। ঘুমানোর চেষ্টা করল না আর। বসে বসে ভাবল লর্ড গ্রিফিন, তার দুর্গ, ড্যানি, রডনি বাইলি আর লেকের ঈল নিয়ে।

ধীরে ধীরে গভীর হলো রাত। টর্চ জ্বেলে মাঝে মাঝে হাতঘড়িতে সময় দেখছিল রানা, সাড়ে বারোটা বাজলে ডেকে তুলল রেডকে। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল সে। জানতে

চাইল, 'ক'টা বাজে?'

'সাড়ে বারো।'

'হুম। তা হলে বেরুনো যায় এখন।'

ভাঙা বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। চারদিক সুনসান, জনমনিষ্যির সাড়া নেই। দূরে কম্পাউণ্ডের মাঝখানে জ্বলছে একটা ফ্লাডলাইট, দুর্গের সব জানালা অন্ধকার। মাথার উপর নিশাচর বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনল ওরা, শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে।

এদিক-সেদিক তাকাল রেড। বলল, 'কাউকেই তো দেখছি না। সেতু পেরিয়ে চলে যাবে নাকি? বলা যায় না, দুর্গের দরজা খোলাও পেতে পারি।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর রানা। পাইন গাছটার দিকে ইশারা করল—পানির উপর এতটাই ঝুঁকেছে ওটা, একপাশের ডালপালা পানি পেরিয়ে চলে গেছে দুর্গের দেয়ালের পাশে। দোতলার খোলা একটা জানালা দেখা যাচ্ছে ওখানে, বাইরে কার্নিশ আছে। 'ওই যে... ডাল বেয়ে কার্নিশে নামতে পারব আমরা। ওই জানালা দিয়ে ঢুকতে পারব দুর্গে।'

'ওখান পর্যন্ত পৌঁছাব কীভাবে?'

'কেন, গাছ বেয়ে!'

'বলিহারি তোমার বুদ্ধি! পড়ে গিয়ে ঘাড়টা ভাঙবে, বুঝলে?'

'মোটেই না। বেশি উঁচু না জানালাটা। এ-কথা বোলো না যে তুমি গাছ বাইতে পারো না।'

অপ্রতিভ হলো রেড। 'ড্রেনপাইপ বেয়ে চারতলায় উঠতে জানি আমি। কিন্তু... ইয়ে, যেখানে থাকি, সেখানে অত গাছপালা নেই কিনা...'

'তাতে সমস্যা নেই। ড্রেনপাইপ বাইতে পারলে গাছও পারবে। খুব সহজ। আমার পিছে পিছে থাকো।'

'আমি সিরিয়াস, দোস্ত,' বলল রেড। 'দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে...'

'দূর! কিচ্ছু হবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। নাকি নিচেই থাকবে?'

গাছের দিকে এগোল রানা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর পিছু নিল রেড।

গাছের প্রথম ডালটা বেশ উঁচুতে। লাফ দিয়ে ধরতে পারল না রানা। শেষে দু'হাত একত্র করে রেকাবের মত করল রেড, তাতে পা বাধিয়ে এক লাফে ডালে চড়ল ও। এরপর রেডকে টেনে তুলল উপরে। পরের ডালগুলোয় সহজেই চড়া গেল। একের পর এক ডাল বেয়ে ক্রমশ উপরে উঠে চলল দু'বন্ধু। খানিক পরেই টের পেল, গাছ আর জানালা... দুটোই যতটা ভেবেছে তার চেয়ে অনেক উঁচুতে।

পাইনের কড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে গাছটা। কাণ্ডের এখান-সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে রস, হাত মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে আঠালো সেই রসে। খুব অস্বস্তিকর। নিচু গলায় কয়েকবার গাল দিয়ে উঠল রেড। রানার মত স্বচ্ছন্দে উঠতে পারছে না ও, পারছে না হুবহু একই ডাল ব্যবহার করতে; যখন যে-ডাল কাছে পাচ্ছে, সেটাতেই হাত-পা বাধিয়ে উঠতে হচ্ছে তাকে।

বেশ কিছুদূর ওঠার পর থামল রানা। এতক্ষণ মোটামুটি সোজাই উঠেছে, কিন্তু এরপর থেকে ঝুঁকতে শুরু করেছে গাছটা পানির উপর। সাবধানে না এগোলে রাক্ষুসে ঈলে ভরা লেকে পড়তে হবে। ঘাড় ফিরিয়ে রেডের দিকে তাকাল। পাঁচ ফুট নিচে রয়েছে সে, কষ্টে-সৃষ্টে উঠে আসছে। তাকে একটা মরা ডালে পা রাখতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'থামো! ওটায় পা দিয়ো না, ভেঙে পড়বে। ডানপাশেরটায় পা দাও।'

ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে রেডকে। শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। বিড়বিড়

করে বলল, 'আর পারছি না, রানা।'

'পারবে,' তাকে সাহস জোগাল রানা। 'এই তো, আর একটু যেতে হবে। পৌঁছেই তো গেছি প্রায়।'

'কচু পৌঁছেছি!' মুখ ঝামটা দিয়ে পা সরাল রেড। রানার দেখিয়ে দেয়া ডালের বদলে পা ফেলল আরেকটা মরা ডালে। সঙ্গে সঙ্গে মড়াৎ করে আওয়াজ হলো।

'রেড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

তার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে, রেডের পায়ের তলা থেকে সরে গেছে অবলম্বন। পাগলের মত হাত ছুঁড়ল, ধরতে চাইল কোনও একটা ডাল... কিন্তু পারল না। ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে তার। গাছ থেকে পড়ে গেল সে।

উনিশ

পতনটা স্বাভাবিক নয়, ডালপালার সঙ্গে ঠোকর খেতে খেতে নিচে পড়ছে রেড। কিন্তু অবাক ব্যাপার, চেঁচাল না একবারের জন্যেও। চাইছে না ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাক। দাঁতে দাঁত পিষে প্রতিটা আঘাত সহ্য করল সে। একেবারে নিচে গিয়ে যখন জঞ্জালের উপর আছড়ে পড়ল, তখনই শুধু অস্ফুট একটা গোঙানি বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে।

তাড়াতাড়ি নিচে নামতে শুরু করল রানা। ওকে শেষ ডালটায় দেখতে পেয়েই হাত তুলল রেড। 'থামো! নেমো না! নামলে আর

উঠতে পারবে না।'

থমকে গেল রানা। যতটা পারে গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'কী অবস্থা তোমার? বেশি লেগেছে?'

'পা ভেঙেছে বোধহয়,' মুখ কুঁচকে বলল রেড। বেকায়দা ভঙ্গিতে জঞ্জালের স্তূপের মাঝে পড়ে আছে সে। ছিঁড়ে গেছে পোশাক। হাত আর মুখে বড় বড় কয়েকটা আঁচড় পড়েছে। 'অবস্থা ভাল না।'

'আমি তা হলে নামছি।'

'না!' ধমকে উঠল রেড। 'আমাকে ছাড়াই যাও তুমি। দ্বিতীয়বার এ-সুযোগ পাবে কি না সন্দেহ। আজ রাতেই দুর্গেরভেতর তল্লাশি চালাতে হবে।'

'কিন্তু তুমি?'

'এখানে কাঠের টুকরোর অভাব নেই, পায়ে স্প্লিন্টার বেঁধে নিচ্ছি। তুমি যতক্ষণ না ফিরছ, সেলারে লুকিয়ে থাকতে পারব।'

'সত্যিই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন যাও!'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল। ডাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে। এবার আর রেডের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না, তরতর করে বেশ দ্রুত এগোতে পারল। অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল পানির ওপরে ঝুঁকে থাকা অংশে। এদিকে ডাল সরু হয়ে এসেছে। সাবধানে চড়তে থাকল ও। একসময় পৌঁছে গেল দুর্গের খোলা জানালা বরাবর।

ওদিকে তাকিয়ে দমে গেল রানা। একটা ডাল কার্নিশের কাছাকাছি গেছে বটে, কিন্তু ওটা ওর ভার নিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। কী করা যায়? ভেবেচিন্তে একটাই পথ দেখল—আরও উপরে উঠতে হবে ওকে। ভাল একটা ডাল ধরে দোল খেয়ে নামতে হবে কার্নিশে। তা-ই করল। উঠে গেল আরও দশ ফুট।

ওখানেই পেল একটা মোটা ডাল। ডাল ধরে ঝুলে পড়ল ও, ঝাঁকি দিল দু'হাতে। একটু নিচু হলো ডাল, তারপর আবার উপরে উঠতে থাকল। দ্বিতীয় ঝাঁকি খেয়ে নামল ফের, এবার আগের চেয়ে একটু বেশি। পেণ্ডুলামের মত আচরণ করছে, তবে পাশাপাশি নয়, উপর-নিচে।

হঠাৎ পিছলে হাত ছুটে গেল রানার। আতঙ্কে রক্ত হিম হয়ে এল ওর, এখান থেকে পড়লে মরবে নির্ঘাত! পাগলের মত হাত ছুঁড়ল, নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল কার্নিশটা, মুঠো করে ধরল কিনার। ধড়াম করে দুর্গের দেয়ালে বাড়ি খেল ওর দেহ। ককিয়ে উঠল ব্যথায়। তবে প্রাণে বেঁচে গেছে। ওভাবেই ঝুলে রইল কিছুক্ষণ, ব্যথা সয়ে এলে পা নাড়ল, খুঁজে নিল পাথরের মাঝে একটা খাঁজ। ওতে পা বাধিয়ে একটু উঁচু হলো, হাত দিয়ে আরেকটু ভাল করে আঁকড়ে ধরল কার্নিশ। অন্য পা দিয়ে আরেকটা খাঁজ খুঁজে নিল, উঁচু হলো আরও। এবার দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে আসতে পারল কার্নিশে। জানালা গলে ঢুকে পড়ল অন্ধকার কামরাটায়। ভিতরে কী আছে জানে না, পরোয়াও করে না। মেঝের স্পর্শ পেতেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। বড় বাঁচা বেঁচেছে।

সত্যিই কি বেঁচেছে? নার্ভ শান্ত হলে উঠে বসল ও। বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। রেডের পা ভাঙায় বিপদে পড়েছে ও-ও। রাতের আঁধারে অচেনা বাড়িতে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস নেই ওর। তারচেয়েও বড় সমস্যা—এখান থেকে ফেরা। যে-পথে এসেছে, সে-পথে আর বেরুনো যাবে না। অন্য কোনও এগজিট খুঁজে নিতে হবে... আর সেটা কাউকে না জাগিয়ে।

উঠে দাঁড়াল রানা। জানালা দিয়ে আবছা আলো আসছে চাঁদের। সে-আলোয় সংকীর্ণ একটা করিডোর দেখতে পেল, চলে

গেছে দুর্গের গভীরে। দেয়ালে ঝুলছে নানা রকম পেইন্টিং। দু'সারি ওক কাঠের দরজা রয়েছে করিডোরের দু'পাশে।

একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে দুর্গের অভ্যন্তর, সমাধিমন্দিরের মত। কারও সাড়াশব্দ নেই, তারমানে রানার অনুপ্রবেশ টের পায়নি কেউ। প্রথম দরজাটার সামনে গিয়ে কান পাতল ও। কিছু শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চিন্ত হয়ে টানল লোহার ভারী ছিটকিনিটা। খুট করে শব্দ হলো, খুলে গেল দরজা। কামরায় ঢুকে পড়ল রানা। পকেট থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বালল।

পরমুহূর্তে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। টর্চের আলোয় দাঁতমুখ খিঁচানো একটা হিংস্র বাঘের মুখ ভেসে উঠেছে। একটুও নড়ল না ওটা। সাহস ফিরে পেয়ে ভাল করে দেখল রানা। জ্যান্ত নয় বাঘটা, স্টাফ করা। যত্নের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে। একটা পা নেই, পেট ফেটে বেরিয়ে এসেছে খড়কুটো।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে পুরো রুমে চোখ বুলাল রানা। আরও কিছু স্টাফ করা জানোয়ার দেখতে পেল। দুটো হরিণ, কয়েকটা শেয়াল, ধুলো পড়া কাঁচের কেবিনেটে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন জাতের পাখি... অযত্ন-অবহেলায় সবগুলোর একই দশা। জানালার কাছে একটা রেইলে ঝুলছে পোকায় কাটা কতগুলো পশমি কোট।

আরও কয়েকটা কামরা দেখল রানা। আন্দাজ করল, ওপরতলাটা স্টোরেজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কামরাগুলোয় বাতিল মালের স্তূপ—কাপড়চোপড়, ফার্নিচার, নষ্ট হয়ে যাওয়া পেইন্টিং, বাক্স, সিন্দুক, ইত্যাদি। শেষ দরজাটার ওপারেও তা-ই দেখবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু পাল্লা ফাঁক করে আলো ফেলতেই দেখা গেল ড্যানি গ্রিফিনের ঘুমন্ত মুখ। বিছানায় শুয়ে আছে সে।

তাড়াতাড়ি টর্চ নেভাল রানা। আলো পড়ার কারণেই কিনা কে

জানে, ঘুমের ভিতর বিড়বিড় করে উঠল ড্যানি। নড়েচড়ে পাশ ফিরল।

দেয়ালে শরীর মিশিয়ে মূর্তি হয়ে গেল রানা। ড্যানি চোখ মেললেই সর্বনাশ। তবে তেমন কিছু ঘটল না। খানিক পরেই আবার শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল ছেলেটার।

জানালার পাতলা পর্দা ভেদ করে ঘরে ঢুকছে আবছা আলো। চোখ সয়ে এসেছে রানার। দেখতে পেল কালো রঙের একটা বড় ওয়ার্ডরোব, একটা ডেস্ক, আর পুরনো আমলের এক প্রমাণ সাইজের বিছানা—ডোরাকাটা ঘুমের পোশাক পরে শুয়ে আছে ড্যানি।

সাবধানে দরজা খুলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। আর কোথাও থামল না, করিডোর ধরে দ্রুত পা চালাল, শেষ প্রান্তের দরজা খুলে বেরিয়ে এল চওড়া এক ল্যাণ্ডিঙে। নিচতলা থেকে পাথুরে সিঁড়ি উঠে গেছে দুর্গের একেবারে ছাত পর্যন্ত, মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে ও। দেয়ালে ঝোলানো গ্যাস ল্যাম্পের সারি মৃদুভাবে আলোকিত করে রেখেছে স্টেয়ারওয়েল। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে আগুনের শিখা, ছায়ারা নেচে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। বাতাসে সোঁদা গন্ধ। অশুভ পরিবেশ।

রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে রানা উঁকি দিল নিচে। চোখে পড়ল নিচতলার মার্বেল পাথরের মেঝে—দাবার বোর্ডের মত সাদা-কালো ডিজাইন। সিঁড়ি ধরে নিচতলায় যেতে পারে ও, হলওয়ে পেরুলে পৌঁছে যাবে সদর দরজায়, বেরিয়ে যেতে পারবে অনায়াসে।

কিন্তু দরজা যদি বন্ধ থাকে? বেরুবার আগেই যদি কেউ দেখে ফেলে? বেরুতে পারলেই বা কী লাভ হচ্ছে? কী বলবে রেডকে গিয়ে? স্টাফ করা কিছু জানোয়ার, বাতিল মালামালের স্তূপ আর ঘুমন্ত ড্যানি গ্রিফিন ছাড়া কিছুই তো দেখেনি ও। রেড কি হাসবে

না এসব শুনে?

অবশ্য কী পাবে বলেই বা আশা করছে? রডনি রাইলির লুকানো লাশ? নাকি লর্ড গ্রিফিনের স্বহস্তে লেখা জবানবন্দি: ছেলেটাকে খুন করেছেন তিনি? এসব গল্প-উপন্যাসে ঘটে, বাস্তবে নয়। সত্যিকার ভিলেনরা কখনও নিজের অপকর্মের প্রমাণ জমিয়ে রাখে না, যেটা খুঁজে নিয়ে নায়ক তাকে শাস্তি দিতে পারে। রানা উপলব্ধি করল, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় দুর্গে হানা দিয়েছে ও—কোনও ধরনের পরিকল্পনা ছাড়াই। নিতান্তই শিশুসুলভ অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।

আনমনে মাথা নাড়ল ও। এখন এসব ভেবে লাভ কী? যা হবার তা হয়ে গেছে, এবার একটা পরিকল্পনা চাই। একটু ভাবল ও। ঠিক করল বিশ মিনিট সময় নেবে। এর মাঝে যতটুকু পারে ঘুরে দেখবে দুর্গের ভিতরটা। কিছু পেলে ভাল, না পেলেও বিশ মিনিট পর বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যদি বেরুতে না পারে? সদর দরজায় তালা দেয়া থাকতে পারে, কিংবা সেখানে থাকতে পারে সশস্ত্র পাহারা। সেক্ষেত্রে? দুর্গের ভিতরে তল্লাশি চালিয়ে যাবে ও। খুঁজে নেবে বেরুনোর বিকল্প পথ।

হ্যাঁ, দাঁড় করানো গেছে প্ল্যান। এবার সেই মোতাবেক কাজ করা যাক।

সিঁড়িতে নেমে পড়ল রানা। ধাপগুলো পাথরের তৈরি বলে স্বস্তি অনুভব করল, আওয়াজ হচ্ছে না একদম। কাঠ হলে ক্যাঁচকোঁচ করত। গ্যাসল্যাম্পের হিসহিসে আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ হচ্ছে না কোথাও। এক মিনিটের মাথায় নিচতলায় পৌঁছে গেল ও। তাকাল চারদিকে। কেউ নেই দৃষ্টিসীমায়—না পাহারাদার, না অন্য কেউ।

নির্জন হলওয়ে। মূল দরজা দেখতে পাচ্ছে রানা, ছোট একটা পোর্চ হয়ে যেতে হয় ওখানে, পোর্চটা কাঠের প্যানেলিং করা।

ওদিকে যাবে কি যাবে না ভাবছিল, এমন সময় একটা শব্দ শুনে জায়গায় জমে গেল ও।

পায়ের আওয়াজ, কোনও সন্দেহ নেই। স্থির হয়ে কান পাতল ও। নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছে—সত্যিই শুনেছে, নাকি কল্পনা করছে।

ওই তো, শোনা গেল আবার। পায়ের আওয়াজই, কিন্তু অন্যরকম। জুতোর আওয়াজ না, মনে হচ্ছে ঠাস করে মেঝেতে বাড়ি খাচ্ছে কিছু, তারপর ঘষটে এগোচ্ছে। খালি পায়ে হাঁটছে। মানুষ? তা হলেও তো এমন আওয়াজ হবার কথা নয়। কী ওটা?

প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে চাইল না রানা, ছুট লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে। পোর্চ পেরিয়ে সদর দরজার কাছে পৌঁছুল। পাগলের মত ঘোরাল হাতল। খুলল না দরজা। যা ভেবেছে তাই, ওটা তালা মারা। দিশেহারার মত লাগল ওর, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। দৌড়ে ফিরে এল হলওয়েতে। পাগলের মত তাকাল এদিক-সেদিক। বেশ ক'টা প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছে হলওয়ের দু'পাশে, কিন্তু কোন্‌টা থেকে আসছে পায়ের আওয়াজ, বুঝতে পারছে না। প্যাসেজগুলো আলোকিত, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না আগন্তুককে। একটামাত্র প্যাসেজে আলো জ্বলছে না, সেটা সিঁড়ির তলায়। একছুটে ঢুকে পড়ল ওটায়। লুকাল সেখানে।

ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নেমে এল, থেমে গেছে পদশব্দ। একটু পরেই ভেসে এল ফোঁস ফোঁস আওয়াজ, যেন কোনও জন্তু বাতাস শুঁকছে। কুকুর নয়তো? না, কুকুরের আওয়াজ অমন হয় না।

হঠাৎ আবার শুরু হলো পায়ের আওয়াজ, আগের চেয়ে দ্রুত। হলওয়ের মেঝেতে বিশাল এক ছায়া দেখতে পেল রানা, বামদিক থেকে আসছে। শুনতে পেল ভেজা, ঘড়ঘড়ে শ্বাস ফেলার শব্দ। অনেকটা গড়গড়ারমত, তার সঙ্গে মিশে আছে হাঁপানির টান।

কে বা কীসে অমন শব্দ করছে, দেখার জন্য অপেক্ষা করল না রানা। উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল অন্ধকার প্যাসেজ ধরে। জানে না কোথায় চলেছে। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে পর পর তিনটে মোড় ঘুরল ও, থামল প্যাসেজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে। সামনে নিরেট দেয়াল, এগোবার উপায় নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে কান পাতল ও, অনুসরণকারী এখনও আসছে... প্যাসেজে প্রতিধ্বনি তুলছে পা ঘষটে এগোবার আওয়াজ, সেই সঙ্গে তার ভীতিকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

পাগলের মত দু'পাশের দেয়াল হাতড়াল রানা, হাত ঠেকে গেল ধাতব এক হ্যাণ্ডেলে। চাপ দিতেই খুলে গেল একটা দরজা, ভিতরে ঢুকে পাল্লাটা আবার বন্ধ করে দিল ও। কোথায় ঢুকেছে দেখার জন্য ঘুরল এরপর।

বড়সড় এক কিচেন। ছাত থেকে ঝুলছে নানা আকারের হাঁড়ি-পাতিল আর প্যান। একপাশে স্টেইনলেস স্টিলের দুটো বড় সিঙ্ক। মাঝখানে কাঠের টেবিল, তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের রান্নার সরঞ্জাম। ওখান থেকে বড় একটা ছুরি তুলে নিল ও। পিছনের দেয়ালের একটা দরজা ঠেলে ঢুকল ছোট আরেকটা কামরায়। ভাঁড়ারঘর ওটা। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো শেলফে রাখা হয়েছে খাবারদাবার। হুক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বড় বড় মাংসের টুকরো। শুকনো রক্তের গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

ভাঁড়ার থেকে বেরুবার পথ নেই, অগত্যা কিচেনে ফিরে এল ও। আরেকটা দরজা দেখতে পেল একদিকের দেয়ালে, ওপাশে প্যাসেজ—এটা আগেরটার চেয়ে সংকীর্ণ, তবে অন্ধকার। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে দ্বিধা করল এক মুহূর্ত, কিন্তু কিচেনের দরজায় আওয়াজ হতেই ঝেড়ে ফেলল সব দ্বিধা। দরজা পেরিয়ে ছুট লাগাল অন্ধকারে।

ভারী কাপড়ের মত কী যেন নাকে-মুখে বাড়ি খেল রানার।

হুমড়ি খাবার দশা হলো ওর, হাত থেকে ছুটে গেল ছুরি। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালল কোথায় ঢুকেছে দেখার জন্য। চোখে পড়ল লাইনে ঝোলানো সারি সারি জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, কোট-প্যান্ট, ইত্যাদি। দুর্গের লণ্ড্রিতে পৌঁছে গেছে ও।

পিছন থেকে ভেসে এল ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, এসে গেছে অনুসরণকারীও। কাপড়ের সারির জন্য দেখা গেল না তাকে, শুধু কিম্ভুত এক ছায়া পড়ল বড় একটা চাদরের গায়ে। টর্চ নিভিয়ে ফেলল রানা। ঝুলতে থাকা কাপড়চোপড় দু'হাতে সরিয়ে এগিয়ে চলল লণ্ড্রির উল্টোদিকে। ছুরিটা কুড়ানো হলো না আর।

লোহার তৈরি একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি পেয়ে গেল সামনে। সাত-পাঁচ না ভেবে ওটা ধরে উঠে গেল দোতলায়। বেরিয়ে এল একটা সংকীর্ণ সারভেন্টস্' প্যাসেজওয়েতে—ভৃত্যদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে ওটা। আঁকাবাঁকা সেই প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল ও, কিন্তু একটু পরেই টের পেল, ফাঁকি দেয়া যায়নি অনুসরণকারীকে। পা ঘষটে, ঘড়ঘড়ে শ্বাস ফেলে ওর পিছে লেগে রয়েছে সে। এখন পর্যন্ত কেন চেঁচিয়ে লোক জড়ো করেনি, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

পুরোপুরি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে রানা। কোন্‌দিক থেকে এসেছে বা কোথায় যাচ্ছে—কিছুই বলতে পারবে না আর। যেন আটকা পড়েছে গোলকধাঁধায়, পিছু পিছু তাড়া করছে কোনও ভয়াল দানব। খোলা প্যাসেজ পেলে ছুটছে, সিঁড়ি দেখলে উঠছে বা নামছে... চেষ্টা শুধু দূরে সরে যাবার।

আরেকটা সিঁড়ির সামনে পৌঁছুল ও। এটা ধরে আগেও উঠেছে বা নেমেছে কি না বুঝতে পারছে না। ভাবনা-চিন্তার সময়ও নেই। সিঁড়িতে নেমে পড়ল ও। একেক লাফে তিনটা করে ধাপ পেরুচ্ছে। হঠাৎ পা পিছলাল। কিছুতেই আর ব্যালান্স রাখতে পারল না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল সিঁড়িতে। ঠোকর

খেয়ে, গড়াতে গড়াতে নিচে নামতে থাকল। একটু পরে আছড়ে পড়ল সিঁড়ির গোড়ার অন্ধকার ল্যাণ্ডিঙে। ককিয়ে উঠল রানা। বেমক্কা বাড়ি খেয়ে দপ দপ করছে মাথা, টনটন করছে পুরো শরীর।

নিস্তেজ হয়ে কয়েক মুহূর্ত পড়ে রইল ও। যখন চোখ মেলল, আলোর একটা রেখা দেখতে পেল অন্ধকারের মাঝে। কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে এগোল আলোর উৎসের দিকে। আচ্ছন্নের মত লাগছে ওর, মাথা কাজ করছে না আর।

কাছাকাছি পৌঁছুতেই লোহার একটা দরজা দেখতে পেল রানা। উপরদিকে জাহাজের পোর্টহোলের মত বৃত্তাকার একটা কাঁচ লাগানো—সেখান দিয়ে আসছে আলো। হাতল ঘুরিয়ে দরজটা খুলে ফেলল ও, পার হলো চৌকাঠ। তারপরেই থমকে দাঁড়াল।

চওড়া এক প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে রানা, জায়গাটা অনেকটা ব্যালকনির মত। নিচে জানালাহীন বিশাল এক কামরা—দুর্গের ডানজন। উজ্জ্বল, বেগুনি আলো জ্বলছে কামরায়; বাতাসে ভাসছে কড়া কেমিক্যালের গন্ধ। আঁসটে আরেকটা গন্ধও মিশে আছে তার সঙ্গে। হিম হিম পরিবেশ।

সার বেঁধে দাঁড়ানো অনেকগুলো কাঁচের ট্যাঙ্ক দেখতে পেল রানা, তাতে সাঁতার কাটছে কী যেন। হাসপাতালের অপারেটিং টেবিলের মত কিছু স্টিলের টেবিলও আছে, সেগুলোর মাথার কাছে রয়েছে পানির ট্যাপ আর বেসিন। তাকে শোভা পাচ্ছে হাজারো কেমিক্যালের শিশি ও বোতল। জায়গাটা দেখেই ইটনের সায়েন্স ল্যাবরেটরির কথা মনে পড়ল ওর, পার্থক্য শুধু এ-ই যে, এটা অনেক বড়।

কতগুলো খাঁচাও দেখতে পেল রানা; আর দেখতে পেল একটা শুয়োরছানা, অপারেটিং টেবিলে পড়ে থাকা অবস্থায়—মাথা

থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছে, চামড়ার ভেতর থেকে বের করে আনা হয়েছে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

মাথা ঘুরছে রানার, দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না আর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। পরমুহূর্তে পিছনে শোনা গেল সেই পরিচিত পা ঘষটানোর আওয়াজ! ঘাড় ফেরাবার সুযোগ পেল না, তার আগেই পিচ্ছিল, ভেজা একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল পিছন থেকে। ঘড়ঘড় করে শ্বাস ফেলল কেউ একদম কানের পাশে।

জ্ঞান হারাল ও।

বিশ

জ্ঞান ফেরার পর ঠাণ্ডা ছাড়া আর কিছু অনুভব করল না রানা। শীতল বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছে ও মুখে, সেই বাতাস ভরিয়ে দিচ্ছে ফুসফুস। শক্ত কিছুর উপর শুয়ে আছে ও, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে পিঠ। কপালের একপাশে ব্যাণ্ডেজ লাগানো হয়েছে—সেটাও ভেজা ও ঠাণ্ডা।

খুব দুর্বল লাগছে রানার, পুরোপুরি সচেতন হয়নি এখনও, তাও নড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। টের পেল, স্ট্র্যাপ দিয়ে হাত-পা আটকে রাখা হয়েছে ওর। শোয়ানো হয়েছে লর্ড গ্রিফিনের ল্যাবরেটরির একটা স্টিলের টেবিলে।

নড়তে না পেরে চোখ মুদল রানা। আরেকটু বিশ্রাম নেয়া

যাক। কিন্তু পরমুহূর্তে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মাথায়। চোখ খুলতেই জাপানি চেহারার একজন মানুষকে ওর উপর ঝুঁকে থাকতে দেখল। ল্যাব কোট পরে আছে, চোখে চশমা। হাতে তুলোর দলা আর হলদে তরলের একটা জার।

'সরি,' রানাকে চোখ মেলতে দেখে বলল লোকটা। 'ব্যথা দিয়ে ফেলেছি?'

'হ্যাঁ,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল রানা।

একটা নোটবুক বের করে খসখস করে কিছু লিখল লোকটা। কপালের পাশটায় জ্বালাপোড়া করছে রানার, হাত দিয়ে চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে জায়গাটা, কিন্তু সেটা সম্ভব না। একটুও নড়তে পারছে না ও।

'মাথায় বেশ আঘাত পেয়েছ তুমি,' বলল জাপানি। নোটবুক নামিয়ে রাখল সে, রানার চোখের পাতা সরিয়ে একে একে দেখল মণিদুটো। আঙুলগুলো বরফের মত শীতল, কেঁপে উঠল রানা। 'নিজের নাম বলতে পারবে? আজকে কী বার?'

'আমার নাম মাসুদ রানা।' ক্ষুব্ধ গলায় বলল রানা। 'আজ বুধবার... না, বারোটা পেরিয়ে গেছে... তারমানে বৃহস্পতিবার। এবার আমার বাঁধন খুলে দিন।'

'মাসুদ রানা!' গমগম করে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ। ঘাড় ফেরাতেই লর্ড গ্রিফিনকে দেখতে পেল রানা। কাঁচের একটা ট্যাঙ্কের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দু'হাত ভাঁজ করে রেখেছেন বুকের উপর। 'তাই তো বলি, চেনা চেনা লাগে কেন? ইটনে পড়ো তুমি, আমার পুরনো বন্ধু ইমতিয়াজের ছেলে। রাইট?'

হেঁটে রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আবারও তাঁর শরীরের উত্তাপ অনুভব করল রানা, মনে হলো হিংস্র একটা পশু এসে দাঁড়িয়েছে।

চোয়াল ঘষলেন লর্ড গ্রিফিন। মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি আমাকে ঘুষি মেরেছিলে।'

'ইচ্ছে করে নয়,' রানা বলল। 'আপনিই মারতে বলেছিলেন।'

'হুম। এরপর তুমি ক্রস-কাণ্ট্রিতে জিতলে... আমার ছেলেকে হারিয়ে দিয়ে।'

'ঠিক,' জোর করে হাসল রানা। 'চিনতে যখন পেরেছেন, এবার আমাকে ছেড়ে দেয়া যায় না?'

'তোমার মঙ্গলের জন্যই বেঁধে রাখা হয়েছে,' বললেন গ্রিফিন। ফিরে গেলেন কাঁচের ট্যাঙ্কের কাছে। আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন ওটার গায়ে। ঘোলা পানির মাঝ থেকে কাঁচের গায়ে নাক ঠেকাল একটা কালো রঙের ঈল; ঘুরপাক খেল তাঁর মুখের কাছে। 'মাথার আঘাত খুব ভয়ানক ব্যাপার। কী থেকে কী হয়ে যায়, নিজেই নিজের ক্ষতি করে বসতে পারো। তাই...' আবার ঘুরলেন তিনি। 'সুস্থ হওয়ামাত্র ছেড়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'আ... আমার কিছু হয়নি। সামান্য ব্যথা পেয়েছি, বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'এখানেই বিশ্রাম নাও। আর জবাব দাও কয়েকটা প্রশ্নের। প্রথম: এখানে কী করছ তুমি? রাতদুপুরে আমার দুর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কেন?'

'ড্যানির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' হড়বড় করে বলল রানা। এই একটা অজুহাতই মাথায় এল ওর।

'ড্যানি?' সকৌতুকে বললেন গ্রিফিন। 'আমার ছেলের সঙ্গে রাত দুটোয় দেখা করতে এসেছিলে? বিশ্বাস করতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'ইয়ে... সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

হেসে উঠলেন লর্ড। 'তা অবশ্য ঠিক। অত রাতে তোমাকে

দেখতে পেলে চমকাত বটে ড্যানি।'

আবার রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। পরীক্ষা করলেন দু'হাতের তালু, গন্ধ শুঁকলেন। 'পাইনের গন্ধ!' দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটল তাঁর। 'তুমি কি ওই গাছটা বেয়ে উঠে এসেছ?'

জবাব দিল না রানা।

প্রশংসার চোখে ওর দিকে তাকালেন লর্ড। 'সাহস আছে বটে! ওদিক দিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে বলে ভাবিনি। আরও আগেই গাছটা কেটে ফেলা উচিত ছিল।'

আলো-ছায়া খেলা করছে ল্যাবরেটরির ভিতরে। মাথার উপর জ্বলতে থাকা বেগুনি আলোয় অপার্থিব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। স্বপ্ন বলে ভ্রম হতে পারত, কিন্তু বিচ্ছিরি এক বোটকা গন্ধের জন্য সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তার সঙ্গে যুক্ত হলো ভয়ঙ্কর, অমানুষিক এক চিৎকার—হঠাৎ করে দূর থেকে ভেসে এল সেটা।

কেঁপে উঠল রানা। মরিয়া হয়ে বলল, 'প্লিজ, স্যর, বিশ্বাস করুন আমার কথা! ড্যানির সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি আমি। গাছে উঠে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, অনেক বেশি সময় লেগে গেছে দুর্গে ঢুকতে। সেজন্যেই...'

'বেশ, তোমার কথাই সই,' থমথমে হয়ে উঠল লর্ড গ্রিফিনের চেহারা। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'কালহুন! ড্যানিকে ডেকে নিয়ে এসো।'

ছায়ার ভিতর থেকে লর্ডের অনুচর সেই বানর-মানবকে বেরুতে দেখল রানা। ওর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসল সে, তারপর ঘুরে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল প্ল্যাটফর্মে। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ড্যানিকে ডেকে আনার জন্য।

রানার বাঁধন খুলতে শুরু করলেন লর্ড। 'সাবধান থাকতে হয় আমাকে, বুঝলে?' বললেন তিনি। 'সিকিউরিটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি ভাবতে পারো, কিন্তু আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চোর

আর গুপ্তচরের দল। আমার সাধনার ফসল চুরি করতে চায় ওরা। এই তো, গতকালই লেক থেকে এক আমেরিকান ডিটেকটিভের লাশ উদ্ধার করেছি আমরা। ছোঁক ছোঁক করতে এসেছিল লোকটা, নিশ্চয়ই অসতর্ক হয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। কপাল ভাল যে তুমিও পড়োনি। লেকটা বিপজ্জনক। কোনও লোক ওই পানিতে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'কিংবা কোনও ছেলে,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'রডনি রাইলির মত।'

লর্ড গ্রিফিনের মুখের উপর দৃষ্টি সেঁটে রয়েছে ওর। এই প্রথমবারের মত তাঁকে থতমত খেতে দেখল। হাত থেমে গেল তাঁর। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কী জানো তুমি রডনি রাইলির সম্পর্কে?'

'এটুকুই যে, এখানে মাছ ধরতে এসেছিল সে। ফিরে যায়নি।'

'থিয়োরিটা চমৎকার!' ঠোঁট বেঁকে গেল গ্রিফিনের। আবার হাত চালালেন। শেষ স্ট্র্যাপটা খুলে মুক্ত করলেন রানাকে।

উঠে বসল রানা। পা ঝুলিয়ে বসল টেবিলে। দুর্বল লাগছে খুব।

'হ্যাঁ, চমৎকার থিয়োরি,' আবার বললেন গ্রিফিন। 'কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ওর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই।'

লর্ডের পিছনে, কাঁচের ট্যাঙ্কের গায়ে ঘাই মারল ঈল। মনে হলো ট্যাঙ্ক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে, না পেরে ঘুরপাক খেতে থাকল। ওদিকে চোখ আটকে গেল রানার।

'ঈলগুলো পছন্দ হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন গ্রিফিন। 'হবারই কথা। অপূর্ব প্রাণী... নিখুঁত স্পেসিমেন। বাড়তি চাকচিক্য বলে কিছু নেই ওদের, তার প্রয়োজনও নেই। লক্ষ-কোটি বছর ধরে এভাবেই আছে ওরা। বিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি

ওদের গায়ে, কারণ শুরু থেকেই ওরা খুঁতহীন। ওভাবেই ওদেরকে পাঠানো হয়েছে পৃথিবীতে।'

রানার হাত ধরলেন তিনি, টেবিল থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন ট্যাঙ্কের সামনে। পাশাপাশি দাঁড়াল দু'জনে। চুপচাপ দেখল সবুজাভ ঘোলা পানিতে ঈলের নর্তন-কুর্দন। কাঁচের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে লর্ডের চেহারা, তাঁর চোখদুটো চকচক করতে দেখল রানা।

'*অ্যাঙ্গুইলা অ্যাঙ্গুইলা,* বা ইয়োরোপিয়ান ঈল,' পরিচিতি দেবার ভঙ্গিতে বললেন গ্রিফিন। 'সারগাসো সাগরে বাস এদের, নর্থ আটলান্টিক থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে।' কণ্ঠ খাদে নেমে গেছে... যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন তিনি। 'সারগাসো সাগর—বিচিত্র, মৃত এক সাগর... আটকা পড়েছে দুটো ওশন কারেন্টের মাঝখানে। ঢেউ নেই ওখানে, সারফেস একেবারে স্থির ও সমতল, কারণ পুরোটাই ঢাকা পড়ে আছে সারগাসাম নামের এক সামুদ্রিক শৈবালের চাদরে। সেই আবরণের তলায়, কালো পানির গহীনে থাকে ঈলেরা। কী এক দৃশ্য হতে পারে সেটা, ভাবতে পারো? কোটি কোটি ঈলের রাজ্য... ঘুরছে, ফিরছে, নেচে বেড়াচ্ছে সাগরতলে! কোনও মানুষ আজও দেখেনি সে-দৃশ্য।'

রানাকে আরও কয়েকটা ট্যাঙ্কের সামনে নিয়ে গেলেন লর্ড। প্রতিটাতেই একটা করে নিঃসঙ্গ ঈল সাঁতার কাটছে। কোনোটা কয়েক ইঞ্চি লম্বা, কোনোটা ফুটখানেক। দানবীয় একটাকে দেখল, সেটা প্রায় এক গজ দীর্ঘ, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের বাহুর চেয়ে মোটা।

'ইয়োরোপের সমস্ত ঈল সারগাসো সাগর থেকে আসে,' গ্রিফিন বললেন। 'আমারগুলোও তাই। ওখানেই ডিম ফুটে জন্ম নেয় ওরা।' থামলেন তিনি। রানার দিকে ফিরলেন। 'শিশু অবস্থায় দেখলে চিনতে পারবে না ওদের। পাতলা, ছোট্ট,

একেবারে স্বচ্ছ থাকে শরীর। তখন ওদেরকে *থিন-হেড* বলি আমরা। এই থিন-হেডেরাই বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে, সাগরের হাজারো বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে পৌঁছায় ইয়োরোপের মিঠে পানিতে। ততদিনে মোটামুটি ঈলের একটা আকার পায় ওরা, তবে এদের মত বড় হয় না। এই যে, এখানে দেখো...'

বড় একটা ট্যাঙ্কের দিকে ইশারা করলেন গ্রিফিন। প্রায়-স্বচ্ছ, হাজারো প্রাণী সাঁতার কাটছে ওতে। একেকটা দু'ইঞ্চির মত দীর্ঘ, শরীর জেলির মত; তার সামনে ছোট্ট, কালো মাথা। বেঢপ চোখগুলো বেরিয়ে আছে মাথা থেকে।

'গ্লাস ঈল,' বললেন গ্রিফিন। 'ছোট এক টুকরো কাঁচের মত। নদীমুখে পৌঁছে থামে ওরা। ওখানেই অপেক্ষা করে বড় হবার জন্য। আস্তে আস্তে স্বচ্ছ শরীর কালো হয়ে আসে, মোটাতাজা হয়। তারপর আবার শুরু করে চলতে—ঝাঁকে ঝাঁকে। স্রোতের মত ঢুকে পড়ে বিভিন্ন নদীতে। ঈলের সেই ঝাঁকের মাঝে জাল ফেললে বিনা বাধায় রাশি রাশি মাছ পাবে, তাই বলে থামাতে পারবে না ওদের। অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাকিরা চলে যাবে বিভিন্ন নদী, নালা, খাল, বিল আর পুকুরে। প্রয়োজনে ডাঙায় উঠে আসবে, সাপের মত পিছলে এগোবে, গন্তব্যে পৌঁছে তবেই ছাড়বে। যেখানে গিয়ে থামবে, সেখানে বাকি জীবন কাটাবে ওরা। পানির গভীরে, কাদায় মাখামাখি হয়ে। ধীরে ধীরে বয়স বাড়বে ওদের, শরীর হৃষ্টপুষ্ট হবে, তারপর হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নেবে বাড়ি ফেরার। যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়বে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফিরবে সারগাসো সাগরে। ওখানেই বেছে নেবে সঙ্গী বা সঙ্গিনী, বংশবৃদ্ধি করবে; তারপর জীবনপ্রদীপ নিভে গেলে ডুবে যাবে অতল জলে।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন লর্ড গ্রিফিন, জ্বলজ্বল করছে তাঁর চোখ।

'কখনও ঈল ধরেছ?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'পূর্ণবয়স্ক? বড় আকারের? মাছ না, জলের দানব বলতে হয় ওদেরকে। একেকটার চামড়া এত মোটা যে তা দিয়ে জুতো বানানো যাবে। কখনও ঈল মেরেছ? খুব কঠিন। প্রচণ্ড শক্তি ওদের গায়ে, লড়তেও জানে ভয়ঙ্করভাবে। দলের ভিতর যে যত শক্তিশালী, তারই টিকে থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। একটা ট্যাঙ্কে দশটা ঈল রাখো, পরদিন এসে দেখবে ন'টা রয়েছে। তার পরে আটটা, সাতটা, ছ'টা... শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে মাত্র একটা। বাকিরা নিকেশ হয়ে যাবে শক্তির লড়াইয়ে।' হাসলেন লর্ড। 'হাহ্, আমরা ভাবি মানুষ বুঝি দুনিয়ার রাজা, সমস্ত প্রাণীর প্রভু... কিন্তু ঈলের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা নিতান্তই নাজুক এক জাত।' পায়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরালেন লর্ড। 'এই তো, ড্যানি এসে গেছে।'

সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে গ্রিফিন-তনয়, চোখ কচলাচ্ছে। কাঁচা ঘুম ভাঙানোয় উদ্‌ভ্রান্তের মত লাগছে তাকে। প্রহরীর মত তার পিছে রয়েছে কালহুন নামের লোকটা। রানাকে দেখে চোখ বড় হয়ে গেল ড্যানির—ওকে আশা করেনি এখানে।

'একে চেনো?' ড্যানি সামনে এলে প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্রিফিন।

'হ্যাঁ,' সতর্ক ভঙ্গিতে বলল ড্যানি। বাপের সঙ্গে তার যে অদৃশ্য একটা দূরত্ব রয়েছে, তা ইটনেই দেখেছে রানা।

'ও নিজেকে তোমার বন্ধু বলে দাবি করছে,' বললেন গ্রিফিন। 'কথাটা কি সত্যি?'

জবাব দিল না ড্যানি। ইতস্তত করছে।

'কথা বলো!' মৃদু ধমক দিলেন গ্রিফিন।

'ওকে আমি চিনি,' বলল ড্যানি। 'এখানে ছুটি কাটাতে এসেছে। কিথলিতে কোন্ এক আত্মীয় যেন আছে ওর।'

'ওসব জানতে চাইনি। ও তোমার বন্ধু কি না সেটাই বলো।'

এবারও ইতস্তত করল ড্যানি। বাপের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল মেঝের দিকে। রানাকে এড়াতে চাইছে। নিচু গলায় বলল, 'না।'

অবাক হলো না রানা—এটাই স্বাভাবিক। যে-ছেলে ওকে খুন করতে চায়, সে কোনোদিনই ওর হয়ে সাফাই গাইবে না। তাড়াহুড়োয় ড্যানির নাম তোলাই ভুল হয়েছে। ভেবেচিন্তে অন্য কোনও গল্প সাজানো উচিত ছিল।

'এই ছেলে কেন দুর্গে ঢুকেছে, কিছু আন্দাজ করতে পারো? তুমি কখনও আসতে বলেছ?'

'না।' মাথা নাড়ল ড্যানি।

'বুঝতে পেরেছি,' গম্ভীর গলায় বললেন গ্রিফিন। 'তুমি এবার যেতে পারো।'

নড়ল না ড্যানি। 'কী করবে তুমি ওকে নিয়ে, বাবা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' কড়া গলায় বললেন লর্ড। 'কয়েকটা বিষয় জেনে নেব ওর কাছ থেকে। তুমি তোমার কামরায় যাও।'

'আমি থাকি?'

ধৈর্য হারালেন গ্রিফিন। বাজখাঁই কণ্ঠে বললেন, 'না! এখানে থাকবে না তুমি। যাও বলছি!'

অসহায় চোখে রানার দিকে তাকাল ড্যানি। এই প্রথম তার চোখে সহানুভূতি দেখতে পেল ও। মনে হলো বুঝি নিঃশব্দে ক্ষমা চাইছে।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ!' দাঁত কিড়মিড় করলেন গ্রিফিন। 'কালহুন!'

বানর-মানব এগিয়ে এল। ড্যানির হাত ধরে টানল নিয়ে যাবার জন্য।

'ড্যানি!' ডাকল রানা।

'সরি, রানা। আমার কিছু করার নেই।'

ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল ড্যানি আর কালহুন। উপরের দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ শুনল রানা। মনে হলো বুঝি কফিনের ডালা বন্ধ করা হলো ওর।

একটু অপেক্ষা করে মুখ খুললেন লর্ড গ্রিফিন। 'এবার তোমাকে কয়েকটা ব্যাপার বুঝিয়ে বলব আমি, রানা। কী ঘটতে চলেছে তোমার ভাগ্যে, সেটা বুঝতে সুবিধে হবে তা হলে।'

ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। গলার কাছে দলা পাকাচ্ছে কী যেন। বুঝতে পারছে, বড় ধরনের বিপদে পড়েছে। সহজে রেহাই মিলবে না।

লর্ডের কথা শুনে শয়তানি হাসি ফুটেছে জাপানি লোকটার ঠোঁটে। কঙ্কালসার আঙুল তুলে নাকের একপাশ চুলকাল সে। তারপর খুশি খুশি গলায় বলল, 'ছেলেটা তাগড়া আছে। সাবজেক্ট হিসেবে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস।'

ঢোক গিলল রানা। অসুস্থ লাগছে ওর। কাঁপুনি আসতে চাইছে শরীর জুড়ে। দু'হাত মুঠো করে নিজেকে সামলাল। না, এদের সামনে ভেঙে পড়বে না কিছুতেই।

'মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন?' হালকা সুরে ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন গ্রিফিন। 'চিয়ার আপ! মানবজাতির কল্যাণসাধনে মস্ত বড় সাহায্য করতে চলেছ তুমি।'

বড় করে শ্বাস ফেলল রানা। যতটা পারে শান্ত গলায় বলল, 'আমি যে এখানে এসেছি, সেটা লোকে জানে।'

'তা-ই?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বেঁকে গেল লর্ডের ঠোঁট। 'কী বলে এসেছ? রাতদুপুরে আমার বাড়িতে চুরি করে ঢুকবে? আমার তা মনে হয় না। আর বলবেই বা কাকে? পুলিশেও যদি বলে আসো, কোনও সমস্যা নেই। দুর্গের ভিতরে তোমাকে অনির্দিষ্টকাল

লুকিয়ে রাখতে পারব আমি, কারও সাধ্য নেই এখানকার গোপন কামরা থেকে তোমাকে খুঁজে বের করে। আমি যদি অনুমতি না দিই, কেউ ঢুকতেও পারবে না দুর্গে। আমার সিকিউরিটি তো দেখেছ।'

'হ্যাঁ, একেবারে প্রথম শ্রেণীর,' বলল রানা। 'একমাত্র সমস্যা হলো, একটা ছোট ছেলেও ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে যেতে পারে।'

চোয়াল শক্ত হলো গ্রিফিনের। 'যারা এর জন্য দায়ী, তারা কঠিন শাস্তি পাবে।' চেহারা আবার স্বাভাবিক করলেন তিনি। 'যাক গে, কাজের কথায় আসি। আমার ল্যাবরেটরি দেখে নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে তোমার, রানা? নিশ্চয়ই ভাবছ, ঈল নিয়ে কী করছি আমি? এই গবেষণায় কীভাবে তোমাকে ব্যবহার করা হবে, সেটাও নিশ্চয়ই জানতে চাও?'

চুপ করে রইল রানা।

হাসলেন লর্ড। 'আমার ব্যবসা সম্পর্কে কী জানো তুমি, রানা?'

'কিছুই না। শুধু জানি যে আপনি অস্ত্র বিক্রি করেন।'

'ঠিক। অস্ত্র কীসের জন্য লাগে, তা জানো? লড়াই করতে... যুদ্ধ করতে। সবসময়েই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে। আর সেসব যুদ্ধে অস্ত্রের জোগান দিয়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করি আমি।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'বিদ্রূপ কোরো না। আমাকে আর দশটা ব্যবসায়ীর মত ভাবলে ভুল করবে। আমি শুধু অন্যের হাতে অস্ত্র তুলে দিইনি। নিজেও যুদ্ধ করেছি।'

'আপনি? যুদ্ধ করেছেন?'

'অবাক হচ্ছ? হবারই কথা। আমার মত মানুষের যুদ্ধে যাবার

প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি গেছি। আমার ভাই এডগারের হাতে ব্যবসা সামলাবার দায়িত্ব তুলে দিয়ে বছরখানেকের জন্যে যোগ. দিয়েছিলাম সেনাবাহিনীতে। যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। কেন? না, দেশপ্রেম থেকে নয়, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়... আমি লড়াই করেছি যুদ্ধের স্বাদ নেবার জন্যে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা খেলে নিজেকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম আমি!'

যেন উন্মাদনা পেয়ে বসেছে লর্ডকে। কেন রানাকে এসব গোপন কথা শোনাচ্ছেন বুঝতে পারল না প্রথমে। যখন পারল, তখন হিম হয়ে গেল ওর হাত-পা। গোপন কথা শোনাবার অর্থ একটাই, এসব রানা কারও কাছে ফাঁস করতে পারবে না। সে-সুযোগ দেয়া হবে না ওকে।

'হ্যাঁ, পরীক্ষা,' বললেন গ্রিফিন। 'আমি সত্যিকার পুরুষ কি না, সেটাই দেখতে চেয়েছিলাম।'

'কী দেখলেন?' টিপ্পনী কাটল রানা। ওর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, এখন লর্ডের মেজাজ-মর্জির ধার না ধারলেও চলে। 'আপনি পুরুষ তো?'

'মশকরা কোরো না, ছেলে!' রাগী গলায় বললেন গ্রিফিন। 'তার ফল ভাল হবে না।'

'দেখুন, রাত অনেক হয়েছে,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'ক্লান্তি লাগছে আমার। আর সত্যি বলতে কী, আপনার বকবকানি শুনতেও ভাল লাগছে না মোটেই। আমাকে যদি শাস্তি দিতে চান তো অন্য কোনোভাবে দিন। কানের পোকা বের করে নয়।'

খোঁচাটা নীরবে হজম করলেন গ্রিফিন, বললেন, 'উতলা হয়ো না, যথাসময়ে তোমার পাওনা চুকিয়ে দেয়া হবে। এখন আমার গল্প শোনো, ইন্টারেস্টিং অংশটা শুরু হবে এবার।'

'আমি আশাবাদী হতে পারছি না।'

'চুপ! যা বলি শোনো। সেনাবাহিনীতে এক বছর কাটাবার

পর অব্যাহতি নিলাম আমি। ফিরে এলাম ঝুলিভরা অভিজ্ঞতা নিয়ে। সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে পথ দেখাল... বুঝিয়ে দিল কী হওয়া উচিত আমার পরবর্তী পদক্ষেপ। ইউ সি, পেশায় ব্যবসায়ী হলেও অন্তর থেকে আমি একজন বিজ্ঞানী। বিক্রি করার চেয়ে নিত্যনতুন হাতিয়ার আবিষ্কারে আমি বেশি আগ্রহী। আর যুদ্ধলব্ধ অভিজ্ঞতার কারণে বুঝতে অসুবিধে হলো না, কী ধরনের হাতিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই পৃথিবীর।'

'আমার ধারণা ছিল, আণবিক বোমার চেয়ে বড় হাতিয়ার আর নেই।'

'ভুল। বোমার চেয়েও বড় হাতিয়ার হলো সৈন্য। সৈনিক ছাড়া যুদ্ধ চলে না, বাছা। বোমা মেরে তুমি শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারো, কিন্তু তার এলাকা দখল করতে চাইলে তোমাকে সৈন্য পাঠাতেই হবে। কিন্তু সমস্যা কি, জানো? সৈনিকরা মানুষ, আর মানুষের মত নাজুক প্রাণী আর দ্বিতীয়টি নেই। অল্পতেই টপ করে মরে যায়। এ সমস্যা দূর করবার উপায় হলো অতিমানব তৈরি করা, যারা শক্তি, সাহস বা স্ট্যামিনা... সবদিক থেকে উন্নত। সাধারণ আঘাতে কিছু হবে না ওদের, গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে না, হাত-পা হারালেও থেমে যাবে না।'

'আপনি সুপার-সোলজারের কথা বলছেন?'

'এগজ্যাক্টলি! তবে এই গবেষণায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা কোথায়, জানো? গিনিপিগ খুঁজে পাওয়া। মানুষ নিয়ে গবেষণা, তাই জ্যান্ত মানুষের উপরেই এক্সপেরিমেন্ট চালাতে হবে আমাকে। কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ তাতে অংশ নেয় না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদি কাউকে ব্যবহার করি, সেটাকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়।'

'সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'হাহ্, তোমরা সবাই এক। আমেরিকাতেও একই সমস্যায়

পড়েছি। গবেষণার বিষয়বস্তু জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মায়াকান্না জুড়ে দিল ওরা—আমি নাকি অমানবিক গবেষণা করতে চাইছি। রীতিমত নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করল আমার গবেষণার ওপর। গাধার দল! হাজার হাজার সৈন্যকে মরবার জন্য যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতে পারবে, অথচ আমাকে দু-চারটে সাবজেক্ট সাপ্লাই করতে পারবে না! কী আর করা, গোপনে কাজ করতে হলো আমাকে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হলো সমাজ-সংসার থেকে। নিরাপত্তার এক নিশ্ছিদ্র বলয়ে নিজেকে ঘিরে ফেললাম আমি। আমেরিকা ছেড়ে চলে এলাম স্কটল্যাণ্ডের এই নির্জন দুর্গে...'

উন্মাদ লর্ডের গল্প কোন্‌দিকে যাচ্ছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না সেটা। চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকাল। পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু দেখতে পেল না।

'তবে এই সংগ্রামে আমি একা ছিলাম না, এটাই সান্ত্বনা,' বলে চলেছেন গ্রিফিন। 'আমার সাথী ছিল এডগার... আমার ভাই। সত্যিকার এক জিনিয়াস। দু'জনের মাঝে আসল বিজ্ঞানী ছিল ও-ই। আমি জন্ম দিতাম আইডিয়া, আর ও সেটাকে কাজে পরিণত করত।'

'কিন্তু মানুষ নিয়ে গবেষণার আইডিয়া নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি তিনি?' বলল রানা। 'আর সে-কারণেই আপনি তাঁকে খুন করেছেন।'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন লর্ড গ্রিফিন, তারপরেই হেসে উঠলেন হো হো করে। অনাবিল হাসি নয়, পাশবিক হাসি।

'আমি ওকে খুন করিনি,' বললেন তিনি। 'ইন ফ্যাক্ট, কিছুই করিনি ওর। যা করার তা ও নিজেই করেছে। ওর সঙ্গে বোধহয় দেখা হয়নি তোমার। কালহুন, এডগারকে নিয়ে এসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাবরেটরির পিছনদিকে চলে গেল কালহুন। তালা আর হুড়কো খোলার শব্দ শুনল রানা। নিচু গলার একটা

গর্জন ভেসে এল ওদিক থেকে, তারপর পদশব্দ আর শ্বাস ফেলার আওয়াজ—দুটোই রানার চেনা। এ-আওয়াজদুটোই ধাওয়া করেছিল ওকে!

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রানা। পা ঘষটে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। শ্বাস ফেলছে ঘড়ঘড় করে। আলোর মাঝে এসে দাঁড়াতেই হিম হয়ে গেল রানার কলজেটা। হৃৎপিণ্ড মিস করল একটা বিট। চোখের সামনে যা দেখছে, তা দুঃস্বপ্নকেও হার মানায়।

একসময় হয়তো মানুষ ছিল এডগার গ্রিফিন, এখন আর নেই। সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সে, হাতদুটো স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা, মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। পাতলা চামড়া ভেদ করে বের হয়ে আসতে চাইছে পাকানো পেশি। গায়ে ময়লা শার্ট আর প্যান্ট। এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, মনে হচ্ছে পা দুটো তার শরীরের ভার বহন করতে পারছে না, যে-কোনও মুহূর্তে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। চামড়া মানুষের মত নয়, ট্যাঙ্কে দেখা ঈলের মত। মসৃণ, তেলতেলে, ধূসর। মুখটা সবচেয়ে বীভৎস। চুল নেই, চামড়া টানটান হয়ে আছে খুলির গায়ে। বসে গেছে নাক, দেখা যাচ্ছে স্রেফ দুটো ফুটো। কানদুটোও বসে গেছে। কাস্তের মত প্রসারিত হয়ে ঠোঁটের দুই কোণ প্রায়-অদৃশ্য সেই কানদুটোকে যেন ছুঁতে চাইছে। চোখদুটোও সরে গেছে তাদের জায়গা থেকে, খুলির দু'পাশে। সোজা কথায়, মাছের চেহারা পেয়েছে এডগার।

বমি পেল রানার। কোনোমতে নিজেকে সামলে তাকাল এডগারের চোখের দিকে। ওই একটা জায়গাতে মানবিক কিছুর ছোঁয়া রয়ে গেছে। এডগারের দৃষ্টিতে বাসা বেঁধেছে সীমাহীন দুঃখ আর যাতনা। তার পায়ের দিকে তাকাল রানা—শেকল পরানো। পিছন থেকে কালহুন একটা শটগান তাক করে রেখেছে তার পিঠে। রানার মত এডগারও এই দুর্গের এক অসহায় বন্দি।

'এ-ই হলো আমার প্রাণপ্রিয় ভাই,' তার দিকে এগিয়ে গেলেন লর্ড গ্রিফিন। 'যমজ ছিলাম আমরা। তবে মজার ব্যাপার কি, জানো?' ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ঘুরলেন রানার দিকে। 'দু'জনের মাঝে এডগারকেই বেশি সুদর্শন বলত লোকে। হা হা হা!'

একুশ

'নরকে যাবার রাস্তা বড় মসৃণ, রানা। আর সেখানকার দরজাও সবার জন্য খোলা,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন লর্ড গ্রিফিন। 'তোমাদের স্কুলের মটো যেন কী? *ইটন উইল এনজিয়োর...* মানে ইটন টিকে থাকবে, তাই না? রাবিশ! কয়েক শ' বছর টিকে থেকে স্কুলটার খুব অহংকার হয়েছে। আসলে কি টিকে থাকবে, জানো? নরক... হানাহানি... যুদ্ধ! আর তারমানে আমার ব্যবসাও টিকে থাকবে অনন্তকাল। যতদিন মানুষ মানুষকে খুন করছে, ততদিন চলবে অস্ত্রের বিকিকিনি।'

খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, লর্ড গ্রিফিন ও তাঁর সহকারী ড. হিদোশির সঙ্গে ল্যাবরেটরির একটা টেবিলে খেতে বসেছে রানা। বসেছে না বলে জোর করে বসানো হয়েছে বলা ভাল। খিদে নেই ওর। খুব কষ্ট করে এক টুকরো পাউরুটি পুরেছে মুখে, গলায় গিয়ে আটকে আছে ওটা। নামছে না।

'মানবজাতির হিংসাত্মক চরিত্রের জন্য আমি দায়ী নই,' বলে

চলেছেন গ্রিফিন। 'সেখান থেকে আয়-রোজগার করেও আমি কোনও অন্যায় করছি না। মানুষের জন্মই হয়েছে খুনোখুনির জন্য। এই একটা কাজ আমরা খুব ভাল পারি। নাহয় সে-কাজে দক্ষতা বাড়াচ্ছে আমার অস্ত্র। এতে দোষ কোথায়? অযথাই নীতির প্রশ্ন তোলে লোকে।'

'এ-ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আমাকেও হতে হয়েছে,' হিদোশি বলল। 'প্রতিভার কদর কেউ করে না। দাম দেয় না দূরদৃষ্টির।'

'এখানে প্রতিভা বা দূরদৃষ্টির কিছু নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনারা যা করছেন সেটা স্রেফ পাশবিকতা,শয়তানি!'

বাঁকা হাসি হাসলেন গ্রিফিন। 'শয়তানি? কীভাবে মরল, তা নিয়ে মরা মানুষ মাথা ঘামায় ভেবেছ? বুলেট যা, জীবাণু বা রাসায়নিক অস্ত্রও তা। অস্ত্রের মধ্যে আবার মানবিক-অমানবিক কী? এসব সরকারের চালাকি—এটা করা যাবে তো ওটা করা যাবে না। যেন ওতেই মানবহত্যার মত জঘন্য একটা ব্যাপার গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। যতই সভ্যতার খোলস পরাও, দিনশেষে তুমি কিন্তু মানুষের প্রাণই নিচ্ছ। নিয়মকানুনের বেড়াজালে যুদ্ধকে আটকাবার চেষ্টা বৃথা। যুদ্ধ মানেই একটা নোংরা ব্যাপার। আমি জানি। আমি নিজে যুদ্ধ করেছি।'

খাওয়া শেষ হয়েছে তাঁর। প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। গেলেন এডগারের কাছে। কালহুন এখনও অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে তাকে। ভাইকে এগোতে দেখেই কেমন যেন কুঁকড়ে গেল এডগার।

'মানবদেহ সম্পর্কে কিছু জানা আছে তোমার, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন গ্রিফিন।

'স্কুলে যতটুকু পড়িয়েছে,' রানা জানাল।

'তা হলে নার্ভাস সিস্টেম সম্পর্কে নিশ্চয়ই শুনেছ। সারা দেহে

জালের মত ছড়িয়ে আছে আমাদের স্নায়ু। ওর মাঝ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিকাল সিগনাল আনাগোনা করে। আনন্দ বা ব্যথার অনুভূতি পাই আমরা। আমাদের পেশিও কাজ করে ওই সিগন্যালের ভিত্তিতে।'

মুঠো তুললেন লর্ড, এডগার আবারও কুঁকড়ে গেল।

'আরেকটা সিস্টেম আছে মানবদেহে,' বললেন গ্রিফিন। 'এণ্ডোক্রিন সিস্টেম। নার্ভাস সিস্টেমের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও ওর পুরো রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি আমরা। এই সিস্টেমে সঙ্কেতের আনাগোনা হয় কেমিক্যালের মাধ্যমে। এসব কেমিক্যাল তৈরি হয় দেহের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডে... প্রবাহিত হয় রক্তের মাঝ দিয়ে।'

'আপনি হরমোনের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, হরমোন। বিভিন্নভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করে হরমোন। কিছু আছে ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে, কিছু নিয়ন্ত্রণ করে উত্তেজনা। দৈহিক বৃদ্ধিও নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোনের মাধ্যমে। মানুষের খুলির ভিতরে, স্ফেনয়েড বোনের খাঁজে রয়েছে পিটুইটারি নামে ছোট্ট এক গ্ল্যাণ্ড। ওটাই সে-কাজ করে।'

আবারও হাত তুললেন লর্ড। তবে ঘুষি না মেরে হালকা চাপড় দিলেন ভাইয়ের তেলতেলে গালে। এরপর ফিরলেন রানার দিকে।

'শৈশবে মানুষের পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসরণ ঘটতে থাকে গ্রোথ হরমোনের। বিভিন্ন কোষে কোষে গিয়ে সেগুলোকে বিভাজিত হতে নির্দেশ দেয় এই হরমোন। দৈহিক বৃদ্ধি হতে থাকে আমাদের। স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, উচ্চতা বাড়ে... বাড়ে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বড় হই আমরা। নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ে পৌঁছুনোর পর আরেকটা হরমোন এসে থামায় কোষের বিভাজন। কী বলছি বুঝতে পারছ তো?'

‘ছুটিতে এসেও বায়োলজির ক্লাস করতে হবে ভাবিনি,’ হালকা গলায় বলল রানা। তবে মনোযোগ দিয়েই শুনছে ও সব কথা। লর্ড গ্রিফিনের গবেষণার বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কীভাবে সুপার-সোলজার তৈরি করতে চাইছেন ভদ্রলোক?

‘ক্লাস বলছ কেন?’ একটু যেন আহত হলেন লর্ড। ‘বিষয়টা ইন্টারেস্টিং নয়? ভেবে দেখো এণ্ডোক্রিন সিস্টেমে গড়বড় দেখা দিলে কী ঘটবে। বামন হয়ে যাবে মানুষ, কিংবা দৈত্য হয়ে যাবে। মোটা হয়ে যেতে পারে... হয়ে যেতে পারে অস্বাভাবিক রকমের শক্তিশালীও। ওয়েল, এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আমার মাথায় এল এণ্ডোক্রিন সিস্টেম ম্যানিপুলেট করবার আইডিয়া। সোজা ভাষায়, হরমোনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের চিন্তা।’

উত্তেজনা দেখা দিল লর্ডের চেহারায়। ভাইয়ের দিকে তাকালেন, ‘বিষয়টা আমাদের দু’জনকেই আগ্রহী করে তোলে। তাই না, এডগার? মানবদেহের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড নিয়ে মেতে উঠি আমরা। স্টাডি শুরু করি নানা ধরনের হরমোন নিয়ে... যেমন, এইমিন, পেপটাইড, প্রোটিন, স্টেরয়েড...’

‘এতসব জটিল টার্ম মাথায় ঢুকছে না আমার,’ বেরসিকের মত বলল রানা। ‘বুঝতে পারছি আপনি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, কিন্তু সেটা এভাবে জাহির না করলে চলে না?’

বিরক্ত হয়ে ড. হিদোশির দিকে তাকালেন গ্রিফিন। ‘কী করি একে নিয়ে, বলো তো?’

‘শান্ত হোন, স্যর,’ হিদোশি বলল। ‘আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে।’ রানার দিকে ফিরল। ‘লর্ড যা বলতে চাইছেন, সেটা খুব সহজ। নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর গ্রোথ হরমোন আর কার্যকর থাকে না মানুষের শরীরে। দেহ তখন আর বড় হয় না। কিন্তু ভেবে দেখো, হরমোনটা যদি কখনও অচল না হয়, দানবের মত বিশাল হয়ে যাবে না মানুষ? প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠবে না?

গবেষণার মাধ্যমে এটাই করতে চাইছি আমরা। কৃত্রিমভাবে হরমোন বানিয়ে ঢোকাতে চাইছি মানুষের শরীরে, যাতে...'

'সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে ওঠে,' তার মুখের কথা কেড়ে নিলেন গ্রিফিন, 'অতিমানব হয়ে ওঠে সে।'

এডগারের বীভৎস মূর্তির দিকে তাকাল রানা। বলল, 'দেখতেই পাচ্ছি, ব্যর্থ হয়েছেন আপনারা।'

'ভুল। বড়জোর সামান্য সেটব্যাক বলা যায়; ব্যর্থ এখনও হইনি আমরা।'

'কীভাবে ঘটল এসব? আপনার ভাই এমন হলেন কী করে?'

'আগেই বলেছি, .ও নিজেই নিজের এ-দশার জন্য দায়ী। এক্সপেরিমেন্টের জন্য মানুষ পাওয়া না যাওয়ায় স্বেচ্ছায় নিজের শরীরে সিনথেসাইজড হরমোন ইনজেক্ট করে ও। আর প্রথমদিকে পজিটিভ রেজাল্টও পাচ্ছিলাম আমরা। শারীরিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এডগারের—বাড়তে থাকে শক্তি, উদ্যম, স্ট্যামিনা। সন্তুষ্ট হয়ে ডোজ বাড়াই আমরা, আর তখুনি দেখা দেয় সমস্যা। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে শুরু করে এডগারের—কিছুই মনে রাখতে পারত না। সেই সঙ্গে দেখা দেয় খিঁচুনি রোগ। মাথা, হাড়ের জয়েন্ট আর মাংসপেশিতে সার্বক্ষণিক ব্যথা করছে বলে জানায় ও। ধীরে ধীরে আমরা টের পাই, বদলে যাচ্ছে এডগার। এণ্ডোক্রিন সিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ওর দেহে। এই যে বিকৃত রূপটা দেখছ, এসবই ঘটেছে কৃত্রিম হরমোন ইনজেক্ট করার ফলে। মাথার গড়ন বদলে গেছে ওর, চামড়া মোটা হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আর ভোকাল কর্ড। লালা আর ঘামের যেসব গ্রন্থি আছে শরীরে, সেগুলো হয়ে উঠেছে ওভার-অ্যাকটিভ। খ্যাপাটে হয়ে গিয়েছিল, বিনা নোটিশে ভাঙচুর করত, শেষে অনেকদিন ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে আমাদের। বিভিন্ন ধরনের

ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রাগটাকে নিয়ন্ত্রণে এনেছি... ইন ফ্যাক্ট, ও এখন একটা ভেড়ার মত শান্ত... কিন্তু ওর দেহের গঠন আর স্বাভাবিকে ফিরিয়ে আনা যায়নি।'

সস্নেহে ভাইয়ের মাথায় হাত বোলালেন লর্ড গ্রিফিন।

'ওঁকে বন্দি করে রেখেছেন কেন?' এডগারের পায়ে বাঁধা শেকলের দিকে ইশারা করল রানা।

'বাধ্য হয়ে,' বললেন গ্রিফিন। 'এতদিন স্বাধীন ছিল, কিন্তু আজ শেকল না পরিয়ে পারা গেল না। ও তোমাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।'

'মানে!' অবাক হলো রানা। 'উনি তো বরং ধাওয়া করে আমাকে ল্যাবে নিয়ে এলেন।'

'উঁহুঁ, ল্যাবে তুমি নিজেই এসেছ। ও আসলে ধাওয়া করছিল না, তোমার কাছে পৌঁছুবার চেষ্টা করছিল... চেয়েছিল তোমাকে সতর্ক করে দিতে। যাতে তুমি দুর্গ থেকে পালিয়ে যাও। কিন্তু ল্যাবে ঢুকে তুমি বেহুঁশ হয়ে গেলে। এডগার তখন তোমাকে কাঁধে তুলে পালাবার চেষ্টা করেছে। সফল হয়নি। আমাকেও তাই শেকলের আশ্রয় নিতে হলো।'

'আ... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, উনি আমাকে বাঁচাতে চাইছিলেন কেন?'

'মুখে কিছু বলছে না, তবে আমার ধারণা, এর পিছনে আরেকটা ছেলের ভূমিকা আছে।'

'রডনি রাইলি?'

'হুঁ। মাছ ধরতে এসে লেকে ডুবতে বসেছিল সে। এডগার ওকে উদ্ধার করে আমার কাছে নিয়ে আসে। ভেবেছিল আমি চিকিৎসা করব ওর। করিনি বলেই হয়তো এডগার আস্থা হারিয়েছে আমার উপর থেকে। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'কী করেছেন আপনি রডনিকে নিয়ে?'

জবাব দিলেন না লর্ড, রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন।

হিদোশি বলল, 'এখনও বুঝতে পারোনি? এক্সপেরিমেন্টের জন্য জ্যান্ত মানুষ চাই আমাদের। অমন তরতাজা একটা ছেলে...' কথা শেষ করল না সে।

করুণ একটা আওয়াজ করে উঠল এডগার, যেন দুঃখ প্রকাশ করছে। ঘাড়ের পিছনের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল রানার। হিদোশির কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছে। পালা করে তাকাল লর্ড গ্রিফিন আর এডগারের দিকে। দু'জনের মধ্যে কাকে সত্যিকার দানব বলবে?

'এডগারকে নিয়ে যাও, কালহুন,' বললেন গ্রিফিন। 'খাঁচায় আটকে রাখো, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের কাজে আর বাগড়া দিতে না পারে।'

শটগান নেড়ে ইশারা করল কালহুন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল এডগার। পা ঘষটে হাঁটতে শুরু করল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে হাত মুছলেন লর্ড গ্রিফিন। ঠিক করলেন চুল। তারপর ঈলের ট্যাঙ্কের দিকে ফিরে বের করলেন একটা কাঁচের শিশি। ঢাকনা খুলে দুটো ট্যাবলেট ঢাললেন তিনি হাতের তালুতে, হাঁ করে মুখে চালান করে দিলেন ওগুলো।

'তোমার ধারণা আমরা ব্যর্থ হয়েছি?' রানার দিকে এবার এগিয়ে এলেন লর্ড। 'ঠিক তার উল্টো, ছেলে। সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি আমরা। এমন ট্যাবলেট তৈরি করেছি, যা দিয়ে দেহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।'

'গ্রিফিন কাপের দিন ড্যানিকে যেগুলো খাইয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি আড়াল থেকে দেখেছি।'

'ড্যানি অনেকদিন থেকেই ওই ট্যাবলেট খাচ্ছে... অবশ্য খুব

যে আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে তা নয়। তবে ওগুলো খেয়ে দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে ও, বাড়ছে ওর গতি। স্কুলের ওই কম্পিটিশনে চমক দেখাবে ভেবেছিলাম, কপালফেরে সম্ভব হয়নি। আসলে কিছু সাইড-এফেক্ট আছে ট্যাবলেটের—রগচটা করে তোলে মানুষকে, হিংস্রতা বাড়ে; বুদ্ধিও কিছুটা কমে যায়। তাই বলে এসব খারাপ কিছু নয়, যুদ্ধের ময়দানে চালাক সৈনিকের দরকার নেই। দরকার রাগী ও হিংস্র সৈন্য।'

'নিজের ছেলের উপর আপনি এসব পরীক্ষা চালাচ্ছেন?' ভ্রূকুটি করল রানা।

'সমস্যা কোথায়? যদি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে জিততে পারে...'

'কিন্তু জিততে তো পারছে না। গ্রিফিন কাপে হেরেছে ওই ট্যাবলেটের জন্যই। মাথা কাজ করছিল না ওর—বার বার ফলস স্টার্ট নিচ্ছিল... আমাকে ল্যাং মারতে গিয়ে ক্রস-কান্ট্রিতেও হেরেছে।'

'ভুল। ও হেরেছে নিজের দুর্বলতার জন্য। যতই ট্যাবলেট খাক, মানসিকভাবে ও খুব নাজুক। কই, আমিও তো ট্যাবলেট খাচ্ছি, আমার তো কিছু হচ্ছে না। বরং দিনে দিনে আরও শক্তি-সামর্থ্য বাড়ছে আমার।'

'ভয় করছে না, আপনার পরিণতিও যদি মি. এডগারের মত হয়?'

'ও ছিল একটা বোকার হদ্দ। সেরামটার দোষত্রুটি সারাবার আগেই ইনজেক্ট করে বসেছিল নিজেকে, তাও বিপজ্জনক মাত্রায়। ওষুধটা খুবই শক্তিশালী। সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করেই বড় ধরনের পরিবর্তন করা যায় মানুষের শরীরে।'

'আপনার ভাইয়ের পরিবর্তনটা কী ধরনের হয়েছে?'

'নিজের চোখেই তো দেখেছ। বুঝতে পারোনি?'

'কী জানি।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'ওই দেখো,' একটা কাঁচের ট্যাঙ্কের দিকে ইশারা করলেন লর্ড। 'ঈল... ঈলে পরিণত হয়েছে আমার ভাই! ঈল-মানব! হা হা হা।'

'আপন ভাইয়ের দুর্দশায় আপনি হাসছেন?' বিস্মিত গলায় বলল রানা। 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন, লর্ড।'

হাসি থামালেন গ্রিফিন। 'অপমান করছ আমাকে?'

'না। কিন্তু আপনার আচরণ স্বাভাবিক নয়। ভাইয়ের জন্য বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখছি না আপনার মাঝে।'

মনে হলো রেগে গেছেন গ্রিফিন। ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেললেন।

'বিজ্ঞানীরা আর দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়,' চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলল হিদোশি। 'সাধারণ আবেগ-অনুভূতি নিয়ে মাথা ঘামাই না আমরা, কাজ করি গোটা মানবজাতির উন্নয়নের জন্য। আমাদের জন্য গবেষণার ফলাফলটা গুরুত্বপূর্ণ, আর কিছু নয়। গবেষণায় সাফল্যের জন্য যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারি আমরা। মানবতার দোহাই তুললে এখনও কয়েক শ' বছর পিছনে পড়ে থাকত মানবসভ্যতা। চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাই ধরো। মানবদেহের রহস্য জানা না থাকলে আধুনিক চিকিৎসার কোনও অস্তিত্ব থাকত? সেই রহস্য কীভাবে ভেদ করা হয়েছে, জানো? মানুষের দেহ কেটেকুটে।'

'লাশ কেটে,' বলল রানা। 'লাশ আর জ্যান্ত মানুষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে যথেষ্ট তফাৎ আছে।'

'তফাৎ ভাবলে তফাৎ, না ভাবলে নেই।'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল রানা। এদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। প্রসঙ্গ বদলে লর্ড গ্রিফিনকে জিজ্ঞেস করল, 'এতকিছু থাকতে আপনার ভাই ঈল হয়ে গেলেন কেন,

জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' চেহারা প্রসন্ন হয়ে উঠল গ্রিফিনের, শ্রোতাকে আগ্রহী করে তুলতে পেরেছেন। 'কারণ কৃত্রিমভাবে যে-হরমোন ওর শরীরে ইনজেক্ট করা হয়েছে, সেটা আমরা পেয়েছি ঈলের গ্ল্যাণ্ড থেকে। আরেকটু ব্যাখ্যা করি। দুর্গের লোকেশন তো দেখেছ, সিলভারব্যাক লেকের মাঝখানে রয়েছি আমরা। লেকটা ইয়োরোপিয়ান ঈলের আখড়া। শুরুতে আমরা যত গবেষণা করেছি, তার বর্জ্য... মানে, বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, রক্ত, হরমোন, ইত্যাদি... গিয়ে পড়ত লেকে। আমাদের ব্যর্থ গবেষণার সেসব বর্জ্য খেয়ে শান্তশিষ্ট ঈলগুলো হঠাৎ করে বদলে যেতে শুরু করল। আকার বাড়ল ওদের, স্বভাব-চরিত্র হয়ে উঠল হিংস্র... আগ্রাসী। ঠিক যেমনটা আমরা চাই। পুরোটাই ছিল অনিচ্ছাকৃত, বুঝলে? আর সেটাই হয়ে উঠল আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। বলে রাখা ভাল, আর দশটা মেরুদণ্ডী প্রাণীর মত ঈলদেরও এণ্ডোক্রিন সিস্টেম আছে। ওদের পরিবর্তন চোখে পড়ার পর বুঝতে পারলাম, মানুষের এণ্ডোক্রিন সিস্টেম যা পারছে না, সেটা ঈলের সিস্টেম পারছে। লেকে বেশি করে সেরাম ফেলতে থাকলাম আমরা, ঈলদের করে তুললাম খুনে রাক্ষস। লেকের মুখে একটা বাঁধও তৈরি করেছি, যাতে নতুন ঈলেরা ঢুকতে পারে ভিতরে, কিন্তু বেরুতে না পারে। এরপর মডিফায়েড ঈল ধরে ওদের গ্ল্যাণ্ড থেকে হরমোন সংগ্রহ করলাম আমরা, তৈরি করলাম নতুন সেরাম। সেই সেরামই এডগার ইনজেক্ট করেছিল নিজের দেহে। প্রথমদিকে ওতেও সমস্যা ছিল, তাই বাজে রিঅ্যাকশনের শিকার হয়েছে এডগার। তবে ওর কেস থেকে শিক্ষা নিয়ে সমস্ত খুঁত সারিয়ে নিয়েছি আমরা, সেরাম থেকে তৈরি করা ট্যাবলেট এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও কার্যকর।'

ছোট একটা নেট নিয়ে কাঁচের ট্যাঙ্কে ডোবালেন গ্রিফিন,

উঠিয়ে আনলেন একটা প্রমাণ সাইজের ঈল। ল্যাবরেটরির টেবিলে এনে ফেললেন, চেপে ধরলেন দু'হাতে। ভয়ানকভাবে শরীর মোচড়াচ্ছে ঈল, ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

'দেখো ওকে!' গর্বের সুরে বললেন গ্রিফিন। 'রাক্ষস... রাক্ষস একটা! এমনিতে ঈল শান্ত প্রাণী, ছোট ছোট মাছ ছাড়া কিছুই খায় না। কিন্তু এরা দল বেঁধে গোটা একজন মানুষকে সাবড়ে দিতে পারে। দরকার শুধু এক ফোঁটা রক্ত। সচরাচর বড় প্রাণী দেখলে আক্রমণ করে না, কিন্তু রক্তের গন্ধ পেলেই উন্মাদ হয়ে যায় হাঙরের মত। শিকারের আকার-আকৃতির আর পয়োয়া করে না, হামলা চালায় দলবদ্ধ হয়ে। কিংবদন্তির সিলভারব্যাক, বা ইটেরেয়াজিডের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। আমার প্রজেক্টের নামও তাই সিলভারব্যাক।'

হিংস্র ঈলের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল রানার। বলল, 'কাজটা ঠিক করছেন না আপনি। প্রকৃতিকে নিয়ে খেলছেন। নষ্ট করছেন ইকো-সিস্টেম। কোনোভাবে এরা যদি লেক ছেড়ে বেরুতে পারে, কী ঘটবে ভেবে দেখেছেন? নদী-নালায় অন্যান্য মাছের অস্তিত্ব থাকবে না।'

'অন্য মাছ নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাতে যাব?' তাচ্ছিল্য ফুটল লর্ডের গলায়। 'ঈলেরা নিজেরাই তৈরি করবে নতুন ইকো-সিস্টেম। আমার লেকে এখন আর কোনও মাছ নেই, তাই বলে কি পরিবেশ উচ্ছন্নে গেছে?'

'কিন্তু এটা স্বাভাবিক নয়,' একগুঁয়ের মত বলল রানা। 'আপনার কোনও অধিকার নেই প্রকৃতির উপর খবরদারি করার। যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেভাবেই থাকতে দেয়া উচিত। পরিবর্তন যদি কিছু করতেই হয় তো সেটা প্রকৃতি করবে... বিবর্তনের মাধ্যমে। অনাদিকাল থেকে তা-ই হয়ে আসছে।'

‘বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি, ছোকরা। দুনিয়ার হাল-হকিকত কিচ্ছু জানো না। সবলরাই শুধু এখানে টিকে থাকতে পারে, দুর্বলরা হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। আমি তো মানুষকে সবল করতে চাইছি। এতে ক্ষতি কোথায়?’

‘যেভাবে করতে চাইছেন, সেটাই ক্ষতি। সেটা অস্বাভাবিক, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে, আপনার ভাই-ই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।’

‘সেক্ষেত্রে তোমার জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করতে পারছি না আমি। থাকো তুমি তোমার ওই নীতি নিয়ে। এই নীতিই ডোবাবে তোমাকে... মরণ ডেকে আনবে।’

রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ঈলটাকে একটা কাঠের ডিসেক্টিং বোর্ডের উপর রাখলেন লর্ড গ্রিফিন। টেবিলের নিচ থেকে তুলে নিলেন একটা লোহার স্পাইক। একহাতে ঈলকে ধরে ঘ্যাচ করে স্পাইকটা গেঁথে দিলেন ওটার গায়ে।

ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

বাইশ

শরীর ফুঁড়ে ডিসেক্টিং বোর্ডে গেঁথে গেছে স্পাইক, আটকা পড়েছে ঈলটা। ক্ষত দিয়ে গলগল করে বেরুনো রক্ত আর ফেনার মাঝে মোচড় দিচ্ছে পাগলের মত, তেজ কমেনি একটুও।

হাসিমুখে লর্ড গ্রিফিন বললেন, ‘কী অপূর্ব প্রাণশক্তি, দেখেছ?

এত বড় একটা ক্ষত হবার পরেও নড়ছে কীভাবে! এই প্রাণশক্তিই যদি একজন মানুষের ভিতর দেয়া যায়? এমন একজন সৈনিকের কথা কল্পনা করো—আকার ও দৈহিক শক্তিতে অতুলনীয়, তার গায়ে রয়েছে লোহার মত শক্ত, পুরু চামড়া... একই সঙ্গে সে অনুগত, হিংস্র এবং অপ্রতিরোধ্য। এমন সৈনিকের সামনে কে দাঁড়াতে পারবে? এটা অলীক কল্পনা নয়। আমার সেরাম প্রায় রেডি—ঈলের শরীর থেকে নেয়া গ্রোথ হরমোন, অ্যাড্রেনালিন, টেস্টোসটেরন আর হাজারো কেমিক্যালের সুচারু কম্বিনেশনের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে সেটা। খুব শীঘ্রি আমি দুনিয়াকে উপহার দেব মানব-ইতিহাসের প্রথম সুপার-সোলজার।' রানার হাত ধরে টানলেন তিনি। 'এসো, তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখাই।'

লর্ডের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল রানা, ওদেরকে অনুসরণ করল হিদোশি। দু'পাশে সার বাঁধা ওঅর্কবেঞ্চ, তাতে অসমাপ্ত বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের উপকরণ পড়ে আছে—মৃত শুয়োর, পেট কাটা ঈল, ছুরি, কাঁচি, মাইক্রোস্কোপ, বার্নার, কাগজপত্র, ইত্যাদি। ডানজনের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা এক সারি নিচু খাঁচার সামনে পৌঁছে থামল। তালা ঝুলছে সবগুলো খাঁচার দরজায়।

হাঁটতে হাঁটতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনছিল রানা, বুঝতে পারছিল না কীসের আওয়াজ। খাঁচার সামনে পৌঁছে স্বচক্ষে দেখল। একটা শুয়োর। তবে সাধারণ শুয়োর বলা যাবে না ওটাকে। আকারে প্রায় দানব বলা চলে, কিন্তু মাথাটা অনেক ছোট, ঠিকমত বাড়েনি। আশপাশে তাকাল রানা। সব খাঁচাতেই একটা করে শুয়োর রয়েছে, সবগুলোই বিকৃত। কোনোটা কঙ্কালসার, কোনোটার গলা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনে, কোনোটার চোখ নেই, কোনোটার আবার শরীরের চেয়ে মাথা বড়। একমাত্র মিল ওদের হাবভাবে—কাতর আওয়াজ করছে

প্রতিটা শুয়োর। চেহারায় ফুটে আছে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। তাকিয়ে থাকা যায় না। নিজের অজান্তেই চোখ ফিরিয়ে নিল রানা।

কালহুন এগিয়ে এল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। লোকটাকে দেখতে পেয়েই চঞ্চল হয়ে উঠল শুয়োরগুলো। কয়েকটা ভয়ে গুটিয়ে গেল, কয়েকটা আবার ক্রুদ্ধ ডাক ছাড়ল তার উদ্দেশে।

'ওরা তোমাকে চিনতে পারছে, কালহুন,' সকৌতুকে বললেন লর্ড গ্রিফিন।

'অ্যাই, চুপ!' খেঁকিয়ে উঠল কালহুন।

'এরা আমার টেস্ট সাবজেক্ট,' রানাকে বললেন গ্রিফিন। 'মানুষ পাওয়া না যাওয়ায় শুয়োরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে।'

'প্রত্যেকটা শুয়োরকে সিলভারব্যাক সেরামের বিভিন্ন ভার্শান ইনজেক্ট করা হয়েছে,' যোগ করল হিদোশি। 'প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন রেজাল্ট পেয়েছি আমরা। সিরিয়ালি রাখা হয়েছে সবক'টাকে। একদম বামে রয়েছে ফার্স্ট ভার্শান, আর এই যে...' একটা খাঁচা দেখাল সে, 'একে ইনজেক্ট করা হয়েছে আজ সন্ধ্যায়।'

শুয়োরটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা, কাত হয়ে শুয়ে আছে খাঁচার নোংরা মেঝেতে—সন্ধ্যায় এটাকেই বাইরের খোঁয়াড় থেকে ধরে এনেছিল কালহুন, আনার সময় আরেকটা শুয়োরছানাকে লাথি মেরে খুন করেছিল।

'ওটাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে,' রানার আগ্রহী দৃষ্টি লক্ষ করে জানালেন লর্ড গ্রিফিন। 'এখুনি কোনও পরিবর্তন দেখতে পাবে না, আরও কয়েক ডোজ দেবার পর শুরু হবে খেলা। ফলাফল দেখে সেরামের কম্পোজিশন সংশোধন করব আমরা—পুরোটাই ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর বেসিসের কাজ। অনেকদিন থেকে করছি। পারফেকশনের কাছাকাছিও পৌঁছে গেছি বলতে পারো। এদিকে তাকাও, এই দেখো সাবজেক্ট নাম্বার নাইন...

আমাদের সবচেয়ে সফল এক্সপেরিমেন্ট ও।'

তাকাল রানা। লর্ডের বক্তব্যের সত্যতা টের পেল। মোটামুটি সুষমভাবে বেড়ে ওঠা একটা শুয়োর দেখতে পেল। মাথা, শরীর, পা... সবকিছু একই হারে বেড়েছে। সাধারণ শুয়োরের চেয়ে আকারে দ্বিগুণ ওটা, গায়ের চামড়া দেখে গণ্ডারের কথা মনে আসে। জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো, তাতে খুনের নেশা। রানাকে তাকাতে দেখেই হিংস্র ভঙ্গিতে হাঁ করল, বেরিয়ে এল ধারালো দাঁতের সারি। মনে হলো ঝাঁপ দেবে ওকে লক্ষ্য করে, কিন্তু দিল না। উল্টো ঘুরে খাঁচার পিছনে চলে গেল। এবার জন্তুটার খুঁত দেখতে পেল রানা—পিছনের পা-দুটো খুবই শীর্ণ, প্রায় অচল। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে হাঁটছে।

'ইমপ্রেসড?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলেন গ্রিফিন।

'হুঁ,' রানা বলল। 'গবেষণা তো প্রায় সফলই মনে হচ্ছে। ট্যাবলেটও তৈরি করেছেন। তা হলে বাকি রইল কী?'

'ট্যাবলেটটা খুব স্বল্প মাত্রার। ওতে বড় কোনও পরিবর্তন হয় না মানবদেহে। র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জের জন্য চাই হাই ডোজের সেরাম। সেটাই বানাতে চাইছি আমরা। তা ছাড়া শুয়োরের বেলায় সফল হলেই যে সেটা মানুষের শরীরে কাজ করবে, তা তো নয়। অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজন হবে। সেটাও ট্রায়াল অ্যাণ্ড এরর বেসিসেই করতে হবে আমাদের।'

একটা খাঁচার ভিতরে এডগারকে দেখতে পেল রানা, কুঁজো হয়ে বসে আছে। দুখি চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে।

'আপনার সেই ট্রায়াল আরও কতজন এডগারের সৃষ্টি করবে, তা ভেবেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেটা খুবই মামুলি ব্যাপার।'

অসুস্থ বোধ করছে রানা। জানতে চাইল, 'রডনি কোথায়? কী করেছেন আপনারা ওকে নিয়ে?'

'ওর কথা না তোলাই ভাল,' হিদোশি বলল। 'বড়ই নাজুক স্পেসিমেন ছিল ছেলেটা।'

'মানে?'

'গাঁয়ের গরিব ছেলে যেমন হয় আর কী। দুর্বল, অপুষ্ট। খাইয়ে-দাইয়ে যতটা পেরেছি ওকে সবল করে তুলেছিলাম আমরা। যদিও তাতে কোনও লাভ হয়নি। সেরামের প্রভাব সহ্য করতে পারেনি ও। প্রথম ডোজ দেবার সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করেছেলেটা।'

'ভয় পেয়েও সেটা ঘটতে পারে,' বললেন লর্ড গ্রিফিন। 'ঠিক কী ঘটেছিল বলা মুশকিল।'

'ট্র্যাজেডি, কী আর বলব!' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল হিদোশি। 'বহুদিন পর একটা হিউম্যান ট্রায়াল করলাম, অথচ তার ফলাফল দেখা গেল না। মরার পরে যতটুকু স্টাডি করা যায়, তা-ই করতে হয়েছে। লাশটা কেটে-কুটে...'

'থামুন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'এসব আমি শুনতে চাই না।'

'শান্ত হও,' ওর কাঁধে হাত রাখলেন গ্রিফিন। 'এসব তোমার মঙ্গলের জন্যই বলা হচ্ছে। রডনিকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেছিলাম আমরা, কী করতে চলেছি কিছুই বলিনি। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হার্টফেল হয়তো সেই কারণেই করেছে। অমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না আমরা। তাই তোমাকে সব খুলে বলছি, যাতে স্বেচ্ছায় অংশ নিতে পার আমাদের এক্সপেরিমেন্টে।'

'এতকিছু শোনার পর... সবকিছু দেখার পরও আমাকে ভয় পেতে মানা করছেন?'

'হ্যাঁ। কারণ রডনির ঘটনার পর গবেষণায় আরও অগ্রগতি হয়েছে আমাদের। উন্নতি হয়েছে আমাদের সেরামের। তা ছাড়া তুমি শক্ত-সমর্থ ছেলে। রডনির তুলনায় বয়সেও বড়, শরীরও তাগড়া। সন্দেহ নেই ওর চেয়ে অনেক বেশি সময় টিকবে তুমি

আতঙ্ক নিয়ে এডগার গ্রিফিন আর খাঁচায় বন্দি বিকৃত শুয়োরগুলোর দিকে তাকাল রানা। ভাবতেই পারছে না ওর অবস্থাও এদের মত হবে। মাথা খারাপের মত হয়ে গেল ওর, আচমকা পাশ ফিরে সজোরে হাঁটু চালাল লর্ড গ্রিফিনের উরুসন্ধিতে। গুঙিয়ে উঠলেন লর্ড, রানার কাঁধ থেকে হাত সরে গেল তাঁর। লোকটাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরাল রানা, ছুট লাগাল পাগলের মত। যেভাবে হোক পালাতে হবে উন্মাদ বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরি থেকে।

সিঁড়ি ধরে দুদ্দাড় করে ব্যালকনির মত প্ল্যাটফর্মটায় উঠে এল ও। লোহার ভারী দরজাটা বন্ধ, কোনও হাতল নেই এপাশে। আছে স্রেফ একটা চাবির ফুটো। তালা না খুলে বেরুনো সম্ভব নয়।

বিড়বিড় করে ভাগ্যকে দোষারোপ করল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। একটা অস্ত্র চাই, দু-একজনকে ঘায়েল না করে হার মানবে না। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে কিছুই নেই। তাই নামতে শুরু করল নিচে। ল্যাবে ছুরি-কাঁচি বা অ্যাসিডের অভাব নেই, একটা কিছু জোগাড় করে নেবে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি নামতেই বাঁয়ে আরেকটা দরজা দেখা গেল। গায়ে বড় করে লেখা: *বিপজ্জনক! দাহ্য পদার্থ!* ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল ওর। এখানে নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল হাসিটা। এ-দরজাতেও তালা দেয়া।

আঘাত সামলে নিয়েছেন লর্ড গ্রিফিন। নিচ থেকে গলা চড়িয়ে বললেন, 'সব দরজা বন্ধ, রানা। ওগুলো রিইনফোর্সড স্টিলে গড়া, ভাঙতে পারবে না। ডানজনে কোনও জানালাও নেই। পালাতে পারবে না তুমি। ভালয় ভালয় আত্মসমর্পণ করো। আমি চাই না তোমার কোনও ক্ষতি হোক। এক্সপেরিমেন্টের জন্য তোমাকে অক্ষত চাই আমার।'

'কক্ষনো না!' চেঁচাল রানা।

কালহুন ছুটে এসেছে সিঁড়ির গোড়ায়। সাবধানী পদক্ষেপে উঠতে শুরু করেছে উপরে। হিসহিসে গলায় বলল, 'কাছে এসো, খোকা। লড়তে যদি চাও তো আমি তৈরি!'

পিছিয়ে প্ল্যাটফর্মে আবার উঠে এল রানা। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। একবার ভাবল জল ঢেলে দেয় ওদের পরিকল্পনায়... প্ল্যাটফর্ম থেকে পাথুরে মেঝেতে ডাইভ দিয়ে আত্মহত্যা করে... কিন্তু কেন যেন সায় পেল না। অন্তরের গভীরে কীসের যেন শিখা জ্বলে উঠেছে। ধৈর্য ধরতে বলছে ওকে, সাহস জোগাচ্ছে—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। বেঁচে থাকলে পালাবার সুযোগ মিলবে। শাস্তিও দিতে পারবে এই মানুষরূপী পিশাচদেরকে।

'কী করবে বলে ভাবছ, রানা?' হাসলেন লর্ড গ্রিফিন। 'কেন বাধা দিচ্ছ? পালাবার পথ নেই, এখানে তোমাকে সাহায্যও করবে না কেউ। দুর্গ থেকে বেরুতে পারবে না কোনোদিন। নাকি ভাবছ লড়াই করবে? সামান্য এক স্কুলছাত্র তুমি, পারবে আমাদের এতজনের সঙ্গে?'

জবাব দিল না রানা। কালহুনের উপর সেঁটে রয়েছে ওর চোখ। প্ল্যাটফর্মে উঠে এসেছে সে, পায়ে পায়ে এগোচ্ছে দু'হাত বাড়িয়ে। মাথা নিচু করে ডাইভ দিল রানা, গুঁতো মারল লোকটার তলপেটে। হুঁক করে একটা আওয়াজ করল কালহুন, ছিটকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। এক লাফে তাকে পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল রানা, একেক লাফে কয়েক ধাপ পেরিয়ে নেমে এল নিচে। অস্ত্র চাই... অস্ত্র!

দেয়ালে ঝোলানো একটা লাল রঙের কুঠার চোখে পড়ল ওর—ফায়ার ফাইটিঙের উপকরণ। ওটার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু পৌঁছুতে পারল না। ল্যাবের কোণে যে আরও দু'জন মানুষ

লুকিয়ে আছে, জানা ছিল না ওর। লর্ডের দুই দেহরক্ষী। ও কুঠারের কাছাকাছি যেতেই ছায়া থেকে ঝাঁপ দিল তারা। রানাকে পেড়ে ফেলল মেঝেতে। উপুড় করে ঠেসে ধরল, দু'হাত মুচড়ে নিয়ে এল পিঠের উপর। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। নড়তে পারছে না আর।

'গুড জব,' দুই দেহরক্ষীর প্রশংসা করলেন লর্ড গ্রিফিন। 'এক রাতের জন্য যথেষ্ট খেলাধুলা হয়েছে, ওকে টেবিলে নিয়ে এসো। স্ট্র্যাপ দিয়ে ভাল করে বাঁধো হাত-পা। হিদোশি, সিলভারব্যাক সেরামের লেটেস্ট ব্যাচটা আনো।'

রানাকে শূন্যে তুলে ফেলল পালোয়ানের মত দুই দেহরক্ষী। বাতাসে হাত-পা ছুঁড়ল ও, কোনও লাভ হলো না। দড়াম করে ওকে ফেলা হলো একটা ল্যাব টেবিলের ওপর। ব্যথায় দম আটকে এল ওর। টের পেল, ঝটপট স্ট্র্যাপ লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। একটু পর আর নড়বার উপায় রইল না।

রানার মুখের উপর ঝুঁকলেন লর্ড গ্রিফিন, আগুনের মত জ্বলছে দু'চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'তোমার কপাল ভাল যে এক্সপেরিমেন্টের জন্য অক্ষত সাবজেক্ট চাই আমি। নইলে ভয়ানক শাস্তি দিতাম তোমাকে, অবাধ্য ছেলে! ঠিক যেভাবে ওই মোটকা ডিটেকটিভটাকে দিয়েছিলাম। শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে ওকে ফেলে দিয়েছিলাম লেকে, ঈলের খোরাক হিসেবে।'

'আপনি হ্যামারকেও খুন করেছেন?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হলো রানার।

'করবে না?' লর্ডের হয়ে জবাব দিল হিদোশি। 'আমাদের উপর নজরদারি করছিল লোকটা, চেষ্টা করছিল গবেষণার গোমর জানতে। বাধ্য হয়ে ওকে ধরে আনতে হলো। কে পাঠিয়েছে ওকে, কেন পাঠিয়েছে... জানার অনেক চেষ্টা করেছি আমরা। ব্যাটা কিছুতেই বলল না। তাই কী আর করা, ওকে ফেলে দিতে

হয়েছে লেকে। টেস্ট সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা গেলে ভাল হতো, কিন্তু সেটা নিরাপদ ছিল না। ওর মত লোক গায়েব হলে গোয়েন্দামহলে হৈচৈ পড়ে যেত, আরও দশটা গোয়েন্দা ছুটে আসত ওর অন্তর্ধান-রহস্য ভেদ করতে। অ্যাকসিডেন্টের নাটক সাজিয়ে বন্ধ করা হয়েছে সে-পথ। পুলিশ ডেকে ওদের সামনেই উদ্ধার করা হয়েছে লাশ। ভাল বুদ্ধি, কী বলো?'

চুপ করে রইল রানা।

'কাজেই সাবধান!' বললেন গ্রিফিন। 'বাড়াবাড়ি করলে তোমার দশাও ওই ডিটেকটিভের মতন হবে। শাস্তি এমনিতেও পাওনা হয়েছে তোমার।'

'চিন্তা করবেন না, স্যর,' পিছন থেকে বলল হিদোশি। 'সেরামটাই আপনার হয়ে শাস্তি দেবে ওকে। শোনো, খোকা, আর বাধা দিয়ো না। শরীরের পেশি শিথিল করে রাখো, যাতে সহজে সুঁই ঢোকাতে পারি। নইলে নিজেই ব্যথা পাবে। সুঁই যদি ভাঙে...'

চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা, লোকটার কথা আর শুনছে না। পুরোটাকেই ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন ভাবতে চাইছে, ঘুম ভাঙলেই দেখবে ফুপুর কটেজের পরিচিত বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে কদাকার শুয়োর আর এডগারের বীভৎস চেহারা। শিউরে উঠল ওর অবস্থাও ওদের মত হতে চলেছে ভেবে।

হাতে ভেজা স্পর্শ অনুভব করল রানা, নাকে ভেসে এল অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ। তুলো দিয়ে ইনজেকশনের জায়গাটুকু পরিষ্কার করছে হিদোশি। কয়েক মুহূর্ত পর একটা কাঁচের শিশির ছিপি খোলার আওয়াজ শুনল।

কথা বলছেন লর্ড গ্রিফিন হিদোশির সঙ্গে।

'প্রাইমারি ডোজে এক শ' পঁচাত্তর মিলিগ্রাম দিলেই চলবে...'

'হুঁ... বারো ঘণ্টা পর পর দশ মিলিগ্রাম বাড়াব আমরা...'

'...ডায়েট ফলো করতে হবে ঠিক নিয়ম ধরে...'

'...ঠিক আছে, দাও ইনজেকশন...'

হাতের ভাঁজে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা অনুভব করল রানা, সুঁই ঢোকানো হয়েছে রক্তনালীতে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল ও। সুঁই বের করে নেয়া হলো কয়েক সেকেণ্ড পর। ক্ষতস্থানটা জ্বালাপোড়া করে উঠল রানার। ধীরে ধীরে বাড়ছে সেই জ্বালা। হাত থেকে শুরু করে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। যেন আগুন ধরে গেছে ওর শিরায়-উপশিরায়। ছটফট করতে লাগল রানা। আগুনের হলকা অনুভব করছে ও সারা দেহে, যেন জীবন্ত ঝলসানো হচ্ছে ওকে। একই সঙ্গে শরীরের ভিতরে অনুভব করছে প্রচণ্ড চাপ। চাপের মুখে সমস্ত হাড় যেন জয়েন্ট খুলে বেরিয়ে আসবে মাংস ফুঁড়ে। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে চোখ। ফুসফুস যেন ফেটে যাবে। শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে কানের পর্দায়। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপতে থাকল ও, ক্ষণে ক্ষণে খিঁচুনি দিচ্ছে পুরো শরীর। চিৎকার করে উঠল ব্যথায়। মুখের ভিতরে বমি উঠে আসায় ঘড়ঘড় শব্দ উঠল একটু পরেই।

কোনও ভাবান্তর হলো না লর্ড গ্রিফিন বা হিদোশির মধ্যে। বুকের উপর হাত ভাঁজ করে রানার দুর্দশা দেখছেন লর্ড। নোটবুক বের করে রানার উপসর্গ টুকে নিচ্ছে হিদোশি।

অসহ্য ব্যথায় এক পর্যায়ে জ্ঞান হারাল রানা। তাও থামল না খিঁচুনি। থামল পুরো বিশ মিনিট পর। জ্ঞান ফিরলে রানার মনে হলো পেরিয়ে গেছে অনন্তকাল। ব্যথা দূর হলেও শরীর হয়ে গেছে একেবারে নির্জীব।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন গ্রিফিন, তারপর ইশারা করলেন দুই দেহরক্ষীকে। স্ট্র্যাপ খুলে রানাকে টেবিল থেকে নামাল ওরা। কুঁজো হয়ে হড় হড় করে বমি করে দিল ও, তার খানিকটা ছিটকে

পড়ল লর্ডের চকচকে জুতোয়।

গাল দিয়ে উঠলেন গ্রিফিন, কড়া গলায় কালহুনকে বললেন ওকে নিয়ে যেতে। দু'পাশ থেকে দুই দেহরক্ষী ধরল রানাকে, নিয়ে চলল কালহুনের পিছু পিছু। রানার শরীরে তখন একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই, আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে দেখল, ল্যাব থেকে বের করা হলো ওকে। সরু কয়েকটা প্যাসেজ পেরিয়ে নিয়ে আসা হলো প্যাঁচানো একটা সিঁড়ির সামনে। নামানো হলো দুর্গের নিচের আরেকটা অংশে।

নিচে প্রকাণ্ড এক দরজা। কোমর থেকে আদ্যিকালের এক চাবি বের করল কালহুন, প্রায় এক ফুট লম্বা; সেটা দিয়ে দরজার তালা খুলে ফাঁক করল পাল্লা। ধাক্কা দিয়ে রানাকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো ভিতরে।

'গুডনাইট, খোকা! কুৎসিত ভঙ্গিতে বলল কালহুন। পেটে হাত বোলাল। 'ভেবো না গুঁতোটার কথা আমি ভুলে যাব। উপযুক্ত শাস্তি পাবে এরজন্যে... যথাসময়ে। এখন ঘুমাও।'

দরজাটা টেনে দিল সে। চাবি ঘোরানোর শব্দের সঙ্গে আটকে গেল তালা।

ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল রানা।

ক্লান্ত।

পরিশ্রান্ত।

কোনও কিছুই আর স্পর্শ করছে না যেন ওকে।

তেইশ

মিটিমিটি আলো জ্বলছে কামরার ভিতর। প্রাচীন, ধূসরবর্ণ গ্র্যানিটের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছে রানা। আর্দ্রতার কারণে সবুজ আর হলুদ রঙের শ্যাওলা পড়েছে দেয়ালের গায়ে, সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র কারুকাজের। মেঝের পাথর বেয়ে উঠে আসছে ঠাণ্ডা, দু'হাটু বুকের কাছে এনে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ও, কাঁপছে হি হি করে।

হতাশায় ছেয়ে গেছে রানার অন্তর। সব শেষ। এখানে... মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে, বিদেশি এক দুর্গের নিচে মৃত্যু হবে ওর। রডনি রাইলির মত ও-ও হারিয়ে যাবে চিরতরে। কিচ্ছু করার নেই। একটুও শক্তি পাচ্ছে না, পুরো শরীর যেন দুরমুজ-পেটা করা হয়েছে। ইচ্ছে করছে ঘরের কোণে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়তে। ঘুম এসে মুক্তি দিক ওকে। চিরঘুম।

না!

সচকিত হয়ে উঠল রানা—বুকের গহীনে ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠেছে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে। এত সহজে হার মানতে দেবে না ওকে। ঝট্ করে সোজা হলো ও, উঠে দাঁড়াল। টলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, তাড়াতাড়ি দেয়াল ধরে তাল সামলাল। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করল ও, এরপর শুরু করল পায়চারি। মাথা ঘামাবার চেষ্টা করছে। কিছু একটা করতেই হবে

ওকে। একটা পরিকল্পনা চাই। হাল ছাড়লে চলবে না। এরফান চাচার কথা মনে পড়ল। তিনিও ওর মতই বন্দি হয়েছিলেন, বাঁচার কোনও আশা ছিল না, তাই বলে তো হাল ছাড়েননি তিনি। ঠিকই পালিয়েছিলেন শক্রঘাঁটি থেকে। সেই চাচার ভাতিজা হয়ে ও কী করে হাল ছাড়ে?

রেডের কথাও মনে পড়ল ওর। আহত অবস্থায় দুর্গের বাইরে অপেক্ষা করছে সে, রানার সাহায্য ছাড়া একাকী ফিরতে পারবে না। এখানে রানার আটকে থাকা মানে ওরও ধরা পড়া, এবং মৃত্যু। না, তা হতে দেয়া যায় না। পালাতে হবে... যেভাবেই হোক। দুর্ভেদ্য কারাগার বলে কিছু নেই, অনেকদিন আগে একটা বইয়ে পড়েছিল রানা। যে-কোনও বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার একটা না একটা রাস্তা থাকেই—সেটাই খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

প্রথম কাজ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ খুঁটিয়ে দেখা। হেঁটে হেঁটে পুরো প্রকোষ্ঠে চক্কর দিল রানা। প্রায় বর্গাকার একটা কামরা, ছাতটা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ উঁচুতে। দেয়ালে বড় বড় ফোকর দেখতে পেল, কাঠের বিম লাগানো ছিল কোনও এক কালে। তারমানে আরেকটা কামরা ছিল উপরে। এখন আর নেই। বিম, মেঝের তক্তা, সব খুলে ফেলা হয়েছে। চারপাশের দেয়ালে টোকা দিয়ে কান পাতল। না, ফাঁপা নেই কোথাও। দেয়ালগুলো কয়েক ফুট পুরু পাথর দিয়ে তৈরি।

একটাই দরজা প্রকোষ্ঠে। মাথার বিশ ফুট উপরে একটা ছোট্ট জানালা আছে, মোটা মোটা গরাদ লাগানো রয়েছে সেটাতে। টিকটিকি ছাড়া আর কারও পক্ষে ওখানে ওঠা সম্ভব নয়। উঠলেও ওই গরাদ ভেঙে বেরুনো অসম্ভব।

ভুরু কুঁচকে জানালার দিকে তাকাল রানা। কোনও আলো আসছে না। তারমানে এখনও ভোর হয়নি। ক'ঘণ্টা কেটেছে দুর্গে

ঢোকার পর? বোঝার উপায় নেই।

জানালার উল্টোপাশের দেয়াল থেকে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ বালব। বিদ্যুতের তার এসেছে কয়েক ফুট দূরের একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে। ওদিক দিয়েও বেরুনোর প্রশ্ন আসে না।

এবার মেঝের দিকে মনোযোগ দিল রানা। চ্যাপ্টা পাথরের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি হয়েছে মেঝে। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে একদম মসৃণ হয়ে গেছে উপরটা। কোনোভাবে একটা স্ল্যাব সরানো যায় কি না ভাবল ও, কিন্তু দমে গেল পরক্ষণে। তলায় মাটি-পাথর ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। ওখান দিয়ে বেরুতে চাইলে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হবে, যার উপকরণ বা সময় নেই ওর হাতে।

বাকি রইল একটামাত্র জিনিস। প্রকোষ্ঠের পিছনদিকে, মেঝেতে বসানো আছে একটা মোটা গ্রিল, তলার একটা গর্তকে ঢেকে রেখেছে ওটা। কাছে গিয়ে উবু হলো রানা, উঁকি দিল নিচে। না, গর্ত নয়, একটা শাফট। মাটি-পাথর খুঁড়ে একটা শাফট তৈরি করা হয়েছে ওখানে... কতকালের পুরনো কে জানে, কিনারাগুলো পাথর দিয়ে বাঁধানো। শাফটের ভিতরটা অন্ধকার, তলায় কী আছে বোঝা যাচ্ছে না।

বয়সের ভারে গ্রিলের কিনারার সিমেন্ট ফেটেফুটে গেছে, আলগা একটা টুকরো তুলে নিল রানা, ফেলল শাফটের ভিতরে। এক মুহূর্তের নীরবতা... তারপরেই টুপ করে একটা শব্দ ভেসে এল।

পানি... পানি রয়েছে শাফটের তলায়। ওটা আসলে একটা কুয়া। আগের আমলে এই কুয়ার পানিই হয়তো ব্যবহার করত দুর্গের অধিবাসীরা। এখন আর প্রয়োজন হয় না বলে গ্রিল লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গ্রিল ভাঙা সম্ভব নয়, তাই কুয়ার পাশ থেকে সরে এল রানা। হতাশা আরও বেড়েছে। নাহ্, এই ঘর থেকে পালানো অসম্ভব।

অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হবে—পরেরবার ওকে যখন এখান থেকে বের করা হবে। যদি কখনও বের করা হয় আর কী।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আবার বসে পড়ল ও। হাঁটু মুড়ে নিয়ে এল বুকের কাছে। চোখ চলে গেল জুতোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত খেলে গেল চিন্তাটা।

জুতো! ওর জুতোর হিলে তো লুকানো আছে ছুরি! কী আশ্চর্য, ভুলেই গিয়েছিল! ত্রস্ত হাতে ফিতে খুলল রানা। লুকানো খোপ থেকে বের করে আনল ছোট্ট ফোল্ডিং নাইফ। ভাঁজ খুলে হাতে নিতেই একটু সাহস পেল বুকে। ছোট হোক, তাও একটা অস্ত্র তো!

খুশিটুকু মিলিয়ে যেতে সময় লাগল না। পুঁচকে এই ছুরি কী কাজে লাগবে ওর? না পারবে কাউকে ঘায়েল করতে, না পারবে পাথর বা মাটি খুঁড়তে।

কিন্তু দরজা?

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে ছুটে গেল রানা।

পাল্লাটা প্রকাণ্ড। তৈরি করা হয়েছে ওক কাঠের মজবুত তক্তা দিয়ে—বয়সের ভারে পাথরের মত শক্ত আর কালো হয়ে গেছে। অতিকায় রিভেট আর বোল্ট দেখে মনে হচ্ছে একটা হাতিকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওটা। পাল্লার গায়ে লাগানো তালাটাও বেশ বড়, চাবির ফুটো দিয়ে অনায়াসে একটা ইঁদুর ঢুকে পড়তে পারবে। রূপকথার গল্পে পড়া দৈত্যের প্রাসাদের দরজার মত লাগছে।

চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি দিল রানা, ওপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো জ্বলছে না। পিছিয়ে আসতেই চোখে পড়ল আবছা দুটো ইংরেজি হরফ—দরজার গায়ে খোদাই করেছে কেউ। দুটো আর। রডনি রাইলি! বুকটা হু হু করে উঠল রানার। নিজের উপস্থিতির চিহ্ন রেখে গেছে রডনি, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল এখান থেকে

ফিরতে পারবে না কোনোদিন।

নিজের অবস্থাও যে রডনির চেয়ে ভাল নয়, তা বেশ বুঝতে পারছে রানা। ছুরিটা কোনও কাজে আসছে না ওর। দরজার তালা ভাঙতে পারবে না ওটা দিয়ে, পারবে না পাল্লা ভাঙতে। পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, এমন সময় মনে পড়ল মেঝেতে বসানো গ্রিলের চারপাশে দেখা ফাটা সিমেন্টের কথা। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল প্রাচীন কুয়াটার পাশে। হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করল গ্রিলটা।

জালের মত মোটা লোহার রড বসিয়ে ঢাকা হয়েছে কুয়ার মুখ, চারপাশে ঢালা হয়েছে সিমেন্ট। গ্রিল ধরে একটু টানাটানি করল রানা, নড়াতে পারল না। শেষে ছুরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কিনারে। খুঁচিয়ে চলল শুকনো, ফাটা, ঝুরঝুরে সিমেন্ট। একটু পরেই উন্মুক্ত করে ফেলল একটা রডের প্রান্ত। খুশিতে নেচে উঠল হৃদয়। আশার ছোট্ট একফালি কিরণ দেখতে পাচ্ছে।

ছুরি দিয়ে খোঁচাতে থাকল রানা। একটু একটু করে বিচ্ছিন্ন করছে সিমেন্ট আর গ্রিলের বন্ধন। ভুলে গেছে সবকিছু। ক্লান্তিও স্পর্শ করছে না আর ওকে।

গড়িয়ে চলল সময়। এক ঘণ্টা... দু'ঘণ্টা... কিংবা হয়তো তিন ঘণ্টা—তারপর খুলে গেল গ্রিলের চারপাশ। উঠে কপাল থেকে ঘাম মুছল ও। ছুরিটা পকেটে গুঁজল। এরপর গ্রিলের খোপে আঙুল ঢুকিয়ে টানতে শুরু করল সর্বশক্তি দিয়ে।

ভীষণ ওজন ওটার, এক টনও হতে পারে, প্রথমে জগদ্দল পাথরের মত অনড় রইল। কিন্তু রানাও নাছোড়বান্দা। ক্ষণে ক্ষণে হ্যাঁচকা টান দিয়ে চলল। শেষে ওর একগুঁয়েমির কাছে হার মানল গ্রিল, ভোঁতা শব্দ করে উঁচু হলো খানিকটা। টেনে চলল রানা, ইঞ্চি ইঞ্চি করে গ্রিলটাকে নিয়ে এল মেঝের উপরে। এতই উত্তেজিত, বুঝতে পারছে না কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। সাধারণ

পরিস্থিতিতে এই ভারী গ্রিল কিছুতেই ওর পক্ষে নড়ানো সম্ভব নয়।

একটু সময় লাগল, তবে কুয়ার মুখ শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি উন্মুক্ত করে ফেলল রানা। এবার?

সত্যি বলতে কী, গ্রিল সরাবার পর কী করবে, সেটা নিয়ে একদমই ভাবেনি ও। কাজটা করেছে স্রেফ ঝোঁকের বশে। তাই বলে পরিশ্রমটা পণ্ড হতে দেয়া যায় না।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, মাথা বাড়িয়ে দিল খোলা কুয়ার উপরে। বুক ঢিব ঢিব করছে। একটু পরেই অন্ধকার সয়ে এল চোখে, মনে হলো অনেক নিচে পানির মৃদু নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সিমেন্ট সরাবার সময় ক্ষণে ক্ষণে ভাঙা টুকরো পড়ছিল কুয়ার ভিতরে, প্রতিধ্বনি শুনে মনে হয়েছে শাফটের তলায় একটা চেম্বার রয়েছে... কিংবা কোনও প্রাকৃতিক গুহা। সত্যিই কি তা-ই?

নামবে কি না দোনোমনো করল রানা। এখান দিয়ে যে পালানো যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তলায় গিয়ে আটকা পড়লে আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি। ভাবনা-চিন্তা করে নামবে বলেই ঠিক করল। পুরোটা না হলেও বেশ কিছুদূর নামবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে, উপরে ফিরবে কি ফিরবে না।

শোয়া থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ শুনতে পেল ছলাৎছল। না, কোনও ভুল নেই। নিচ থেকে ভেসে এসেছে আওয়াজ। বদ্ধ কুয়ার নিচে পানি আপনাআপনি নড়তে পারে না, নিশ্চয়ই কিছু সাঁতার কাটছে ওখানে... কোনও ধরনের মাছ। আর তার অর্থ খুব পরিষ্কার।

একই সঙ্গে আনন্দ আর ভয় আচ্ছন্ন করল রানাকে। আনন্দ এজন্যে যে, লেকের সঙ্গে সংযোগ না থাকলে কুয়ার তলায় মাছ থাকতে পারে না; আর সংযোগ থাকা মানে সেখান দিয়ে বেরিয়ে

যেতে পারবে ও। অন্যদিকে ভয়ের ব্যাপার হলো, নিচে কী জাতের মাছ থাকতে পারে, তা খুব ভালমতই বুঝতে পারছে। লর্ড গ্রিফিনই জানিয়েছেন, সিলভারব্যাক লেকে এখন আর ট্রাউট, স্যামন, বা অন্য কোনও মাছ নেই... আছে শুধু রাক্ষুসে ঈল! পালাতে চাইলে ওই ঈলের মাঝে নামতে হবে রানাকে।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দিল রানা—থাকুক ঈল, এখুনি ভয় পাবার কিছু নেই। লর্ড গ্রিফিনের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, ওকে আক্রমণ করবার কোনও কারণ নেই ওদের। আহত নয় রানা, শরীরে কোনও ক্ষত নেই, রক্ত বেরুচ্ছে না। রক্তের গন্ধ না পেলে বড় কোনও শিকারকে আক্রমণ করে না ওরা। তারচেয়ে ইতিবাচক দিকটার দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। কুয়ার সঙ্গে সংযোগ আছে লেকের, ঈলেরা যদি ওখান দিয়ে ঢুকতে পারে, তা হলে ও-ও বেরুতে পারবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নতুন করে ভয় জাঁকিয়ে বসার আগেই ঝটপট হাত দিয়ে ভালমত আঁকড়ে ধরল কিনার, তারপর কুয়ার ভিতরে শরীরটা ঝুলিয়ে দিল ও। পায়ের পাতা বুলিয়ে শাফটের গায়ে খুঁজে নিল একটা খাঁজ। ঢুকে পড়ল কুয়ায়।

বেশি চওড়া নয় শাফট, মোটামুটি স্বচ্ছন্দে নামতে পারছে ও। ধরার মত কোনও খাঁজ না পেলেও হাত-পা বাধিয়ে আটকাতে পারছে পতন। মাঝে মাঝে শাফটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে থামছে, অপেক্ষা করছে রুক্ষ পাথরের ঘষায় ছাল ওঠা আঙুলের জ্বলুনি কমবার জন্য, তারপর নামছে আবার।

অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে ওর। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে হাত আর পায়ের পেশিতে। টনটনে ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠল এক সময়। হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে গেল ও। মাথা তুলে তাকাল উপরে। কুয়ার খোলা মুখ এখন ছোট্ট একটা বৃত্তের মত দেখাচ্ছে। নিচে ঘনঘোর অন্ধকার। ঠকঠক করে কাঁপছে ও। সেই সঙ্গে ঘামছে।

সন্দিহান হয়ে উঠল রানা, কাজটা পাগলামি হয়ে যাচ্ছে না তো? নিচে নামলেই যে পালাতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? বরং আটকা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। নামতে যে-পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, কুয়ার পাঁচিল বেয়ে আর উঠতে পারবে না ও। মরতে হবে কুয়ার নিচের কালো পানিতে ডুবে।

ফিরে যাবে? চিন্তাটা মাথায় আসতেই প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। খলবলিয়ে উঠল রক্ত। অনুভব করল, রীতিমত ভাপ বেরুচ্ছে সারা শরীর থেকে। উপরে গিয়ে অসহায়ভাবে নিজেকে সঁপে দেবে কুটিল লর্ডের হাতে? কক্ষনো না!

এক মুহূর্ত পর সচেতন হয়ে উঠল রানা। বুঝতে পারছে না, হঠাৎ অমন উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন। এত রাগ তো কখনও ছিল না ওর! লর্ড গ্রিফিনের কথা মনে পড়ল, নিশ্চয়ই ব্যাপারটা সিলভারব্যাক সেরামের সাইড-এফেক্ট। ড্যানিকে যেমন রগচটা করে তোলে, সেভাবে ওকেও করছে। মৃদু হাসল রানা, ভালই হয়েছে একদিকে। ড্যানির মত অকারণে নয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাগটা কাজে লাগাবে ও। শরীর গরম হয়ে উঠেছে, অনুভব করছে নতুন বল.... এই-ই সুযোগ নিচে নেমে সাঁতার কেটে পালিয়ে যাবার। মনে মনে হেসে উঠল ও। ওর পালিয়ে যাওয়ার খবরে লর্ডের চেহারা কেমন হবে ভেবে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে।

আবারও শাফট বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। এবার আগের চেয়ে দ্রুত। কোনও কিছুর পরোয়া করছে না আর।

হঠাৎ করে থামতে হলো আবার। পা বাড়িয়ে নিচে অবলম্বন খুঁজল, কিন্তু পেল না কিছু। শেষ হয়ে গেছে শাফট, নিচে শূন্যতা। কুয়ার তলার গুহাটার ছাতে পৌঁছে গেছে রানা। এখন কী করবে? কত নিচে রয়েছে পানি, জানা নেই। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না কিছু। কোনও আওয়াজও পাচ্ছে না। এ-অবস্থায় শাফট ছেড়ে ঝাঁপ দেয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। যদি ব্যথা লাগে?

ওভাবেই হয়তো আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকত রানা, কিন্তু আচমকা মানসচোখে ভেসে উঠল আতঙ্কজনক একটা দৃশ্য। কল্পনা করল, প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে গেছে, ভিতরে ঢুকেছেন লর্ড গ্রিফিন তার অনুচর কালহুনকে নিয়ে। কুয়ার মুখ খোলা দেখেই যা বোঝার বুঝে নেবেন তিনি। এসে উঁকি দেবেন ভেতরে। রানাকে যদি শাফটের ভেতর আটকা পড়া অবস্থায় দেখেন...

আর ভাবতে পারল না রানা, নিচু স্বরে গাল দিয়ে উঠল। যা থাকে কপালে ভেবে ছেড়ে দিল হাত। সরসর করে দেহটা নেমে গেল নিচে। কুয়ার গা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে ঠোকর খেল রানা, তারপর...

ঝপাস করে পড়ল ও হিমশীতল পানিতে। তলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

চব্বিশ

নিচে পড়ার সময় কানে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনছিল রানা, পানির যত গভীরে গেল, ততই কমে এল সে-আওয়াজ। শেষে অদ্ভুত এক নীরবতা গ্রাস করল ওকে। কালো পানির ভিতরে ঘুরপাক খেল ও, দিকভ্রান্ত। উপর-নিচ কিছুই বুঝতে পারছে না। অগত্যা শরীর ছেড়ে দিল, যা হবার হোক। কাজ হলো ওতে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সারফেসের দিকে ভেসে উঠল দেহ, ভুস করে পানি থেকে মাথা তুলল ও। বুক ভরে টেনে নিল গুহায়

আটকে থাকা সোঁদা বাতাস।

কপাল ভাল রানার, পানি ঠাণ্ডা হলেও এত ঠাণ্ডা নয় যে শরীর অসাড় হয়ে যাবে। তবে কান ব্যথা করছে, মগজের ভিতরটা সুঁই দিয়ে খোঁচাচ্ছে যেন কেউ। নাক আর চোখের মণিও টনটন করছে।

শারীরিক অসুবিধে অগ্রাহ্য করে চারপাশে তাকাল ও। প্রায়ান্ধকার পরিবেশ। শাফট দিয়ে সামান্য আভা আসছে, তবে তাতে গুহার কিছুই আলোকিত হয়নি। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা, নিরেট কিছুর স্পর্শ পেতে চাইছে। সহজ নয় কাজটা—জামাকাপড় পরে সাঁতার কাটা—ভিজে ওজন বেড়ে গেছে ওর। বিশেষ করে বুটদুটোর ওজন হয়েছে পাঁচসেরী বাটখারার মত, টেনে নামিয়ে নিতে চাইছে ওকে। মন্থর হয়ে এল এগোবার গতি।

খানিক পর গুহার দেয়াল স্পর্শ করতে পারল ও। দেয়াল হাতড়ে এগোল আরও কিছুদূর। পেয়ে গেল একটা নিচু তাক। বেশি চওড়া নয়, তবে ওর জায়গা হয়ে যাবে। ঝটপট পানি থেকে ওখানে উঠে পড়ল। শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। হাঁপাচ্ছে। বিচিত্র এক আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে হৃদয়। মরেনি ও, অন্তত এ-পর্যন্ত তো আসতে পেরেছে!

পাগলামি... নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু না। স্বাভাবিক অবস্থায় এমন ঝুঁকি কোনোদিন নিত না ও। কিন্তু আজ নিল কেন? এ কি সিলভারব্যাক সেরামের কীর্তি? নাকি ওর দুঃসাহস? যেটাই হোক, নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন অনুভব করছে রানা। ভয় পাচ্ছে না আর। বরং দৃঢ় এক প্রত্যয় জেঁকে বসেছে মনে। শুধু পালাবে না, দুর্গে ঘাঁটি গাড়া মানুষরূপী শয়তানগুলোকেও শায়েস্তা করে ছাড়বে ও, যেভাবে পারে।

বিশ্রাম নেয়া হলে উঠে পড়ল রানা। ভেজা কাপড় খুলে ফেলল দ্রুত হাতে, রইল শুধু আণ্ডারওয়্যার। দুটো লাভ হলো এতে—ঠাণ্ডা

লেগে যেত ভেজা কাপড় পরে থাকলে, এখন আর তা লাগবে না; কাপড়ের বোঝা না থাকায় পানিতে সাঁতারও কাটতে পারবে স্বচ্ছন্দে। বেরুবার সময় নাহয় আবার নিয়ে নেবে সব।

গুহা থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে হবে ওকে। কিন্তু তার আগে জায়গাটার ব্যাপারে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা চাই। আলো না থাকায় সমস্যা হচ্ছে বটে, তাই বলে হতাশ হলো না। হাত দিয়ে হাতড়ে তাকটার কিনার পরখ করল ও। ভালমত চিনে নিল ওটার গঠন। পরে যাতে স্পর্শ করলেই চিনতে পারে। সন্তুষ্ট হয়ে নেমে পড়ল পানিতে। পাঁচিল ছুঁয়ে এগোতে শুরু করল, পুরো গুহা ঘুরে আসবে—জায়গাটার আয়তন আর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে তা হলে।

থামাথামি ছাড়াই পুরো গুহা বার তিনেক ঘুরল রানা, ভালমত চিনে নিল—মার্কার হিসেবে ব্যবহার করল পাঁচিলের ফাটল, বেরিয়ে থাকা পাথর কিংবা শ্যাওলার আস্তর। মনের পর্দায় গেঁথে নিল ওগুলোর অবস্থান। মাথার ভিতর একটা ম্যাপ তৈরি হয়ে গেল... তৃতীয় চক্কর শেষে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল ও—এখন যেখানেই যাক দিক হারাবে না, বুঝতে পারবে তাক থেকে কোথায় বা কতদূরে রয়েছে।

এবার গুহা থেকে বেরুবার পথ খোঁজা যেতে পারে। আছে তো? থাকার কথা। পাঁচিল ধরে ঘুরবার সময় আরও কয়েকবার মাছের হুটোপুটি শুনেছে ও। ওরা যখন ঢুকতে পারছে, পথ একটা নিশ্চয়ই আছে। কথা হলো সেটা একজন মানুষ বেরুবার জন্যে যথেষ্ট চওড়া কি না। দেখাই যাক।

আবারও পাঁচিল ধরে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা, তবে ভেসে নয়, ডুব দিয়ে। মাঝে মাঝে মাথা তুলছে দম নেবার জন্য। একেক বারে কয়েক ফুটের বেশি এগোচ্ছে না, হাত দিয়ে ভাল করে পরখ করছে ডুবে থাকা দেয়াল। সন্তুষ্ট হলে যাচ্ছে পরের

অংশে।

গুহার মাঝখানটায় পানি সবচেয়ে গভীর, পাঁচিলের ধারে সে-তুলনায় গভীরতা বেশ কম। সহজে সার্ভে করতে পারছে রানা। তারপরেও এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ডুবসাঁতার দেয়ায় শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। ফুসফুস ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ততক্ষণে গুহার অনেকটাই দেখা হয়ে গেছে ওর, ফিরে এল তাকে। পা ঝুলিয়ে বসে চোখ মুদল। বড় বড় করে শ্বাস নিতে আর ছাড়তে থাকল। জিম বুচারের কাছ থেকে শেখা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করছে।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস, চোখ খুলল রানা। ক'টা বাজে? চারটার কম নয়, অনুমান করল ও রাতভর ধকল গেছে, এখনও যে অচল হয়ে পড়েনি, তা-ই ঢের। শক্তি থাকতেই যা করবার করতে হবে ওকে। পানিতে নেমে পড়ল ও। পাঁচিলের বাকি অংশ সার্ভে করবে।

সৌভাগ্যই বলতে হবে, কয়েক মিনিটে যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল। হাতড়াতে হাতড়াতে এক জায়গায় অনুভব করল পানির প্রবাহ। তাড়াতাড়ি পরখ করল জায়গাটা। পরক্ষণে খুশিতে লাফিয়ে উঠল হৃদয়, বড়সড় একটা সুড়ঙ্গমুখ রয়েছে ডুবন্ত পাঁচিলের গায়ে। রানার হালকা-পাতলা দেহ অনায়াসে ঢুকে যাবে ওতে।

সারফেসে ভেসে উঠল রানা। বড় করে শ্বাস টেনে ডুব দিল আবার। সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল, সাঁতার কেটে ভিতরে গেল কিছুদূর। না, কোনও সন্দেহ নেই। এটাই লেকের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে গুহার। যত ভিতরে যাচ্ছে, ততই শক্তিশালী হচ্ছে পানির স্রোত। তাপমাত্রাও বাড়ছে। তবে এখুনি বেরুনোর ইচ্ছে নেই রানার, জামাকাপড় নিয়ে আসতে হবে।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল রানা। সাঁতরে চলে গেল তাকের কাছে। উঠে পড়ল ওতে। হাত চালাল পোশাক-আশাক গুছিয়ে নেবার জন্য। একই সঙ্গে ভাবছে লর্ড গ্রিফিনের কথা। রানা

পালিয়েছে জানার পর কেমন হবে লোকটার চেহারা? দেখতে পারলে মন্দ হতো না।

জ্যাকেটটা না নেবার সিদ্ধান্ত নিল রানা, ওজন খুব বেশি। দরকারও নেই ওটার। বাকি সবকিছু একত্র করল। বুট থেকে খুলে নিল ফিতে জোড়া। এক পাটি বুট শার্ট দিয়ে পেঁচাল, আরেক পাটি প্যান্ট দিয়ে। ছোট দুটো বোঁচকার মত হলো। আণ্ডারওয়্যারের উপর দিয়ে বেল্ট লাগাল, তারপর ফিতে দিয়ে বোঁচকা দুটো পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে নিল বেল্টের সঙ্গে। ব্যস হয়ে গেল চমৎকার বন্দোবস্ত—গায়ে না চড়িয়েও জামাকাপড় বহনের ব্যবস্থা।

এবার চূড়ান্ত প্রস্তুতির পালা। পা ঝুলিয়ে বসে নতুন করে ব্রিদিং এক্সারসাইজ শুরু করল রানা। বড় করে দম নিচ্ছে, কিন্তু খুব দ্রুত। রক্ত থেকে বের করে দিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, সঞ্চয় করছে অক্সিজেন। এই কৌশলও জিমের কাছে শেখা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা হালকা লাগল রানার, বুঝল—যতটুকু সম্ভব সঞ্চিত হয়েছে অক্সিজেন, আর পারবে না। এর বেশি চেষ্টা করলে জ্ঞান হারাবে। পানিতে নেমে পড়া যাক।

তাক থেকে নামবার আগে একটু থমকাল রানা। কতদূর সাঁতার কাটতে হবে, সেটাই তো জানে না! কত লম্বা সুড়ঙ্গটা? দশ গজ? বিশ গজ? নাকি আরও বেশি? সুড়ঙ্গ খুঁজে পেয়ে এতই উত্তেজিত হয়েছিল, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি আগে। পুরোটা পেরুতে পারবে তো? জিমের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছে ও, দু'মিনিট পর্যন্ত দম ধরে রাখতে পারে। কিন্তু এই অচেনা পরিবেশে, ক্লান্ত শরীরে, বাড়তি বোঝা নিয়ে অতটা পারবে কি না সন্দেহ।

তার ওপর আছে ঈলের ভয়। চিন্তাটা মাথা থেকে দূরে রাখতে চাইলেও পারছে না রানা, বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে হ্যামার জোন্সের লাশের চেহারা। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, হ্যামারকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে দেয়া হয়েছিল লেকে, কিন্তু ওর শরীরে

কোনও আঘাত নেই। রক্তের গন্ধ না পেলে আক্রমণ করবে না ঈল।

ও-নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে চাইল না রানা, নেমে পড়ল পানিতে। ভেসে চলে গেল নির্দিষ্ট পাঁচিলটার পাশে। মনে মনে সাহস জোগাচ্ছে নিজেকে—সহজ কাজ, কোনও ব্যাপারই না... সুড়ঙ্গের এক মাথা দিয়ে ঢুকে আরেক মাথা দিয়ে বেরুতে হবে। যদি না ভিতরে আটকা পড়ে... যদি না ঈলের খাবারে পরিণত হয়!

বড় করে শ্বাস নিল রানা, ভরিয়ে তুলল ফুসফুস। তারপর ডুব দিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। দ্রুত পা নেড়ে এগিয়ে চলল সামনে, পিছনে ভাসছে কাপড়ের বোঁচকা। কিছুটা সময় বেশ দ্রুত এগোনো গেল, কিন্তু তারপরেই গায়ের কাছে সেঁটে এল দেয়াল—সুড়ঙ্গটা সরু হতে শুরু করেছে। অস্থির হলো না রানা, দেয়াল ধরে শরীর টেনে নিতে পারছে সামনে, তাতে গতি আরও বাড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেরুতে হবে জায়গাটা, ফুসফুসে ইতিমধ্যে জ্বলুনি শুরু হয়েছে।

আরেকটু এগোল রানা, সুড়ঙ্গটা সংকুচিত হলো আরও। এবার ভয় ধরল মনে—পুরোটা যেতে পারবে তো? নাকি বোতলের ছিপির মত আটকে যাবে শেষে? দেয়ালের সঙ্গে ঘষা খেয়ে চামড়া কেটে যাবার ঝুঁকিও অগ্রাহ্য করা যায় না। রক্ত বেরুলেই সর্বনাশ!

কতক্ষণ হলো পানির তলায়? ত্রিশ সেকেণ্ড? নাকি আরও কম? বোঝার উপায় নেই। অন্ধকার সুড়ঙ্গে অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে রানা। কোমরে বাঁধা বেল্টে টান পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে, সরু সুড়ঙ্গে ঘষা খাচ্ছে কাপড়ের বোঁচকাদুটো।

হঠাৎ সচকিত হলো রানা। কী যেন একটা ঘষা খেল পেটের সঙ্গে। পাথর নয়, শক্ত কিছুও নয়। সরু, পিচ্ছিল, জীবন্ত। একটা ঈল! পরমুহূর্তে আরেকটার স্পর্শ পেল পিঠে। বুঝতে পারল, ও একা নয়, ঈলেরাও আছে সুড়ঙ্গে। এটা ওদের সুড়ঙ্গ। রানা এখানে

অনাহূত। কল্পনা করল, দেয়ালের ফাটল থেকে মাথা বের করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ঈলেরা। আক্রমণ করবে না তো? শরীরের কোথাও কেটে-ছড়ে যায়নি তো? বোঝার উপায় নেই। আড়ষ্ট বোধ করছে রানা, যেন কোনও অনুভূতি নেই। ঈলের স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না ও।

আরেকটা ঈল উঠে এল পা বেয়ে, ঠোকর দিল নাভিতে। গা ঝাড়া দিয়ে ওটাকে তাড়াল রানা। মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক বোধ করল, পরক্ষণে সামলাল নিজেকে। না, ভয় পাওয়া চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। আসুক ঈলের দল, পথ দেখাক ওকে এই তরল নরক থেকে মুক্তি পাবার।

ফুসফুসের জ্বলুনি অসহ্য হয়ে উঠছে, কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়ল রানা, চাপ কমাল বুকের ভিতর থেকে। একটু ভাল বোধ করল, কিন্তু এ-ও বুঝতে পারছে, দম ফুরিয়ে আসছে ওর।

বড় একটা ঈল এখন সাঁতার কাটছে রানার পাশ দিয়ে। মুখ ঘষে পরখ করছে ওকে। আরেকটা পেঁচিয়ে ধরেছে বাম গোড়ালি। শান্ত রইল রানা। সামনে হাত বাড়াতেই স্পর্শ পেল তৃতীয় একটার। শরীর পেঁচিয়ে নাগাল থেকে সরে গেল ওটা, চলে গেল সামনে।

ঈলের স্পর্শে ক্ষণিকের জন্য মনোযোগ হারিয়েছিল রানা, সংবিৎ ফিরতেই থেমে যেতে বাধ্য হলো। সামনে আরও সরু হয়ে এসেছে সুড়ঙ্গ। হাত দিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল রানা, কোনোমতে ওর শরীর ঢুকবে হয়তো। দ্বিধায় পড়ে গেল, সামনে যাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছে না।

দুটো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে রানা—হয় সুড়ঙ্গের আকার একই রকম থাকবে, কষ্টেসৃষ্টে পেরুনো যাবে জায়গাটা; কিংবা সামনে আরও সরু হয়ে যাবে সুড়ঙ্গ, ভিতরে ঢুকলে গোঁজের মত আটকে যাবে ও। কী করবে? ফিরে যাবে কি না ভাবল, কিন্তু দূর করে দিল

চিন্তাটা। উল্টো ঘোরার জায়গা নেই, পিছনদিকে সাঁতার কেটে ফিরতে হবে ওকে। বুঝতে পারল, ফিরবার মত দমই নেই ওর। অগত্যা সামনে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিল। যা হয় হবে।

এরই মাঝে পেরিয়ে গেছে মূল্যবান কয়েক সেকেণ্ড। দেরি করার মানে হয় না, সময় পেয়ে সাহসী হয়ে উঠছে ঈলগুলো। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে। যা থাকে কপালে ভেবে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে সরু অংশটায় ঢুকে গেল রানা।

ভয়াবহ এক পরিস্থিতি। শরীর প্রায় সেঁটে আছে সুড়ঙ্গের দেয়ালে, সাঁতার কাটার উপায় নেই। মেঝে খামচে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে রানা, নিকষ অন্ধকারে। ঘনঘোর কালোর মাঝে থেকে থেকে চোখের সামনে উঠে আসছে লাল পর্দা, ফুসফুস আর সইতে পারছে না এ-চাপ। আরও কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়ল রানা, যতটা দ্রুত পারে এগোবার চেষ্টা করল। নিজেকে ঈলের মত মনে হচ্ছে, ওদের মতই কিলবিল করে চলতে হচ্ছে ওকে। সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের ভিতর এগোতে গেলে এর বিকল্প নেই।

হঠাৎ থামতে হলো ওকে। আর এগোতে পারছে না। টান পড়ছে কোমরে। ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা বোঝা আটকা পড়েছে পিছনে। বেল্ট খুলে ফেললে সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু কোমরের কাছে হাত নেবার কোনও উপায় নেই। হামা দিয়ে একটু পিছিয়ে এল রানা। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে বাড়ল সামনে। বারদুয়েক চেষ্টা করতেই মুক্ত হলো বোঁচকা। আবারও আগের মত এগোতে পারল ও।

উদ্‌ভ্রান্তের মত লাগছে রানার। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে আঁধার পাতালের সুড়ঙ্গে রয়েছে ও। ভুলে গেছে শ্বাস নিতে। জ্বালাপোড়া করতে করতে আগুন ধরে গেছে ফুসফুসে, যেন ছাই হয়ে গেছে। আর পারছে না ও। তবু এগিয়ে চলল একটু একটু করে। পারতেই হবে... পারতেই হবে ওকে।

কীসের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পরখ করল সেটা। পরক্ষণে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। সুড়ঙ্গ সরু হয়ে যেতে পারে ভেবেছিল, কিন্তু বন্ধ থাকতে পারে, সেটা একবারও ভাবেনি। হাতের তালুতে নিরেট পাথরের স্পর্শ পাচ্ছে রানা—অন্ধগলির মত শেষ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা।

না!

চেঁচিয়ে উঠতে চাইল রানা। মানতে পারছে না নিজের দুর্ভাগ্যকে। সামনে এগোবার উপায় নেই, যেভাবে এসেছে সেভাবে পিছাতেও পারবে না। পারলেও লাভ হতো না, দম ফুরিয়ে গেছে ওর। স্কটল্যাণ্ডের এক লেকের তলায়, অন্ধকার সুড়ঙ্গে মরতে বসেছে ও। লাশটাও হয়তো কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না। এখানেই পড়ে পড়ে পচবে, কিংবা পরিণত হবে রাক্ষুসে ঈলের খাবারে!

এমন তো হবার কথা ছিল না! এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে—বন্দিশালায় কুয়া খুঁজে পাওয়া, নিচে নামা, লেকের সঙ্গে গুহার সংযোগ আবিষ্কার করা—এসব দেখে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল মনে, ভাগ্য রয়েছে ওর সঙ্গে... সুস্থ শরীরে ওকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে প্রিয়জনের কাছে। তা হলে শেষ মুহূর্তে এমন ভয়ানক পরিণতি হবে কেন? কেন ওকে মরতে হবে অসহায়ভাবে?

সবকিছু অবাস্তব মনে হচ্ছে রানার কাছে, মনে হচ্ছে দুঃস্বপ্নের মত। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন। নইলে এভাবে মরণ হতে পারে না ওর। যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে যাবে ঘুম, তা হলেই পরিচিত বিছানায় ফিরে যাবে ও। ভাঙছে না কেন?

বাতাসের অভাবে খাবি খেল রানা, মুখে ঢুকে গেল ঠাণ্ডা পানি। আর তখুনি উপলব্ধি করল বাস্তবতা। স্বপ্ন নয়, এ রূঢ় বাস্তব! সত্যিই মারা যাচ্ছে ও। চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠল

প্রিয় সব মুখ—বাবা, মা, ইসমাত ফুপু, রেড, মিং... আর এন্ট্রফান চাচা।

সে কী, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন কেন চাচা? নীরব দৃষ্টিতে কী যেন বলতে চাইছেন। বুঝতে পারছে না রানা। হঠাৎ তাঁকে হাত নাড়তে দেখল ও। একটা আঙুল তুললেন উপরদিকে—ওঠালেন-নামালেন।

সরু সুড়ঙ্গের ভিতরে কষ্টেসৃষ্টে পাশ ফিরল রানা, চিৎ হলো। দেখতে পেল আবছা এক আলোর আভা। মৃদু নড়ছে পানি। তবে কি...

হাত তুলল ও। ছুঁতে চাইল ছাতের দেয়াল। কিন্তু হাতে বাধল না কিছুই। বুকের ভিতর লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। চাচার ইশারার অর্থ বুঝতে পেরেছে। ছাত নেই, সুড়ঙ্গটা এখান দিয়ে খাড়া উঠে গেছে ওপরে।

কোত্থেকে যেন নতুন শক্তি ভর করল রানার শরীরে। পাগলের মত খামচি দিয়ে আঁকড়ে ধরল দেয়ালের খাঁজ, টেনে-হিঁচড়ে দেহটা নিয়ে এল সুড়ঙ্গের খাড়া অংশে। এখানে আবার চওড়া হয়ে এসেছে ওটা। পানিতে জোরে জোরে লাথি মারল রানা, হাতও নাড়ল একই সঙ্গে। চোখের পলকে দু'পাশ থেকে অদৃশ্য হলো দেয়াল, খোলা পানিতে বেরিয়ে এল ও। থামল না তাও, তীর বেগে উঠতে থাকল উপরে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই টর্পেডোর মত সারফেস ভেদ করে ছিটকে বেরুল রানা। গতিবেগের কারণে প্রায় কোমর পর্যন্ত উঠে গেল শূন্যে, তারপর আবার ঝপাস করে পড়ে গিয়ে ফুলঝুরির মত পানি ছিটাল। হাঁপানি রোগীর মত শ্বাস ফেলছে রানা, বুক ভরে টেনে নিচ্ছে তাজা বাতাস। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হলে চারপাশে তাকাল। লেকে বেরিয়ে এসেছে ও। দুর্গ থেকে বেশ অনেকটা দূরে। ডুবসাঁতার দিয়ে এতদূর এসেছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না।

ওয়ার্ড'স মিডের দু'পাড়ের দূরত্ব এরচেয়ে অনেক বেশি ছিল।

আস্তে আস্তে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। পৌঁছুল লেকের পাড়ে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই, হামাগুড়ি দিয়ে ডাঙায় উঠল। পিছন পিছন উঠে এল ফিতে দিয়ে বাঁধা বোঁচকাদুটো—দেখে চেনার উপায় নেই, দুটোকেই পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে অনেকগুলো ঈল। বাতাসের স্পর্শ পেয়েই কিলবিল করে উঠল ওগুলো। বোঁচকা ছেড়ে নেমে গেল মাটিতে। কাদার মাঝ দিয়ে সাপের মত পিছলে ফিরে গেল পানিতে।

রানা এসব কিছুই দেখছে না। ঘাসে ঢাকা জমিনে পৌঁছে থামল ও। শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। অবশেষে হার মানল ওর দেহ। পড়ে থাকল ওখানে চেতনা হারিয়ে।

ভাঙা বিল্ডিঙের সেলারে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেড। ঘুমন্ত। এ-পর্যন্ত আসতে অসুবিধে হয়নি ওর, একটা ঝাড়ুর ডাণ্ডা দিয়ে ক্রাচ বানিয়ে নিয়েছিল। সেলারে ঢোকার পর পরীক্ষা করেছে আঘাত; অনুমান করেছে, গোড়ালির উপরে কোথাও চিড় ধরেছে হাড়ে। প্যাকিং বক্সের ভাঙা কাঠ দিয়ে তৈরি করেছে স্প্লিন্টার, বেঁধে নিয়েছে পায়ের সঙ্গে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুরু করেছে প্রতীক্ষা, রানার প্রত্যাবর্তনের।

কত সময় গেছে বলতে পারবে না রেড। পায়ের তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করতে করতে বার বার চেতনা হারিয়েছে। জেগে উঠলেই শঙ্কা অনুভব করেছে রানার জন্য। বন্ধুটি ভিতরে গিয়ে বিপদে পড়ল কি না কে জানে। অদ্ভুত এক ছেলে, ওর জন্যে নিঃস্বার্থভাবে ঝুঁকি নিচ্ছে। রেড ওর কে? ক'দিন আগেও তো চিনত না। রডনিকে তো চোখেই দেখেনি। তারপরেও...

রানার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অন্তর ছেয়ে গেল রেডের। সারাজীবন অবজ্ঞা আর অবহেলা পেয়ে এসেছে ও। কেউ কোনোদিন বাড়ায়নি

বন্ধুত্বের হাত। অন্তত রানার মত শিক্ষিত ও ভদ্র ঘরের কেউ তো নয়ই। উঁচুতলার মানুষেরা ওকে ঘৃণার চোখে দেখে, অস্পৃশ্য মনে করে। সমগোত্রীয় যে-ক'জন বন্ধু ছিল অতীতে, সবাই ধান্ধাবাজ, স্বার্থপর। বিরক্ত হয়ে ওদের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছে ও। বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, স্বার্থ ছাড়া বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু বন্ধুত্বের সেই সংজ্ঞা পাল্টে দিয়েছে এই ছেলেটা। কোনও প্রতিদান চায়নি রেডের কাছে, বিপদের মুহূর্তে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। আর এখন... ওর জন্য হানা দিয়েছে বাঘের গুহায়। সঙ্গে যেতে পারেনি বলে খারাপ লাগছে রেডের। একাকী পাঠানো উচিত হয়নি ছেলেটাকে। বিপদে পড়লে কে বাঁচাবে ওকে?

নানা রকম চিন্তা করতে করতে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল রেড, হঠাৎ সচকিত হলো খুটখাট শব্দ পেয়ে। চোখ খুলতেই সেলারের ট্র্যাপডোর উঠে যেতে দেখল। তাড়াতাড়ি একহাতে ছুরি আর অন্যহাতে ঝাড়ুর ডাণ্ডা তুলে নিল ও। বিনা যুদ্ধে হার মানবে না। রাইলিরা লড়াই করে মরে।

কালো একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো ফাঁকা মুখটায়। দুর্বল ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল নিচে। আবছা আলোয় চোখ পিটপিট করল রেড। জাঙ্গিয়া পরা এই পাগলটা আবার কে?

'জেগে আছ, রেড?' শোনা গেল রানার পরিচিত কণ্ঠ।

'রানা!' তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালল রেড। পরমুহূর্তে চমকে উঠল। মনে হচ্ছে যেন ঝড় বয়ে গেছে বন্ধুটির উপর দিয়ে। অর্ধনগ্ন, সারা দেহে অসংখ্য আঁচড়। এলোমেলো হয়ে আছে ভেজা চুল, কাদা মাখা। 'এ কী অবস্থা তোমার! কী হয়েছিল?'

'অনেক ঘটনা, পরে বলব।' ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল রানা।

'জামাকাপড় কোথায় তোমার?' ভুরু কোঁচকাল রেড। 'ধরা পড়েছিলে? ন্যাংটো করে পানিতে ফেলে দিয়েছিল নাকি?'

কষ্টের মাঝেও ওর বলার ভঙ্গি শুনে না হেসে পারল না রানা। 'না, ন্যাংটো করেনি,' বলল ও। 'কাপড় আমার সঙ্গেই আছে। এই তো।' হাতে ধরা দুটো ভেজা বোঁচকা দেখাল। 'তবে ধরা পড়েছিলাম।'

'সর্বনাশ! তারপর? পালালে কী করে?'

'সবই বলব, তার আগে তৈরি হয়ে নাও। যত জলদি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। লর্ড গ্রিফিন যে-কোনও মুহূর্তে তার দলবল নিয়ে খুঁজতে আসবে আমাকে।'

ঝটপট নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল রেড। রানাও বোঁচকা খুলে চিপে নিল শার্ট-প্যান্ট, গায়ে চড়াল ঝটপট। পায়ে গলাল বুট। অগ্রাহ্য করল ভেজা পোশাকের অস্বস্তি। কাপড় পরতে পরতে দুর্গের ঘটনা সংক্ষেপে রেডকে খুলে বলেছে ও। শুনে বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে গেছে রেডের। রানার কথা শেষ হলে শুধু বলল, 'আশ্চর্য!এসব কী করে সত্যি হয়!'

'একবিন্দু মিথ্যে বলছি না,' জোর গলায় বলল রানা। 'কসম!' জুতোর ফিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চলো যাই। তুমি হাঁটতে পারবে?'

'না হেঁটে উপায় আছে?' ঝাড়ুর ডাণ্ডায় ভর দিয়ে উঠল রেডও। 'তবে তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। কথা হলো আমরা বেরুব কীভাবে? মাথায় কোনও আইডিয়া আছে?'

'হুঁ। যেভাবে ঢুকেছি, সেভাবেই বেরোতে হবে।'

'আবারও ট্রাকের পিছনে চড়ে?'

'ট্রাকই। তবে পিছনে চড়ে নয়, সামনে।'

'ঠিক বুঝলাম না। পরিষ্কার করে বলো।'

'এখনও সূর্য ওঠেনি, এ-মুহূর্তে কোনও ট্রাক বেরোবে না কম্পাউণ্ড থেকে। কখন বেরোয় তার কোনও ঠিক নেই, তার জন্যে

অপেক্ষা করা চলে না। তুমিই তো বললে, যে-কোনও মুহূর্তে তোমার খোঁজ পড়বে। বসে থাকলে আটকা পড়ে যাব না? তার চেয়ে নিজেরাই একটা ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে যাই না কেন?'

'কী বলছ আবোল-তাবোল?' বিরক্ত হলো রানা। 'আমরা ট্রাক পাব কোথায়? পেলেও সেটা নিয়ে আমাদের বেরোতে দেবে কেন?'

'কারও অনুমতি চাইছি নাকি আমরা,' রেড বলল। 'বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই, একটা ট্রাক চুরি করতে অসুবিধে কোথায়? সামনের গেট তো দেখেছ, ট্রাক দিয়ে গুঁতো মারলেই ভেঙে পড়ে যাবে। কে ঠেকাবে আমাদের?'

'ট্রাকটা চালাবে কে, শুনি?'

'এটা কোনও প্রশ্ন হলো? ভাঙা পা নিয়ে আমি তো ড্রাইভ করতে পারব না। দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে, দোস্ত!'

'কিন্তু আমি তো ট্রাক চালাইনি কখনও!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমার ড্রাইভিঙের দৌড় চাচার গাড়ি চালানো পর্যন্ত।'

'আজ নাহয় নতুন অভিজ্ঞতা হলো!'

'ওরা ধাওয়া করবে আমাদেরকে।'

'উঁহুঁ। বাকি গাড়িগুলো অচল করে দেব আমরা। সারাতে সময় লাগবে। কিথলিতে পৌঁছুনোর আগে আমাদের নাগাল পাবে না কেউ।'

'কী জানি, রেড, আমি আসলে ঠিক...'

'এরচেয়ে ভাল কোনও প্ল্যান থাকলে বলতে পারো,' রানাকে থামিয়ে দিল রেড। 'আমি হাঁটতে পারছি না, তুমিও উড়তে পারছ না, বাকি থাকে গাড়ি। ট্রাকও তো এক রকম গাড়ি—শুধু আকারে বড়, ওজন খানিকটা বেশি। ড্রাইভিঙের বেসিক জানা থাকলে তো অসুবিধে হবার কথা না।'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল রানা। শরীরের ভিতর থেকে আচমকা যেন ছড়িয়ে পড়ল আগুনের একটা ঢেউ। দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর

হয়ে গেল ওর। জ্বলজ্বল করে উঠল চোখের তারা।

'বেশ, তবে তা-ই হোক,' বলল ও। 'চলো।'

'সত্যি?' আশাহত দেখাল রেডকে। 'হায় কপাল, ভেবেছিলাম বুঝিয়ে-শুনিয়ে তুমি নিরস্ত করবে আমাকে!'

পঁচিশ

গেটের কাছে তন্দ্রায় ঢুলছে একজন নিঃসঙ্গ গার্ড, এ ছাড়া পুরো কম্পাউণ্ড জনশূন্য। শেষ রাতের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই।

আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে ঝাপসা হয়ে গেছে ফ্লাডলাইটের আলো। কম্পাউণ্ডের সীমানা ঘেঁষে হেঁটে, যতটা পারে নিঃশব্দে, গাড়ি রাখার দুটো শেডের প্রথমটায় হাজির হলো রানা ও রেড। বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছে রেড, তারপরেও খুবই কষ্ট হয়েছে, ঘামে ভিজে গেছে শার্ট। শেডে ঢুকেই বস্তার একটা স্তূপের উপর বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে। ভাঙা পায়ের ব্যথা রীতিমত ভোগাচ্ছে তাকে।

'এবার কী?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার ছুরিটা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আর বসে আছ কেন? ফুটো করে দাও সবগুলো গাড়ির চাকা।'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল রানার। ছুরি নিয়ে লেগে গেল

কাজে। চাকা ফুটো হওয়ামাত্র হিসহিস শব্দে বেরিয়ে আসছে বাতাস, শব্দটা যেন মধুবর্ষণ করছে কানে। বাতাস হারিয়ে গাড়ির বসে পড়া দেখে পাচ্ছে বিমলানন্দ। খানিক বিশ্রাম নিয়ে রেডও যোগ দিল ওর সঙ্গে—বনেটের কাভার সরিয়ে কেটে দিচ্ছে ফিউয়েল লাইন, বা খুলে ফেলছে স্পার্কিং প্লাগ, ডিস্ট্রিবিউটর।

চাপা উত্তেজনায় কেটে গেল কয়েক মিনিট। প্রতি মুহূর্তে ভয় হলো রানার, এই বুঝি কেউ এসে পড়ে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশঙ্কাটা অমূলক প্রমাণিত হলো। সবার অগোচরে শেডের তলায় রাখা সবক'টা ট্রাক অচল করে দিল ওরা। বাতাস ভরে গেল কাটা ফিউয়েল লাইন থেকে পড়তে থাকা ডিজেলের গন্ধে। কেউ এখন ছুটে না এলেই হয়।

'আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়?' পিছিয়ে এসে আইডিয়া দেবার ভঙ্গিতে বলল রেড। 'সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হবে।'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'খুব রিস্কি। আগুন ধরামাত্র টের পেয়ে যাবে ওরা। ওদেরকে চমকে দিয়ে পালাবার যে-প্ল্যান করেছি, সেটা মাঠে মারা পড়বে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

প্রথম শেড ছেড়ে এবার দ্বিতীয় শেডে ঢুকল দু'বন্ধু। এখানে ট্রাকের পাশাপাশি জিপ আর অন্যান্য ছোট যানবাহন রাখা হয়েছে। দেরি না করে ওখানেও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠল ওরা। অল্প সময়ের ভিতরেই অচল করে দিল সবক'টা যান ও বাহন। কম্পাউণ্ডের আর কোথাও অন্য কোনও গাড়ি না থাকলেই প্ল্যানের প্রথম অংশ সফল বলা চলে।

অক্ষত রাখা হয়েছে একটা মাত্র ট্রাক। দরজা খুলে ওটার ড্রাইভিং ক্যাবে উঠে পড়ল রানা। দেখে নিল কন্ট্রোল। চাচার গাড়ির তুলনায় সবকিছুই বড় বড়, তবে সেটআপে কোনও পার্থক্য নেই। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে, ইঞ্জিন চালু করতেও সমস্যা নেই।

ঠিকমত চালাতে পারবে কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন।

রেডকে টেনে প্যাসেঞ্জার সিটে ওঠাল রানা। ইগনিশনে হাত রেখে বলল, 'রেডি? ইঞ্জিন চালু করলেই কিন্তু ওরা শুনতে পাবে।'

'শুনুক,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল রেড।

মাথা ঝাঁকিয়ে চাবি ঘোরাল রানা। যেন হুঙ্কার ছেড়ে জেগে উঠল ট্রাকের ভারী ইঞ্জিন, আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়। ভাইব্রেশনে পুরো বডি কাঁপছে থির-থির করে। দু'হাতের বুড়ো আঙুল তুলে সঙ্কেত দিল রেড, ব্রেক রিলিজ করল রানা। গিয়ার দিয়ে সাবধানে চাপল অ্যাকসেলারেটর।

ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ল একটু, কিন্তু নড়ল না ট্রাক। দাঁড়িয়ে রইল গোঁজ হয়ে। আতঙ্কিত বোধ করল রানা, ট্রাক চালাবার ভিন্ন কোনও নিয়ম নেই তো? অ্যাকসেলারেটর দেবার পরেও চলছে না কেন? নার্ভাস ভঙ্গিতে ড্যাশবোর্ডের উপর নজর বোলাল ও। কই, অপরিচিত কিছু তো দেখছে না। তা হলে? যা থাকে কপালে ভেবে পা দিয়ে পুরো চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ট্রাক। কেশে উঠল ইঞ্জিন। তাড়াতাড়ি অ্যাকসেলারেটর অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা। সমস্যাটা ধরতে পেরেছে। ভারী গাড়ি বলে শুরুতে চাকা ঘোরানোর জন্য একটু বেশি শক্তি লাগে ট্রাকের, ও সেটা করেনি বলে নড়ছিল না।

শেডের তলা থেকে বেরিয়ে এল ট্রাক। নুড়ি বিছানো আঙিনা ধরে ছুটল গেটের দিকে। গিয়ার বদলে স্পিড বাড়াল রানা। ইঞ্জিনের গগনবিদারী আওয়াজে মড়াও বুঝি জেগে উঠবে এখন। গেটের পাশে ঢুলতে থাকা গার্ডকে ধড়মড় করে সোজা হতে দেখল ও। ট্রাকটাকে মূর্তিমান দানবের মত ছুটে আসতে দেখে আঁতকে উঠল লোকটা। সামনে এসে হাত তুলে থামবার সঙ্কেত দিল। একই সঙ্গে চেঁচিয়ে চলেছে মুখে।

'থামো! থামো বলছি!!'

পাত্তাই দিল না রানা। গিয়ার উপরে ওঠাল আরেক ধাপ। গতি আরও বেড়ে গেল ট্রাকের। শেষ মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পথ থেকে সরে গেল গার্ড। এক মুহূর্ত পরেই উঁচু, কাঠের গেটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রাক।

মড়মড় আওয়াজ হলো, ইঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হলো সে-শব্দ। যেন বিস্ফোরিত হলো গেটের পাল্লাদুটো। ভাঙাচোরা কাঠের টুকরো উড়ে এল বনেটের উপর দিয়ে, আঘাত করল উইণ্ডশিল্ডে। তবে তা ক্ষণিকের জন্য। গেট চুরমার করে বেরিয়ে গেল ট্রাক।

আউটার গেটে পৌঁছুতে সময় লাগল মিনিটদুয়েক। ওটা লোহার ফ্রেম আর তারের জাল দিয়ে তৈরি। পরাস্ত হলো কাঠের চেয়েও সহজে। গোড়া থেকে উপড়ে এসে ছিটকে পড়ল দূরে। দানব ট্রাকের গতি শ্লথ হলো না একটুও। ক্ষতি বলতে শুধু উইণ্ডশিল্ডে ফাটল ধরেছে। সগর্জনে কম্পাউণ্ড ছেড়ে পথে নামল ট্রাক, ছুটে চলল মুক্ত পাখির মত।

'ইয়াহু!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল রেড। জানালা দিয়ে হাত বের করে টা-টা জানাল অপসৃয়মাণ কম্পাউণ্ডকে। 'গুড বাই, গর্দভের দল!'

হঠাৎ কেশে উঠল ইঞ্জিন, বিরতি পড়ল নিয়মিত ছন্দে। ক্যাবের ভিতরে ভীষণ এক ঝাঁকি খেল দুই আরোহী। ভয়ার্ত চোখে রানার দিকে তাকাল রেড।

'অ্যাই, কী হলো?'

'সরি, ভুল গিয়ার,' বলল রানা। দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনল ট্রাককে। ধুলো উড়িয়ে কিম্বলির পথে ছুটে চলল যন্ত্রদানব।

চাচার গাড়ির মতই চালানো যাচ্ছে ট্রাকটাকে, পার্থক্য শুধু এই যে, বাহনটা অনেক বেশি ভারী এবং বড়। বাঁক ঘোরার সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে রানাকে, নইলে রাস্তা থেকে

ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সামান্য সাড়া পাবার জন্যেও সর্বশক্তি দিয়ে বনবন করে ঘোরাতে হয় হুইল।

তবে যত সময় গেল, ততই অভ্যস্ত হয়ে উঠল রানা। বাড়ল আত্মবিশ্বাস। শুরুতে শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছিল হুইল, খানিক পর ঢিল দিতে পারল। তারপরেও সতর্ক থাকতে হচ্ছে, খানাখন্দে ভরা রাস্তায় ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রাক, নিয়ন্ত্রণ না করলে ছিটকে এদিক-সেদিক চলে যেতে চায়। কিথলির রাস্তাও সরলরেখায় এগোয়নি, এঁকেবেঁকে গেছে জলাভূমি, পাহাড়-পর্বত আর চারণভূমির মাঝ দিয়ে। আকাশ বেশ খানিকটা ফরসা হয়ে আসায় রাস্তার দু'ধারে ছোট-বড় একটা-দুটো বাড়ি দেখতে পেল রানা—বেশিরভাগই পরিত্যক্ত।

ড্যাশবোর্ডের উপর পা তুলে দিয়ে সিটের উপর এলিয়ে পড়েছে রেড। খোলা জানালা দিয়ে আসা বাতাসে উড়ছে তার লাল চুল। বলল, 'আহ্, মনে হচ্ছে লং ড্রাইভে বেরিয়েছি, দোস্ত। এমন পরিবেশে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াবার মজাই আলাদা!'

'এত খুশি হয়ো না,' বেরসিকের মত বলল রানা। 'ঝামেলা এখনও কাটেনি। কিথলিতে পৌঁছুতে পারলেও একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে আমাদের সামনে—সার্জেন্ট মরোকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, দুর্গে ভয়ানক কিছু ঘটাচ্ছেন লর্ড গ্রিফিন। কী মনে হয় তোমার? কার কথা বিশ্বাস করবে সে—এলাকার দণ্ডমুণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতির, নাকি তাঁর ট্রাক ছিনতাই করে পালিয়ে আসা নাবালক দুই ছেলের?'

'এ-নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। মোটকু সার্জেন্টকে দুর্গে পাঠালেই হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে যাবে সব। ল্যাবরেটরিটা দেখলেই...'

'কী দেখবে সে?' বাধা দিল রানা। 'ট্যাঙ্কে কিছু ঈল, আর মিউটেশনে বিকৃত হয়ে যাওয়া কয়েকটা শুয়োর—এই তো? এর

মাঝে বেআইনি কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলে মূর্খটাকে সহজেই বুঝ দিতে পারবেন লর্ড।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না,' রুষ্ট গলায় বলল রেড।

'কিথলিতে আদৌ পৌঁছুতে পারি কি না দেখো। ওখানে যে লর্ডের পোষা লোক নেই, কীভাবে জানছি? ফোন করে ওদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন তিনি। গ্রামে পৌঁছুবার আগেই হয়তো রাস্তা আটকে দেবে ওরা।'

'থামো তো,' বিরস গলায় বলল রেড। 'আমি পরিবেশটা একটু উপভোগ করতে চাইছি, আর তুমি কি না একের পর এক দুঃসংবাদ দিয়ে চলেছ!'

এখন পর্যন্ত অবশ্য কারও দেখা মেলেনি। নির্জন রাস্তা ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোচ্ছে ট্রাক, দুই আরোহীকে নিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। স্বস্তি পাওয়া উচিত রানার, কেন যেন পাচ্ছে না। ফুপুর কটেজে পৌঁছুবার আগে নিরাপদ বোধ করতে পারছে না।

সাদা দেয়াল আর ছনের ছাতঅলা দুটো বাড়ি পেরিয়ে এল ওরা, কোনও মানুষ দেখল না দৃষ্টিসীমায়। একটু পরেই ঢাল বেয়ে মাঝারি আকারের একটা পাহাড়ে চড়তে শুরু করল ট্রাক। চূড়া থেকে চারপাশ পরিষ্কার দেখা যায়, ওখানে পৌঁছে ব্রেক কষল রানা। দরজা খুলে নেমে পড়ল চারপাশের পরিস্থিতি বুঝে নেবার জন্যে।

মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশ, শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভেজা কাপড়ে কেঁপে উঠল রানা। ওর দিকে বিনকিউলার বাড়িয়ে ধরল রেড। ওটা চোখে লাগিয়ে দুর্গের দিকে ফোকাস করল ও। পরক্ষণে গাল দিয়ে উঠল।

'শিট!'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রেড।

রাস্তা ধরে উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে একটা কালো রঙের রোলস-রয়েস গাড়ি। সেদিন ফোর্ট উইলিয়াম স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই গাড়িতেই ড্যানিকে চড়তে দেখেছিল রানা। রোলস-রয়েসের পিছু পিছু আসছে আরও দুটো জিপ। সম্ভবত আলাদা গ্যারাজে ছিল গাড়িগুলো, অনুমান করল রানা, সে-জন্যেই ওরা দেখতে পায়নি, অচলও করে দিতে পারেনি।

'কী হলো?' অস্থির গলায় প্যাসেঞ্জার সিট থেকে প্রশ্ন করল রেড।

'আমাদের পিছু নিয়েছে ব্যাটারা,' শান্তকণ্ঠে জানাল রানা।

'কত দূরে?'

'অনেকটাই। মাত্র বেরুল দুর্গ থেকে। তবে আমাদের চেয়ে গতি বেশি ওদের।'

'কী মনে হয়?' নার্ভাস দেখাল রেডকে। 'ধরে ফেলতে পারবে?'

'সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওদের আগে কিথলিতে আমাদের পৌঁছুনোর চান্স ফিফটি-ফিফটি।'

'ওখানে পৌঁছুলেও তো বিপদ কাটছে না। পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে আমাদেরকে।'

'সমস্যা দেখি না। ঈলের খোরাক হবার চেয়ে হাজতে থাকা ভাল।'

দৃষ্টি ঘোরাল রানা। বিনকিউলারের ফোকাস ঠিক করে তাকাল কিথলির দিকে যাওয়া আঁকাবাঁকা পথটার দিকে। পাহাড় কিংবা গাছপালার আড়ালে পথের কিছু অংশ ঢাকা পড়ে গেছে, তবে কোথায় কী আছে না আছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ একটা ট্রাক দেখতে পেল, কিথলি থেকে দুর্গের দিকে আসছে... ওরা যে-ট্রাক নিয়ে পালাচ্ছে, দেখতে হুবহু একই রকম। মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল রানার। ভাগ্য সহায়তা করছে না একদম।

'দুঃসংবাদ,' বলল ও। 'দু'দিক থেকেই আসছে ওরা।'

গাল দিয়ে উঠল রেড। ঘুষি বসাল ড্যাশবোর্ডে।

ক্যাবে উঠে পড়ল রানা। দরজা টেনে বলল, 'নিচে নেমে ট্রাকটা কোথাও ফেলে যেতে হবে আমাদেরকে। কিথলি পৌঁছুবার চেষ্টা করতে হবে পায়ে হেঁটে।'

'আমি তো হাঁটতে পারব না,' বলল রেড।

'তোমার কথা জানা নেই ওদের, শুধু আমাকে খুঁজবে।' গিয়ার দিয়ে ট্রাককে আগে বাড়াল রানা। 'আমার পিছু নিয়ে লোকগুলো চলে যাওয়া পর্যন্ত কোনোমতে লুকিয়ে থাকতে হবে তোমাকে, তারপর তুমি একাই কিথলিতে চলে যেতে পারবে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। আর হ্যাঁ, ওখানে পৌঁছে পুলিশের কাছে যেয়ো না, আমার ফুপুর কটেজে চলে যেয়ো।'

'কিন্তু আমি লুকাব কোথায়?'

'নিচে একটা উপত্যকা দেখলাম—ঘরবাড়ি আর গাছপালায় ভরা। ওখানে চেষ্টা করতে হবে।'

কয়েক মিনিট পরেই পাহাড়ের অন্যপাশের ঢাল বেয়ে নেমে এল ট্রাক। ছোট্ট একটা পাথুরে সেতুর উপর দিয়ে পার হলো নদী, ঢুকে পড়ল উপর থেকে দেখা উপত্যকায়। ঘরবাড়ির যে-কাঠামো দেখেছে, সেটা আসলে ছোট্ট এক খামার—গাছপালায় ঘেরা, নির্জন। রাস্তার মাঝখানে ট্রাক থামাল রানা, ইঞ্জিন বন্ধ করে রেডকে সাহায্য করল নামতে।

জায়গাটা বেশ শান্তিময়। সেতুর তলা দিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে নদী, গাছে গাছে পাখিরা গাইছে গান। ক্ষণিকের জন্য বিপদের কথা ভুলে গেল দু'বন্ধু, পরক্ষণে সচেতন হলো আবার। ভাঙাচোরা একটা গোলাঘর দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল ওটায়, ভিতরটা খড়ে ভর্তি। খড়ের গাদার ভিতরে রেডকে লুকাতে সাহায্য করল রানা, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল এরপর। ট্রাকের দিকে

এগোতেই দেখা হয়ে গেল দাড়িঅলা খামারমালিকের সঙ্গে। আওয়াজ শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সে।

'অ্যাই, ছেলে!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'কী করছ এখানে?'

'সরি, পথ হারিয়েছি,' বলল রানা।

কুঁতকুঁতে চোখে ওকে জরিপ করল খামারমালিক। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ওই ট্রাকটা কি তোমার? আমার রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়েছ কেন?'

'চাইলে ওটা রেখে দিতে পারেন আপনি,' বলে আরেক দিকে হাঁটা ধরল রানা।

'ট্রাক দিয়ে আমি কী করব?' বিরক্ত গলায় বলল খামারমালিক। 'অ্যাই! যাচ্ছ কোথায়?'

জবাব না দিয়ে ছুট লাগাল রানা। লোকটা পিছু পিছু ধাওয়া করে এল, তবে ধরতে পারল না। নিচু একটা বেড়া টপকে নদীর কিনারে পৌঁছুল রানা, সেখান থেকে পাড় ধরে এগিয়ে ঢুকে পড়ল গাছপালার আড়ালে। পিছন থেকে শোনা গেল ক্রুদ্ধ খামারমালিকের শাপ-শাপান্ত, কিন্তু কে কান দেয় তাতে? ছেলেমানুষি আনন্দ অনুভব করছে রানা—যেন আম চুরি করে ধরা পড়ে গেছে, পালাচ্ছে গাছের মালিকের কাছ থেকে। কিন্তু বাস্তবতা মনে পড়ে যেতেই আনন্দটা মিইয়ে গেল।

শরীর কেন যেন খুব হালকা লাগছে রানার—সিলভারব্যাক সেরামের প্রভাবেই কি না কে জানে, দৌড়াতে কষ্ট হচ্ছে না একদম। রাতভর ধকলে এতক্ষণে শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবার কথা, অথচ তেমন কিছুই ঘটছে না। বরং নিজের ভিতর অদ্ভুত এক উদ্দীপনা অনুভব করছে ও, যেন দেহের শিরায়-উপশিরায় বয়ে চলেছে আগুন, ওকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

খামারমালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা দুর্ভাগ্য, লোকটা নিঃসন্দেহে ধাওয়াকারীদের দেখিয়ে দেবে ও কোন্‌দিকে গেছে।

তবে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে ও, দৌড়াতেও পারছে স্বাভাবিকভাবে, কাজেই একটু হলেও রয়েছে সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে।

ব্ল্যাক মায়ারের দিকে ছুটে চলেছে রানা। এদিকটায় কাদা আর পানির রাজত্ব। একটু পরেই গতি কমে গেল, পা দেবে যাচ্ছে কাদায়। অবশ্য ধাওয়াকারীরাও একই সমস্যায় পড়বে। আর যা-ই হোক, গাড়িতে চেপে ওর পিছু নিতে পারবে না তারা। হালকা-পাতলা দেহের কারণে তাদের চেয়ে দ্রুত এগোতেও পারবে ও।

বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেছে। ট্রাকে কাপড় যতটুকু শুকিয়েছিল, তা আবার ভিজে চুপচুপে হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির হাজারো ফোঁটা ওকে আঘাত করছে ঠাণ্ডা সুঁইয়ের মত। কাদা মেখে ভারী হয়ে যাচ্ছে বুট, প্রতি মুহূর্তে কমছে এগোবার গতি। খানিক পর বুটজোড়া খুলে ফেলল রানা। এরচেয়ে খালি পায়ে এগোনো সহজ।

আশপাশের কিছুই পরিচিত নয় ওর। কিথলি থেকে দুর্গে গিয়েছিল ভিন্ন একটা পথে। থেমে ভাল করে দেখল চারপাশ। লেকের দিক চিনতে পারল ওখানকার পাহাড়ের অবয়ব দেখে, একটু পর ডানদিকে গিরিখাতের মুখটাও দেখতে পেল। কিথলি তা হলে ওর বাঁয়ে। ওদিকটা কিছুটা ঢালু, সামান্য সুবিধে পাওয়া যাবে, তারপরেও জলাভূমি পেরুতে যথেষ্ট খাটুনি যাবে।

পিছনে তাকাল রানা। কিথলি থেকে আসা ট্রাকটার ধোঁয়া দেখতে পেল গাছপালার উপর দিয়ে, খামারের কাছে পৌঁছে গেছে ওটা। দুর্গের গ্রুপটাও পৌঁছেছে কি না বোঝার উপায় নেই। তাড়া অনুভব করল রানা, বাড়িয়ে দিল চলার গতি। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে লর্ড গ্রিফিনকে নিয়ে। কী হতে পারে তাঁর পরবর্তী চাল?

নিজেকে লর্ডের জায়গায় কল্পনা করল ও। খামারে পৌঁছে দু'গ্রুপকে একত্র করত ও। কথা বলত খামারমালিকের সঙ্গে। তারপর লোক নিয়ে ধাওয়া করত। এত সহজ? উঁহুঁ, একটা

ব্যাকআপ প্ল্যান তো থাকা চাই! বিশেষ করে রানার যেহেতু সম্ভাবনা আছে ওদেরকে পিছে ফেলে কিথলিতে পৌঁছে যাবার। তা হলে?

একটু ভাবতেই জবাবটা পেয়ে গেল রানা। না, সবাইকে নিয়ে ধাওয়া করবেন না লর্ড। গাড়ি আছে সঙ্গে, কিছু লোক পাঠিয়ে দেবেন কিথলিতে। যে-পথে রানা গ্রামে পৌঁছাবে, সেখানে অপেক্ষা করবে তারা।

থেমে গেল রানা। গাল দিল ভাগ্যকে। ট্রাক ছেড়ে নেমে কোনও লাভ হয়নি। বিপদ কমেনি এক বিন্দু। এখনও দু'দিক থেকে কোণঠাসা অবস্থাতেই রয়েছে ও। বাঁচতে চাইলে কিথলিতে যাওয়া যাবে না। তা হলে যাবে কোথায়?

উদ্ভট একটা আইডিয়া খেলে গেল ওর মাথায়—দুর্গে ফিরে গেলে কেমন হয়? সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেললেও ওখানে ওকে খোঁজার কথা মাথায় আসবে না কারও। কিন্তু... তাতে লাভ কী? কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে দুর্গে? কী করবে ওখানে?

হঠাৎ কিছু একটা ঘটে গেল রানার ভিতর। টের পেল, দুর্গে না ফিরে গিয়ে ওর কোনও উপায় নেই। লর্ড গ্রিফিনের কুকীর্তি নিজ চোখে দেখবার পর লেজ গুটিয়ে পালানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। যেভাবেই হোক, ঠেকাতে হবে তাকে। শাস্তি দিতে হবে রডনি আর হ্যামারের মৃত্যুর জন্য। আর সে-কাজ ও ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। এখানকার আইন লর্ডের হাতের মুঠোয়, কেউ তার বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও নেবে না। যা করার করতে হবে ওকেই।

নিজের অজান্তে দিক বদলাল রানা, পা-দুটো ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দুর্গের দিকে। কী করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—ধ্বংস করে দেবে লর্ডের সাধের ল্যাবরেটরি। বারোটা বাজাবে তার গবেষণার। তারপর যা ঘটে ঘটুক, ও পরোয়া করে না।

ঢালু পথ ধরে উপরদিকে ছুটছে এখন ও, সিলভারব্যাক

লেকের দিকে। আগের চেয়ে কষ্টকর হয়ে উঠেছে যাত্রা, কিন্তু সেসব টের পাচ্ছে না। দৃঢ়সংকল্পে অটল। কঠিন এক দায়িত্ব নিয়েছে কাঁধে, তা পালন করতে হবে ওকে। কিছুই ওকে আর ঠেকাতে পারবে না।

বাতাস দিক বদলাল, পিছনে উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেলরানা। কিন্তু তাকাল না ওদিকে। এগিয়ে চলল অপ্রতিরোধ্য গতিতে। বৃষ্টি এখন সরাসরি মুখে আঘাত করছে ওর। হুল ফোটাবার মত ব্যথা সারা মুখে, বুজে আসতে চাইছে চোখ, কাঁটা আর ধারাল পাথরের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে পা, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে... তবুও কমাল না গতি।

কেটে চলল সময়। পায়ের তলায় সরে যাচ্ছে মাটি—জলাভূমির কাদা পেরিয়ে এক সময় শক্ত জমিনে পৌঁছুল ও। ফুসফুস ততক্ষণে গলার কাছে উঠে এসেছে, মাথা যেন আলাদা হয়ে গেছে ধড় থেকে, কোনও সাড়া পাচ্ছে না দেহ থেকে, শুধু টের পাচ্ছে হাত-পায়ের নড়াচড়া—যন্ত্রের মত চলছে ওগুলো। পাহাড়ি ঢালে পাথরের স্তূপ আর ঘন ঝোপঝাড় এড়াতে আঁকাবাঁকা পথে চলতে হচ্ছে ওকে, মনে হলো দুর্গের দূরত্ব কমার বদলে বেড়ে যাচ্ছে প্রতি ক্ষণে। কিন্তু থামাথামি নেই, বৃষ্টি আর প্রকৃতির বৈরী আচরণ উপেক্ষা করে ছুটে চলেছে রানা।

অনেকক্ষণ হলো পিছন থেকে কোনও শব্দ শোনেনি ও। ধারণা করল, ফাঁকি দিতে পেরেছে ধাওয়াকারীদের। সত্যিই পেরেছে কি না দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতেই হোঁচট খেল, আছড়ে পড়ল আগাছায় ছাওয়া ঢালে।

গড়িয়ে চিৎ হলো রানা। এতক্ষণে ক্লান্তি হামলা করল ওর উপর। যেন তুষারধসের মত চেপে বসল ওর গায়ে। চোখের সামনে ফুটতে শুরু করেছে লাল-নীল-হলুদ তারা। আর পারল না রানা, চোখ মুদল। ক্ষণিকের জন্য চেতনা হারাল।

কতক্ষণ ওভাবে ছিল বলতে পারবে না, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল ও। মাথার ভিতরে বেজে উঠেছে বিপদের ঘণ্টা। আছড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়াল, ঠেস দিল একটা পাথরে। পায়ে শক্তি পাচ্ছে না একদম। হাঁপানি রোগীর মত ঘড়ঘড় করে শ্বাস নিচ্ছে, হৃৎপিণ্ড এত জোরে লাফাচ্ছে যেন যে-কোনও মুহূর্তে বুকের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

'ওই যে বদমাশটা! পেয়েছি!'

চিৎকারটা কানে আসতেই ঝট করে মাথা ঘোরাল রানা। যা দেখল তাতে হিম হয়ে এল বুক। ওর থেকে কয়েক শ' গজ দূরে, পাহাড়ি ঢালের নিচে পৌঁছে গেছে জনাদশেক লোক, সঙ্গে দুটো শিকারি কুকুর। তাদের সামনে চাবুক হাতে দাঁড়ানো মানুষটা আর কেউ নন, স্বয়ং লর্ড গ্রিফিন!

ছাব্বিশ

স্থির হয়ে গেছে রানা। কতক্ষণ অচেতন ছিল ও? ধাওয়াকারীরা এত কাছে চলে এল কীভাবে? মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, সব প্ল্যান মাটি হয়ে গেছে। দুর্গে গিয়ে লর্ড গ্রিফিনের ল্যাবরেটরি ধ্বংস করা তো দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে আদৌ ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ।

না, হার মানবে না। এখনও ধরা পড়েনি ও। স্রেফ মনের জোরে সিধে হলো, পা-দুটোকে বাধ্য করল চলতে। লর্ড গ্রিফিন ও

তাঁর খুনে বাহিনীকে পিছে ফেলে শুরু করল দৌড়াতে। ঢাল বেয়ে কিছুদূর উঠে আসার পর মোটামুটি সমতল এক টুকরো জমিনের দেখা পেল। দৌড়ের গতি বাড়াল ওখানে পৌঁছে। স্বস্তি পাচ্ছে না, সমতলে উঠে ধাওয়াকারীরাও গতি বাড়াবে... ধরে ফেলবে ওকে।

বাতাসে ভাসছে নানা রকম শব্দ। কর্কশ গলায় ডাক ছেড়ে একটা পাহাড়ি পাখি ডানা মেলল খুব কাছ থেকে, পায়ের ধাক্কায় পাথর গড়াচ্ছে, ভেজা মাটিতে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা, পিছনে শোনা যাচ্ছে চিৎকার। সবকিছু ছাপিয়ে রানার কানে বাজছে নিজের হৃৎস্পন্দন।

সমতল অংশটা পার হবার পর আবারও উঁচু হলো জমি—উঠে গেছে পাথুরে এক রিজে। হাঁচড়-পাঁচড় কেটে ওখানে উঠল রানা, অন্যপাশে উঁকি দিয়ে দেখল, ঢালটা নেমে গেছে দুর্গন্ধময় কাদায় ভরা এক জলায়। রিজের কিনার ধরে ছুটে চলল ও, খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ধারালো পাথরে লেগে কেটে যাচ্ছে পায়ের তলা। বুটজোড়া ফেলে দিয়েছে বলে গাল দিল নিজেকে, কিন্তু এখন আর হা-পিত্যেশ করে কী লাভ? তখন তো আর জানত না, এভাবে ধাওয়া খেয়ে ছুটতে হবে পাহাড়ি পথে।

ঘাড় ফিরিয়ে অনুসরণকারীদের দেখল রানা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে তারা, তাল মেলাতে পারছে না উঁচু-নিচু বন্ধুর জমিতে। কিন্তু সবার সামনে স্বচ্ছন্দে ছুটছেন লর্ড গ্রিফিন, ভাবভঙ্গি প্রফেশনাল অ্যাথলিটের মত, প্রতি পদক্ষেপে কমিয়ে আনছেন শিকারের সঙ্গে দূরত্ব।

ঝুঁকে দুটো পাথর তুলে নিল রানা, তারপর আবার প্রাণপণে দৌড়াতে থাকল। একটু পরেই টের পেল, হেরে যাচ্ছে ও। রিজে উঠে এসেছেন লর্ড গ্রিফিন, খুব শীঘ্রি নাগাল পেয়ে যাবেন ওর। ঘুরে তাঁকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ল ও। ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে পাথরটাকে ফাঁকি দিলেন লর্ড। তাঁর শরীরের পাশ দিয়ে

উড়ে গেল ওটা।

ঢালে নেমে পড়ল রানা, জলায় নেমে যাওয়া ছাড়া বিকল্প দেখছে না। তাতে যদি ফাঁকি দেয়া যায় লর্ডকে। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়। উপর থেকে হুঙ্কার দিয়ে ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রিফিন। পা পিছলে গেল রানার, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ঢালে। জড়াজড়ি করে দু'জনে গড়াতে শুরু করল। নিচে গিয়ে ঝপাস করে পড়ল কাদায়।

খুব গভীর নয় জলা, দু'ফুটের মত। কাদায় মাখামাখি হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। লর্ড তখনও সিধে হতে পারেননি। উল্টো ঘুরে তাড়াহুড়ো করে এগোবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু থিকথিকে কাদা ভেদ করে যেতে পারল না বেশিদূর। পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কাদায় ওর মাথা চেপে ধরলেন লর্ড গ্রিফিন।

পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ল রানা, মুক্তি পেল না। উপায়ান্তর না দেখে ভাঁজ করল একটা পা, আন্দাজে লাথি ছুঁড়ল লর্ডের ঊরুসন্ধি লক্ষ্য করে। ঠিকমত লাগল না আঘাত, তারপরেও কোঁৎ করে একটা শব্দ করলেন গ্রিফিন, ওকে ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন দু'পা। কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল রানা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে নোংরা কাদাপানি। হাত দিয়ে মুখ মুছে ঘুরে দাঁড়াল লর্ডের দিকে।

হাতে ধরা ঘোড়ার চাবুক চালালেন গ্রিফিন, ঠাস্ করে সেটা লাগল রানার গালে। জ্বলে উঠল জায়গাটা। ককিয়ে উঠে গালটা হাত দিয়ে চেপে ধরল রানা, যখন সরাল, তালুতে দেখতে পেল তাজা রক্ত। চাবুকের আঘাতে কেটে গেছে ওর গাল।

'বদমাশ ছোকরা!' গর্জে উঠলেন লর্ড গ্রিফিন। 'যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছিস তুই আমাকে। এখন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নেব তার। খুন করার আগে চাবকে তুলে নেব তোর চামড়া!'

রাগে ফুঁসে উঠল রানা, পকেট হাতড়ে বের করে আনল কুড়িয়ে

নেয়া দ্বিতীয় পাথরটা, ছুঁড়ল ওটা লর্ডের মুখ লক্ষ্য করে। এবার আর সরবার সুযোগ পেলেন না তিনি, সোজা গিয়ে বাম চোখ বরাবর লাগল পাথর। ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন, হাত দিয়ে চেপে ধরলেন আহত চোখটা। ছুটে গিয়ে তাঁর বুকে ধাক্কা দিল রানা, চিৎপাত হয়ে কাদায় পড়ে গেলেন লর্ড।

উল্টো ঘুরে আবার এগোবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলো, পায়ে পা বাধিয়ে ওকে ফেলে দিলেন গ্রিফিন। উঠবার সুযোগ পেল না, তার আগেই ওর ঘাড় চেপে ধরলেন তিনি। চোবাতে শুরু করলেন কাদায়। একবার ডোবাচ্ছেন, একবার ওঠাচ্ছেন—পিস্টনের মত।

খ্যাপাটে গলায় বললেন, 'এবার তোকে খুনই করে ফেলব, বেয়াড়া বদমাশ! এত বড় সাহস... আমাকে ঢিল মারিস?'

এবার আর কোনও কৌশলে কাজ হচ্ছে না, কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছে না রানা। অসহায়ের মত হাত-পা ছুঁড়ল কেবল। ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এল শক্তি। নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, কিন্তু হঠাৎ...

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই দুপ দুপ করে ছন্দোবদ্ধ একটা আওয়াজ পাচ্ছিল রানা। ধীরে ধীরে বাড়ছিল সেটা। হঠাৎ শব্দের উৎস দেখতে পেল ও—একটা ঘোড়া... কাদাপানি ছিটিয়ে টগবগিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। একেবারে কাছে এসে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে হ্রেষারব করে উঠল, দাঁড়িয়ে গেল পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে। লর্ড গ্রিফিন চমকে গেছেন, রানাকে ছেড়ে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছেন ঘোড়াটার দিকে। পরক্ষণে বুক বরাবর ঘোড়ার জোড়া-খুরের লাথি খেয়ে আর্তনাদ করে, উড়ে গিয়ে পড়লেন দশ হাত দূরে। ভারী শরীর দেবে গেল কাদায়, ব্যথায় নড়তেও পারছেন না, আটকা পড়লেন কিছুক্ষণের জন্য।

'রানা!' শোনা গেল মেয়েলি কণ্ঠের ডাক।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াল রানা। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ঘোড়া

আর তার আরোহীর দিকে। চোখ কচলাল অবিশ্বাসে। ভুল দেখছে নাকি? ওই তো মার্টিনির পিঠে পেনি!

হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পেনি। 'উঠে এসো!'

খপ করে ওর বাহু আঁকড়ে ধরল রানা, এক টানে ওকে স্যাডলের পিছনে তুলে নিল মেয়েটা। বলল, 'শক্ত করে ধরো আমাকে।'

ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরল রানা। লাগাম নেড়ে মার্টিনির মুখ ঘোরাল পেনি। পেটে গুঁতো দিতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল কালো ঘোড়াটা। পিছন থেকে ভেসে এল লর্ড গ্রিফিনের উত্তেজিত গালাগাল।

কাদা আর পানি ছিটাতে ছিটাতে জলা পাড়ি দিল মার্টিনি, খানিক পরেই উঠে পড়ল ঘাসে ঢাকা শক্ত জমিনে। এবার ছুটল বাতাসের বেগে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখে নিল রানা—লর্ড গ্রিফিন এখনও পড়ে আছেন কাদায়, তার সঙ্গীসাথীদের চিহ্ন নেই।

'কোত্থেকে এলে তুমি?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল রানা।

হাসল পেনি। 'এর জন্য তোমার বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাতে পারো।'

'রেড? ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। ব্রেকফাস্টের আগে মার্টিনিকে নিয়ে এক্সারসাইজে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম, জঙ্গল থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসছে ও।'

'কোথায় সেটা?'

'কিথলি থেকে মাইলখানেক দূরে। লর্ড গ্রিফিনের একটা ট্রাকের পিছনে চড়ে বসেছিল রেড, গ্রামে ঢোকার আগে নেমে পড়েছিল আমাকে দেখতে পেয়ে। তোমার নাকি সাহায্য দরকার, আমাকে অনেক অনুরোধ করে পাঠিয়েছে। অবশ্য এমনিতেও আসতাম।'

‘ও কেমন আছে? ওভাবে ওকে ফেলে যেতে হলো...’

‘ও মা! এ দেখি উল্টো সুর। তোমার বন্ধু ভালই আছে, রানা। অবস্থা খারাপ তো তোমার। সময়মত যদি না আসতাম, আজ নির্ঘাত মরতে।’

‘থ্যাঙ্কস,’ কৃতজ্ঞতা জানাল রানা। ‘তবে ঝুঁকিটা না নিলেও পারতে। লর্ড গ্রিফিনের শত্রু হয়ে গেলে।’ এত দুর্বল লাগছে ওর, ইচ্ছে করছে পেনির চুলে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।

‘নিকুচি করি লর্ড গ্রিফিনের,’ রাগী গলায় বলল পেনি। ‘একা পেয়ে যেভাবে মারছিল তোমাকে, এমনিতেও ওর সঙ্গে শত্রুতা হয়ে যেত।’

কষ্টের মধ্যেও না হেসে পারল না রানা।

‘অনেক দূরে এসে পড়েছ তুমি, রানা,’ পেনি বলল। ‘খুঁজে পেতে কষ্ট হয়েছে বেশ। যে-অবস্থা দেখছি, তাতে তাড়াতাড়ি তোমাকে কিথলিতে নিয়ে ডাক্তার দেখানো দরকার।’

‘না,’ বলল রানা। ‘কিথলিতে যেয়ো না।’

‘কী!’ রাশ টেনে ঘোড়া থামাল পেনি। স্যাডলের উপর শরীর বাঁকিয়ে তাকাল রানার দিকে। ‘কেন যাব না?’

ক্ষণিকের জন্য ওর সবুজ চোখজোড়া আবারও মুগ্ধ করল রানাকে। সেখানে লুকিয়ে আছে বুদ্ধির দীপ্তি, সরলতা, আর দস্যিপনা।

‘কথা বলছ না কেন?’ মুখ ঝামটে উঠল পেনি।

‘কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে পাগল ভাববে।’

‘আগে শুনি তো!’

কী করতে চায় খুলে বলল রানা। দুর্গে ফেরার কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠল পেনি, নাকচ করে দিল সরাসরি; কিন্তু রানার যুক্তিগুলো শুনে মত পাল্টাল। হয়ে উঠল সিরিয়াস।

‘সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু?’ রানার কথা শেষ হলে জানতে চাইল ও।

‘আমি জানি না, পেনি,’ সত্যি কথাই বলল রানা। ‘কিন্তু চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। কথা হলো, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি না।’

‘নিশ্চয়ই!’ দৃঢ় গলায় বলল পেনি। ‘বাবার সঙ্গে যা করেছে, তাতে এমনিতেই ওই লর্ড ব্যাটা আমার দু’চোখের বিষ। আর এখন তোমার মুখে যা শুনলাম, তাতে তো লোকটাকে নরকের শয়তান বললেও কম বলা হয়। এমন শয়তানকে শায়েস্তা করতে সাহায্য করব না মানে? চলো।’

মার্টিনির পেটে গোড়ালি দাবাল ও। দুই আরোহী নিয়ে আবারও ছুটতে শুরু করল তেজি ঘোড়াটা—বৃষ্টির চাদর ভেদ করে, ঘাস মাড়িয়ে, ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে। ঘোড়ার ঝাঁকুনি আর বৃষ্টিভেজা বাতাস খুব ভাল লাগছে রানার। ভাল লাগছে পেনির শরীরের স্পর্শ। কিছুটা সময়ের জন্য ভুলে গেল বিপদের কথা।

তাড়াহুড়ো করল না পেনি, ঘোড়াকে ক্লান্ত করতে চায় না, তাই রয়ে-সয়ে চালাল মার্টিনিকে। লেক ঘিরে থাকা পাহাড়সারির গোড়ায় পৌঁছে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল রানাকে নিয়ে, গিরিপথ পার হলো পায়ে হেঁটে। রানাদের ফেলে যাওয়া ক্যাম্পে পৌঁছুতে তেমন সময় লাগল না। সবকিছু যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই আছে, লর্ড গ্রিফিনের লোকেরা সম্ভবত সময় পায়নি এদিকে আসবার।

পানির বোতল বের করে ঢক ঢক পানি খেল রানা, ব্যাগ খুলে বের করল খাবারের প্যাকেট, শুকনো কিছু বিস্কুট চালান করল পেটে। এরপর বাড়তি জামাকাপড় বের করে বদলে নিল পোশাক। জুতোও এনেছিল বাড়তি, পায়ে গলাল সেগুলো। পানি দিয়ে ধুয়ে

নিল হাত-মুখ।

রানাকে পোশাক বদলাবার সুযোগ দিতে উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পেনি, ওর ডাক শুনে মুখোমুখি ফিরল এবার। বলল, 'একটু বিশ্রাম নেবে? দেখে মনে হচ্ছে ঝড় বয়ে গেছে তোমার ওপর দিয়ে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'বিশ্রাম নিতে গেলেই অচল হয়ে যাব। বিদ্রোহ করবে শরীর। তারচেয়ে যতক্ষণ চলতে-ফিরতে পারছি, হাতের কাজ শেষ করে নিই।'

ব্যাগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। কাজে লাগার মত জিনিসপত্র বের করে নিচ্ছে। চাচার দেয়া লাইটারটা পেয়ে জ্বালিয়ে দেখল। সন্তুষ্ট হয়ে ভরল পকেটে। পেনিকে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি এখানে অপেক্ষা করলেই ভাল হবে। আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রাগী গলায় বলল পেনি। 'আমি এখানে থাকব কেন? বসে বসে আঙুল চোষার জন্য এসেছি ভেবেছ? নাকি মেয়ে বলে ফের অবজ্ঞা করছ আমাকে?'

'ওরেব্বাপ, সেদিনই শিক্ষা হয়ে গেছে। তোমাকে থাকতে বলছি যুক্তিসঙ্গত কারণে। ব্যাকআপ হিসেবে একজনের থাকা দরকার। বিপদে পড়লে সাহায্য করতে পারবে... অন্তত কিথলিতে ফিরে গিয়ে জানাতে পারবে এখানে কী ঘটেছে। মার্টিনির রাইডার হিসেবে দায়িত্বটা তোমার ঘাড়ে বর্তাচ্ছে।'

'কিন্তু এই শরীর নিয়ে একাকী কী-ই বা করতে পারবে তুমি?'

'জানি না। কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে বিপদে পড়লে কারোই লাভ হবে না।'

অকাট্য যুক্তি রানার, পাল্টা কিছু বলতে না পেরে দ্বিধায় পড়ে গেল পেনি। ওকে একা ছাড়তে চাইছে না, আবার ক্যাম্পেও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়াবার জন্য রানা বলল, 'গালের ক্ষতটা খুব জ্বলছে। কিছু করতে পারো?'

'ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম আছে তোমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। এই তো।' ব্যাগ থেকে ফুপুর দেয়া কিটটা বের করে দিল রানা।

ক্ষতটা আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করে দিল পেনি। তারপর ঢেকে দিল ব্যাণ্ডেজ দিয়ে। বলল, 'ব্যস, হয়ে গেছে। মেরামত করে দিলাম তোমাকে।'

রানার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে সুন্দর একটুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। অনিন্দ্যসুন্দর।

'ধন্যবাদ, পেনি।'মুগ্ধকণ্ঠে বলল রানা।

'মেনশন নট।' রানার গালে আলতো করে চুমু দিল মেয়েটা।

কান গরম হয়ে উঠল রানার। এই প্রথম কোনও মেয়ে চুমু খেল ওর গালে। পেনির সবুজ চোখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে কিছু বলতে গেল, কিন্তু থেমে গেল খসখস আওয়াজ শুনে। ঝট করে ওদিকে মাথা ঘোরাল দু'জনে। ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে ক্যাম্পের দিকে।

পেনির হাত ধরে টান দিল রানা, একছুটে দু'জনে গিয়ে লুকাল একটা গাছের আড়ালে।

বাড়ছে পায়ের শব্দ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি, হাতে ধরে রেখেছে একটা রাইফেল। মার্টিনিকে দেখতে পেয়েই থেমে দাঁড়াল সে। ঝুঁকি নিয়ে আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। মানুষটাকে চিনতে পেরে শক্ত হয়ে গেল চোয়াল।

ড্যানি গ্রিফিন!

চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে ড্যানি, খুঁজছে ওদেরকে। গ্রিফিন-তনয়ের পিঠ ওদের দিকে ঘুরে যেতেই আড়াল থেকে

বেরিয়ে এল রানা। পা টিপে টিপে চলে গেল তার পিছনে।

'হাই, ড্যানি!' নরম সুরে ডাকল ও।

পাঁই করে ঘুরল ড্যানি, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল বুকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে, হাত থেকে ছুটে গেল রাইফেল। তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, চড়ে বসল বুকের উপর। চেঁচাল, 'বন্দুকটা নাও, পেনি!'

দৌড়ে এল পেনি, ছোঁ মেরে রাইফেলটা তুলে নিল। তাক করল ড্যানির দিকে।

হাত মুঠো করল রানা, খুনের নেশা চেপে বসেছে মাথায়, ঘুষি মারতে প্রস্তুত। আঁতকে উঠে ড্যানি চেঁচাল, 'না-আ! প্লিজ, মেরো না আমাকে।'

'কীসের মার?' ক্রুদ্ধ গলায় বলল রানা। 'তোমাকে তো আমি খুন করব, ড্যানি।'

'প্লিজ, আমার কথা শোনো। আমি তোমার দলে।'

টিটকিরির ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'হ্যাঁ, পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে তা-ই তো দেখছি।'

'না, না, আমি সিরিয়াস। বিশ্বাস করো!'

'কেন করব?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ড্যানিকে। বিষণ্ন হয়ে আছে তার চেহারা, লড়াইয়ের কোনও চেষ্টা করছে না। ইটনের ড্যানি আর এই ড্যানি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই মানুষ।

'বাবা পাগল হয়ে গেছেন, রানা,' বলল সে। 'ওঁকে আর সহ্য করতে পারছি না আমি। আমার জীবন নরক করে তুলেছেন উনি।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না,' রানা বলল। 'আবার জিজ্ঞেস করছি, কেন বিশ্বাস করব তোমাকে?'

'কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব... যদি তুমি সাহায্য করো আমাকে। একমাত্র আমরাই ঠেকাতে পারি বাবাকে,

আর কেউ না।' কণ্ঠে আকুতি ফুটল ড্যানির।

'বোধহয় সত্যি কথাই বলছে ও,' শান্ত গলায় বলল পেনি।

'ওকে তুমি চেনো না,' রানা অনড়।

'ঠিক। কিন্তু আমার হাতে এখন রাইফেল আছে। ও কিছু করতে পারবে না। শোনাই যাক না কী বলতে চায়।'

মুখ তুলে পেনির দিকে তাকাল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এল। উঠে বসে গা থেকে ধুলোবালি ঝাড়ল ড্যানি। নিচু গলায় বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

'কাজের কথায় এসো,' ধমকের সুরে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ড্যানি। 'সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার কীর্তি দেখেছি আমি, রানা। তখুনি বুঝতে পেরেছি, এতদিন থেকে যা মনে মনে ভাবছি, তা শুধুমাত্র তোমাকে দিয়ে হতে পারে। তাই ঠিক করেছি তোমার সাহায্য নেব... তোমাকে সাহায্য করব। কাল রাতেও সাহায্য করবার ইচ্ছে ছিল, বিলিভ মি, কিন্তু বাবার ভয়ে পারিনি। ওঁকে আমি ভীষণ ভয় পাই, রানা। কী ভীষণ ভয়, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না...'

'দরকার নেই,' বাধা দিল রানা। 'আমি অনুমান করতে পারছি।' গলার স্বর একটু নরম হয়েছে ওর।

'এতদিন খুব খারাপ ব্যবহার করেছি আমি তোমার সঙ্গে,' ড্যানি বলল। 'কাজটা ঠিক হয়নি। এখন বুঝতে পারছি আমার ভুল। আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

'বাহ্, এতেই সব ঠিক হয়ে গেল? ভাবছ মুখে ক্ষমা চাইলেই সমস্ত দুর্ব্যবহার আর অত্যাচারের ছাপ মুছে যাবে আমার মন থেকে?'

'প্লিজ, একটু বুঝতে চেষ্টা করো। আমার নিজের মাথাও ঠিক ছিল না। ওষুধের প্রভাবে... যাক গে, এখন সব পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছি আমি। ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি কিনা...'

'সাদা ট্যাবলেটগুলো তো?' রানা বলল। 'আমি জানি।'

ওর কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল ড্যানি। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, রানা। সবকিছুর জন্য।'

আস্তে হাতটা সরিয়ে দিল রানা। 'থাক, এখন আর মায়াকান্না ভাল লাগছে না।'

'আমি মন থেকে বলছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—নিজের তো বটেই, বাবারও। তাই সাহায্য করব তোমাকে। খুঁজতেও বেরিয়েছি সে-কারণেই। এখানে না পেলে কিথলিতে যেতাম।' পালা করে রানা আর পেনির দিকে তাকাল ড্যানি। 'তোমরা এখানে কী করছিলে?'

ভাল করে তাকে দেখল রানা। নাহ্, অভিনয় করছে বলে মনে হচ্ছে না। আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। সবকিছু খুলে বলবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। লর্ড গ্রিফিনকে ঠেকাতে হলে ড্যানির সাহায্য খুবই প্রয়োজন।

'তুমি যা চাইছ, তা-ই করতে এসেছি আমরা,' বলল রানা। 'ঠেকাব তোমার বাবাকে, যাতে আর কারও সর্বনাশ করতে না পারেন তিনি। এসো, হাত মেলাও।'

দু'হাতে রানার বাড়িয়ে দেয়া হাত চেপে ধরল ড্যানি। 'কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।'

'সাবধান, ড্যানি! যদি এটা চালাকি হয়, আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না।'

'না, না, চালাকি করছি না। অনেক হয়েছে, এভাবে আর বাঁচতে পারব না। মুক্তি চাই আমি, রানা।'

বিশ মিনিট পর রানা আর ড্যানিকে এগোতে দেখা গেল বনের মাঝ দিয়ে। ফেন্সের একটা নির্দিষ্ট অংশের কাছে গিয়ে গাছপালার আড়াল থেকে বেরুল ওরা। জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ঝোপ

সরিয়ে একটা গর্ত দেখাল ড্যানি, বেড়ার তলায় ঢুকেছে ওটা।

'শেয়ালের কাণ্ড,' বলল সে। 'বাবা জানেন না এটার কথা, জানলে বন্ধ করে দিতেন।'

গর্তে ঢুকে পড়ল দু'জনে। হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো ফেন্সের অন্যপাশে। ওখান থেকে জমিন ঢালু হয়ে নেমে গেছে লেকের পানে। দৌড়ে পানির কিনারে গেল ওরা, একটা নৌকা বেঁধে রাখা হয়েছে পাথরসারির আড়ালে।

'এটা নিয়ে ঘণ্টাদুয়েক আগে এসেছি আমি,' নৌকায় উঠে বলল ড্যানি। দু'হাতে তুলে নিল দাঁড়। 'আসার সময় কেউ দেখতে পায়নি, তবে এবার সতর্ক থাকতে হবে।'

রানাও উঠল নৌকায়। বসল ড্যানির মুখোমুখি। পেনি রয়ে গেছে ক্যাম্পে, ড্যানিকে রানা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে বলে ও আর পীড়াপীড়ি করেনি আসার জন্য। রানার কথামত ব্যাকআপের দায়িত্ব পালন করছে ও। বিনকিউলার দিয়ে চোখ রাখবে দুর্গের উপর, বন্ধুকে বিপদে পড়তে দেখলে সাহায্য করতে আসবে, কিংবা চলে যাবে কিথলিতে—পুলিশ আর এরফান চাচাকে খবর দেবার জন্য।

বাঁধন খুলে দাঁড় টানতে শুরু করেছে ড্যানি, ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে নৌকা। পানি কেটে এগোচ্ছে তর তর করে। ড্যানি বলল, 'বেশিরভাগ ওয়ার্কার বাবার সঙ্গে গেছে। অল্প কিছু লোক শুধু রয়ে গেছে পিছে—ভাঙা গেট মেরামত করছে ওরা, আর কেটে ফেলছে পাইন গাছটা।'

'এত তাড়াতাড়ি?' একটু অবাক হলো রানা।

'সময় নষ্ট করেন না বাবা। হুকুম দেয়ামাত্র দেখতে চান সেটা পালন করা হয়েছে।'

'ল্যাবে কে কে আছে?'

'বাবার টিমের বিজ্ঞানীরা থাকবে, তবে ওরা তোমার ব্যাপারে

তেমন কিছু জানে না। ধাপ্পা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারবে।'

'কিন্তু বাইরে পাহারাদার আছে।'

'আমরা দুর্গের ভিতর দিয়ে যাব না। দ্বীপের পিছনদিকে, পানির ধারে একটা ডক আছে—ওখান দিয়ে সরাসরি ঢোকা যায় ল্যাবরেটরিতে, লোডিং ডোর আছে। এমনিতে তালা দেয়া থাকে, তবে বাবার অফিস থেকে চাবি চুরি করে এনেছি আমি, ঢুকতে অসুবিধে হবে না। প্রথমে আমি ঢুকব; যদি দেখি সব ঠিক আছে, তা হলে সঙ্কেত দেব তোমাকে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী, ধ্বংস করব বাবার সমস্ত অশুভ গবেষণা। প্রথমে কাগজপত্র নষ্ট করব, এরপর নষ্ট করব সিলভারব্যাক সেরামের স্টক—ল্যাবরেটরির পিছনে একটা স্ট্রংরুমে রাখা আছে সবকিছু। চেষ্টা করব কেউ কিছু টের পাবার আগেই যতটা সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি করে পালিয়ে যেতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। এখনও মাথাটা হালকা লাগছে ওর। নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে জগৎ-সংসার থেকে। নেশা করলে এমন হয় বলে শুনেছে। নেশাই বটে—তছনছ করতে চলেছে লর্ড গ্রিফিনের ল্যাবরেটরি, তাঁর সারা জীবনের সাধনা... অথচ কোনও বিকার হচ্ছে না ওর। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব কোনোদিন করতে পারত বলে মনে হয় না।

অবশ্য এ-ও স্বীকার করতে হবে, কোনও অন্যায় করতে চাইছে না ও। লর্ড গ্রিফিনকে ঠেকাতে চলেছে নৈতিকতার খাতিরে। এটাই একমাত্র সুযোগ। পরে আর সম্ভব না-ও হতে পারে। গ্রিফিনের সুরক্ষিত দুর্গ এখনই সবচেয়ে দুর্বল... এখনই তাকে ঘায়েল করবার সুবর্ণ সুযোগ। লোকটা সতর্ক হয়ে গেলে আর নাগাল পাওয়া যাবে না কিছুতেই। টাকা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি... কী নেই তাঁর? চাইলেই নিজেকে নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র

চাদরে মুড়ে ফেলতে পারবে।

কাশল রানা। বুকের জ্বালাপোড়াটা ফিরে এসেছে আবার। মুখ তুলতেই গ্রিফিন কাসলের প্রকাণ্ড কাঠামোটা চোখে পড়ল। কাছে চলে এসেছে।

ঘাড়ের খাটো চুলগুলো সড় সড় করে দাঁড়িয়ে গেল রানার। ধুকপুক করছে বুক—ভয়ে, উত্তেজনায়। একবার পালিয়েছিল সাক্ষাৎ এই নরক থেকে, কিন্তু দ্বিতীয়বার পারবে কি?

সাতাশ

দুর্গের ছায়ায়, পাথুরে এক পিয়ারে নৌকা ভিড়াল ড্যানি। বোলার্ডে দড়ি বাঁধছে, এমন সময় বয়ে গেল দমকা হাওয়া... সেই সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট। কেঁপে উঠল রানা, ঠোকাঠুকি শুরু হলো দাঁতে। দপ দপ করছে মাথা। যেন জ্বরে পড়েছে। এই শরীর নিয়ে কদ্দূর কী করতে পারবে ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল।

কাঠ দিয়ে তৈরি বড়সড় একটা দরজার কাছে ওকে নিয়ে গেল ড্যানি। বলল, 'ঠিক ওপাশেই ল্যাবরেটরি। আগে স্টোরেজ এরিয়া ছিল ওটা, নৌকায় করে বিভিন্ন রকম রসদ আনা হতো দুর্গে।' পকেট হাতড়ে চাবির গোছা বের করল সে। 'তুমি এখানেই থাকো, আমি না ডাকলে এসো না।'

'কীভাবে ডাকবে? নাম ধরে নিশ্চয়ই নয়?'

'উঁহুঁ। শিস বাজাব—একবার।'

কি-হোলে চাবি ঢোকাল ড্যানি। মোচড় দিতেই ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা। দরজার পাল্লা একটু ফাঁক করল ও। ওপাশ থেকে ভেসে এল বেগুনি আলোর আভা। বড় করে শ্বাস নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল ছেলেটা।

পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল রানা। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ভিতরে। ল্যাব কোট পরা বেশ ক'জন মানুষ চোখে পড়ল। ব্যস্ত, ড্যানির দিকে একবারের বেশি দু'বার তাকাল না। ড. হিদোশিকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

একটু পরেই কথা বলে উঠল ড্যানি, গলার স্বরে কর্তৃত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। 'অ্যাটেনশন, এভরিওয়ান! আপনাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন বাবা। অফিসে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন এখুনি।'

কাজ থামাল বিজ্ঞানীরা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'গত রাতে আর আজ ভোরে কিছু সমস্যা হয়েছিল এখানে, শুনেছেন নিশ্চয়ই,' বলল ড্যানি। 'সে-বিষয়ে ব্রিফ করা হবে আপনাদেরকে। দাঁড়িয়ে থাকবেন না, এখুনি গিয়ে দেখা করুন বাবার সঙ্গে।'

'আমাদেরকে যেতে হবে কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল লম্বা, টিংটিঙে এক বিজ্ঞানী। মাথায় ধূসর চুল, চোখে ভারী লেন্সের চশমা—দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কট্টর প্রফেসরের মত লাগছে তাকে। 'উনি এখানে এসেই তো যা বলার বলতে পারেন।'

'আপনাদের ইচ্ছেয় চলেন না লর্ড গ্রিফিন!' কড়া গলায় বলল ড্যানি। 'যেটা বলা হয়েছে সেটা করুন।'

'বললেই হুট করে যাওয়া যায়?' নড়ল না ত্যাদড় বিজ্ঞানী। 'একটা এক্সপেরিমেন্টের মাঝখানে আছি আমি। এটা শেষ না করে...'

'যাবেন, নাকি বাবাকে গিয়ে বলব আপনার অবাধ্যতার কথা?' ধমকে উঠল ড্যানি। 'আর কে কে ওঁর সঙ্গে থাকতে চান হাত

তুলুন। আমি লিস্ট বানিয়ে বাবাকে দিয়ে আসছি।'

দেখা গেল কারোরই সে-সাহস নেই। হাতের কাজ ফেলে সবাই হুড়মুড় করে ছুটল প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির দিকে। লম্বা বিজ্ঞানীও কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে পিছু নিল সঙ্গীদের। সবাই গেছে কি না নিশ্চিত হবার জন্য একটু অপেক্ষা করল ড্যানি। তারপর শিস বাজিয়ে সঙ্কেত দিল রানাকে।

দরজা খুলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ল রানা। ভিতরের ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে উঠল একবার। নাকে পাচ্ছে পরিচিত গন্ধগুলো।

'জলদি এসো!' হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকল ড্যানি। 'বেশি সময় পাব না আমরা।'

সারি সারি ঈলের ট্যাঙ্ক আর শূকরের খাঁচা পেরিয়ে কামরার একেবারে পিছে চলে গেল দু'জনে। ব্যাঙ্কের ভল্টের মত ভারী স্টিলের একটা দরজা দেখা গেল ওখানে। কম্বিনেশন জানা আছে ড্যানির, মিনিটখানেকের মধ্যেই খুলে ফেলল তালা। রানাকে নিয়ে ঢুকল স্ট্রংরুমের ভিতরে। সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল আলো।

ভিতরটা বাইরের চেয়ে ঠাণ্ডা। এয়ার কণ্ডিশনারের সাহায্যে প্রায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি নামিয়ে আনা হয়েছে তাপমাত্রা। স্ট্রংরুমের অভ্যন্তরে চোখ বোলাল রানা। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কেবিনেট—গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র রাখা হয় ওগুলোয়। আরেক পাশে রয়েছে কতগুলো কাঁচের আলমারি, ভিতরে কাঠের র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে থরে থরে সিলভারব্যাক সেরামের টেস্টটিউব।

'কেবিনেটগুলো তুমি নাও,' ড্যানি বলল। 'আমি সেরামের ব্যবস্থা করছি।'

কেবিনেটের ড্রয়ার খুলল রানা, ভিতর থেকে বের করে আনল নানা রকম ফোল্ডার, নোটবুক, রেজিস্টার; সব ফেলে দিল মেঝেতে। পিছনে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে

ড্যানিকে মুঠোয় মুঠোয় টেস্টটিউব দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে দেখল ও। মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব যা ছিল, তা দূর হয়ে গেল নিমেষে। না, কোনও চালাকি করছে না ছেলেটা, সত্যিই ধ্বংস করছে সেরামগুলো।

নতুন উদ্যম অনুভব করল রানা, একের পর এক ড্রয়ার খুলে বের করে আনল সমস্ত কাগজপত্র, অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঝেতে উঁচু এক স্তূপ করে ফেলল। ড্যানি ততক্ষণে সব টেস্টটিউব ভেঙে ফেলেছে, পায়ের তলায় ফেলে গুঁড়ো করেছে ট্যাবলেট ভরা যত শিশি পেয়েছে সব।

পকেট থেকে লাইটার বের করল রানা। কুটিল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'শুভ কাজটা আমি করব, না তুমি?'

'সম্মানটা তোমারই প্রাপ্য,' পাল্টা হাসল ড্যানি। 'লাগাও আগুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লাইটার জ্বালল রানা, নিচু হয়ে ধরিয়ে দিল কাগজের স্তূপে। চোখের পলকে লকলকিয়ে উঠল লেলিহান শিখা। ছড়িয়ে থাকা কাগজপত্র তার ভিতর ছুঁড়ে দিল ও। ততক্ষণে কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে স্ট্রংরুমের অভ্যন্তর। জ্বালা করছে চোখ।

'বেরোও,' বলল ড্যানি।

কাশতে কাশতে দু'জনে বেরিয়ে এল স্ট্রংরুম থেকে। খোলা দরজা দিয়ে একই সঙ্গে বেরুল রাশি রাশি কালো ধোঁয়া। খাঁচায় বন্দি শূকরের দল যেন পাগল হয়ে উঠল ধোঁয়ার গন্ধে, তাদের বিচিত্র আওয়াজে ভরে গেল ল্যাবের ভিতরটা।

'ছেড়ে দেবে ওদেরকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল ড্যানি। 'হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছে ওরা সেরামের কারণে। ছেড়ে দিলে আমাদেরকেই আক্রমণ করে বসবে। তারচেয়ে আগুনে পুড়ে মরে যাক। এমনিতেও বাঁচত না, ইনজেকশন দেবার পর বেশিদিন বাঁচে না এরা।'

'কিন্তু ওখানে তোমার চাচা আছে!' বলল রানা। ছুটে গেল এডগারের খাঁচার সামনে। গুটিসুটি হয়ে বসে আছে বেচারা, চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

ড্যানিও এসেছে রানার পিছু পিছু। বলল, 'যেতে দাও, রানা। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে চাচার মরে যাওয়া ভাল।'

'না, তা হয় না,' গোঁয়ারের মত বলল রানা। 'চাবি দাও। ওঁকে আমি বের করে আনব।'

'খাঁচার চাবি তো আনিনি আমি।'

চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে একটা ওঅর্কবেঞ্চের তলা থেকে বের করে আনল একটা স্প্যানার। ড্যানিকে বলল, 'সরে দাঁড়াও।'

স্প্যানার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। কয়েক বাড়ি দিতেই ভেঙে গেল তালা।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল এডগার, বেরিয়ে এল খাঁচা থেকে। মুখোমুখি হলো রানার। মনে হলো কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারল না। ঝট করে পাশ ফিরল, ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গেল সে। লোডিং ডোর খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

'চলো, আমরাও যাই,' ড্যানি বলল।

'না, কাজ এখনও শেষ হয়নি,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'ল্যাবরেটরি এখনও অক্ষত রয়ে গেছে। স্প্যানারটা নাও। এসো আমার সঙ্গে।'

সিঁড়ির গোড়ায় দেখা কুঠারটার কাছে গেল রানা, ব্র্যাকেট থেকে নামিয়ে আনল ওটা। ড্যানির দিকে মাথা ঘুরিয়ে ছোট্ট করে নড করল। 'শুরু করা যাক।'

তাণ্ডবে মেতে উঠল দু'জন। কুঠার আর স্প্যানার নিয়ে হামলা করল ঈলের ট্যাঙ্কগুলোর উপরে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো মুহুর্মুহু, সেইসঙ্গে পানির স্রোত... ট্যাঙ্ক থেকে মেঝেতে আছড়ে

পড়ল ঈলেরা। ডাঙায় তোলা মাছের মত শুরু করল তিড়িংবিড়িং। ট্যাঙ্ক ভেঙে ক্ষান্ত হলো না রানা আর ড্যানি, একই সঙ্গে ধ্বংসযজ্ঞ চালাল ইকুইপমেন্ট আর আসবাবপত্রের উপরেও। লণ্ডভণ্ড করে ফেলল পুরো ল্যাবরেটরি।

গ্লাস ঈলের ট্যাঙ্কের সামনে গেল রানা। কুঠার তুলে কাঁচের গায়ে কোপ দিতে যাবে, এমন সময় উপর থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠের ধমক।

'থামো!'

মুখ তুলল রানা। প্ল্যাটফর্মে উদয় হয়েছে বানর-মানব কালহুন, হাতে রাইফেল, তাক করে রেখেছে ওর দিকে।

'পারলে থামান!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল ও।

'সানন্দে,' বলে ট্রিগার চাপল কালহুন।

তার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে রানা। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট ওর গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল, পলেস্তারা খসাল দেয়ালের। ক্রল করে সরে যাচ্ছে রানা, আবার গুলি করল কালহুন। এবার সেটা লাগল গ্লাস ঈলের ট্যাঙ্কে। চৌচির হয়ে গেল কাঁচ। পানির ঢল নামল মেঝেতে।

খিস্তি করে উঠল কালহুন। সিঁড়ি ধরে নেমে এল নিচে। ততক্ষণে একসারি কেবিনেটের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে রানা। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে ড্যানিকে দেখতে পেল ও, শুয়োরদের একটা খাঁচার উপরে চড়ে বসেছে। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল।

মাথা নিচু করে ছুট লাগাল রানা। চোখের পলকে পৌঁছে গেল খাঁচার কাছে। উপর থেকে হাত বাড়িয়ে ওকে এক টানে উঠিয়ে নিল ড্যানি। তারপর স্প্যানারের এক বাড়িতে ভেঙে দিল ঠিক নিচের খাঁচার তালা।

পরমুহূর্তে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। খাঁচার দরজা ঠেলে উন্মত্তের

মত বেরিয়ে এল একটা শুয়োর—সিলভারব্যাক সেরামের সবচেয়ে সফল সাবজেক্ট... পিছনের পা ছাড়া বাকি পুরো শরীর যার দানবে পরিণত হয়েছে। খাঁচা থেকে বেরিয়েই বাতাসে গন্ধ শুঁকল শুয়োরটা, গরগর করে ক্রুদ্ধ ডাক ছাড়ল একটা।

একে একে সবগুলো খাঁচার উপরে গেল রানা আর ড্যানি। তালা ভেঙে মুক্ত করল সবক'টা শুয়োরকে। তারপর যা ঘটল, তা ভয়াবহ। পৈশাচিক গবেষণার শিকার হয়ে চরম যন্ত্রণার জীবন কাটাচ্ছিল হতভাগ্য প্রাণীগুলো, প্রতিশোধ নেবার জন্যে হয়ে উঠেছিল উন্মাদ। খাঁচা থেকে বেরিয়েই গন্ধ পেল তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী মানুষদের একজনের। সে কালহুন।

একযোগে গর্জন করল সবক'টা শুয়োর। তারপর এগিয়ে গেল সামনে। হারিয়ে গেল ধোঁয়ার মেঘে। এক মুহূর্ত পরেই চিৎকার শোনা গেল কালহুনের, সেই সঙ্গে একটা গুলির আওয়াজ। এর পরেই ভেসে এল পাশবিক গর্জন আর হুটোপুটির শব্দ। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বানর-মানব। গা গুলিয়ে উঠল হাড়-মাংস ছেঁড়ার বীভৎস আওয়াজে।

স্ট্রিংরুম থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। লোডিং ডোরের দিকে তাকাতেই লেলিহান শিখা দেখতে পেল ছেলেরা। ড্যানি বলল, 'ওদিক দিয়ে আর বেরুনো যাবে না।'

'জানি,' রানা বলল। 'সামনের রাস্তাই ধরতে হবে। চলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ড্যানি। এক লাফে দু'জন নেমে এল খাঁচার উপর থেকে। শুয়োরগুলো কালহুনকে নিয়ে ব্যস্ত, সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ছুটে সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল উপরে। মাঝামাঝি পৌঁছে থেমে গেল রানা, ওর ডানপাশে সেই দাহ্য পদার্থের সতর্কবাণী লেখা দরজাটা।

'কী আছে ভিতরে?' ড্যানির কাছে জানতে চাইল ও।

'প্রিজার্ভিং ফ্লুইড, সলভেন্ট আর অ্যালকোহল,' ড্যানি বলল।

'গবেষণার কাজে লাগে।'

'চাবি আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ।' গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিল ড্যানি, কি-হোলে ঢুকিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

ভিতরে কাঠের র‍্যাকে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা রকম কাঁচের জার, বোতল আর শিশি—পুরো দুর্গকে আগুনে পোড়াবার পক্ষে যথেষ্টরও বেশি জ্বালানি। রানার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ড্যানি। 'তুমি কি...'

'যদি তুমি চাও,' সংক্ষেপে বলল রানা।

চোয়াল শক্ত হলো ড্যানির। 'অবশ্যই চাই।'

দু'জনে অ্যালকোহলের দুটো জার তুলে নিল, বাইরে এসে ছুঁড়ে ফেলল নিচের মেঝেতে। সশব্দে ভেঙে গেল ওগুলো। মেঝেতে গড়াতে শুরু করল তরল অ্যালকোহল, আগুনের স্পর্শ পাওয়া মাত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। ক্ষণিকের জন্য কালহুনকে দেখতে পেল রানা, তবে না দেখলেই বুঝি ভাল ছিল। মানুষ বলে আর চেনার উপায় নেই, একতাল রক্তপিণ্ড বললেই বেশি মানাবে—তার উপর হুটোপুটি করছে রাক্ষুসে শুয়োরের পাল।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ল্যাবরেটরির অভ্যন্তর। কাশতে কাশতে আরও কয়েকটা জার এনে নিচে ফেলল রানা আর ড্যানি। তারপর রওনা হলো উপর দিকে। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, কিছুক্ষণের ভিতর অ্যালকোহলের আগুন ছড়িয়ে পড়বে পুরো ল্যাবে। চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে লর্ড গ্রিফিনের প্রজেক্ট সিলভারব্যাক। আর আগুন যখন দাহ্য পদার্থের গুদামে পৌঁছুবে, বিস্ফোরণ ঘটে ধ্বংস হবে পুরো দুর্গটাই।

দরজা খুলে ল্যাব থেকে বেরুতেই ড. হিদোশির মুখোমুখি হলো রানা আর ড্যানি। খোলা দরজা দিয়ে আগুনের আভা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে, রানাকে দেখেও দেখল না যেন। শুধু

জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'আগুন লেগেছে ল্যাবে,' ড্যানি বলল। 'পালান এখান থেকে।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল হিদোশি। দুই কিশোরকে পাশ কাটিয়ে ছুট লাগাল দরজার দিকে।

খপ করে তার হাত টেনে ধরল রানা। 'যাবেন না। ওখানে কিছুই করবার নেই আপনার।'

'ছাড়ো!' ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল হিদোশি। 'এভাবে সব ধ্বংস হতে দিতে পারি না আমি!' তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা ধ্বংস হতে দেখে পাগল হয়ে গেছে। দৌড়ে ঢুকে গেল ল্যাবে।

রানাও পিছু নিতে চাইছিল, কিন্তু ওকে থামাল ড্যানি। 'যেতে দাও। ওকে বাঁচাতে চাইলে নিজে মরবে। এসো।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা, তারপর পিছু নিল ড্যানির। একের পর এক প্যাসেজ আর সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছুল দুর্গের নিচতলায়। তারস্বরে ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে সবখানে। হলঘরে ছোটাছুটি করছে বিজ্ঞানী আর সিকিউরিটির লোকজন, দুর্গ থেকে বেরুবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল রানা ও ড্যানি, বেরিয়ে এল সামনের আঙিনায়। আর তখুনি গুমগুম শব্দে ঘটল বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল মাটি। তাল হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল ওরা। পিছনে চুরে উঠল গ্রিফিন কাসল। দেয়ালে ফাটল দেখা দিল, ধসে পড়ল বিশাল এক অংশ। ধ্বংসস্তূপকে ঘিরে উঠে এল আগুনের লকলকে শিখা।

ধুলোবালিতে সারা শরীর ঢেকে গেছে, কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল রানা। লোকজন সবাই পালিয়েছে। গা ঝাড়ল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল দুর্গের ধ্বংসস্তূপের দিকে।

'সব শেষ,' বলল রানা। 'আর কোনোদিন কেউ মরবে না এই দুর্গের ডানজনে। থ্যাঙ্ক ইউ, ড্যানি। তুমি সাহায্য না করলে...'

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থমকে গেল রানা। চেহারা থেকে রক্ত

সরে গেছে ড্যানির। দৃষ্টিতে নিখাদ আতঙ্ক। তাকিয়ে আছে ওর পিছন দিকে। পাঁই করে ঘুরল ও, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল নিজেও।

দোনলা একটা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড গ্রিফিন। দু'চোখ জ্বলছে ভাঁটার মত। রানা ঘুরে দাঁড়াতেই খ্যাপাটে গলায় বললেন, 'তা হলে এতদিন আস্তিনে সাপ পুষেছি আমি? আর রানা... ইউ সান অভ আ বিচ! প্রথম সুযোগেই তোমাকে খুন করা উচিত ছিল আমার!'

'যা করেননি তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই এখন,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। ভয়-ডর কেটে গেছে। 'হার মেনে নিন।'

'কীসের হার? তোমাদের গুলি করে যদি ঈলের খাবার না বানিয়েছি তো...'

'প্লিজ, বাবা,' অনুনয় করল ড্যানি। 'এখন আর এসব বোলো না। সব শেষ হয়ে গেছে।'

'কিছুই শেষ হয়নি!' গর্জে উঠলেন লর্ড গ্রিফিন। 'ভেবেছ ঠেকাতে পারবে আমাকে?'

'আপনি উন্মাদ,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'সেজন্যেই আজ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। কোনোদিন পারবেনও না। উন্মাদরা কিছুতেই সফল হয় না।'

থুতু ফেললেন গ্রিফিন। 'এসব কিছু না, সামান্য সেটব্যাক। অন্য কোনও দেশে চলে যাব আমি, যেখানে আমার প্রতিভার কদর করবে লোকে। কেউ আমাকে থামাতে পারবে না, রানা।'

পানি গড়াচ্ছে ড্যানির চোখ দিয়ে। সেটা লক্ষ করে ধমকে উঠলেন তিনি, 'কান্না থামাও! আমি আগেই বুঝেছিলাম, তুমি একটা নাজুক, দুর্বল ছেলে। তোমার মায়ের সমস্ত দোষ পেয়েছ তুমি। সেজন্যেই মেয়েমানুষের মত কাঁদছ ভয়ে।'

'ভয় না, বাবা,' ভেজা গলায় বলল ড্যানি, 'আমি কাঁদছি তোমার জন্য কারণ এতকিছুর পরেও আমি তোমাকে ভালবাসি...

তুমি আমার বাবা।'

'ন্যাকামো ছাড়ো!'

'পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারবেন না আপনি,' বলল রানা। 'পুলিশ আসছে।'

'সত্যি? নাকি আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছ, ছেলে? যেটাই হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। রানওয়েতে অপেক্ষা করছে আমার বিমান, আর আমার রিসার্চের পুরোটাই জমা আছে এখানে,' কপালের পাশে আঙুলের টোকা দিলেন লর্ড। হাসলেন ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে। 'ল্যাবরেটরি আর গবেষণার কাগজপত্র ধ্বংস করেছ হয়তো, কিন্তু সেখান থেকে পাওয়া প্রতিটা তথ্য, প্রতিটা আবিষ্কার রাখা আছে আমার মাথায়। নতুন একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করতে সময় লাগবে না আমার... সময় লাগবে না আবারও সিলভারব্যাক সেরাম তৈরি করতে। আমি জানি কীভাবে কী করতে হবে, আর সেটা আমি করে ছাড়ব। সুপার-সোলজারের বাহিনী আমি তৈরি করবই, রানা। আর আজকের এই ধৃষ্টতার প্রতিদান তোমাকে কীভাবে দেব, জানো? আমার বাহিনী দিয়ে তোমার দেশ... তোমার ওই সোনার বাংলাকে ধ্বংস করে দিয়ে!' রাইফেল কক করলেন তিনি। 'অন্য কোনও সময় হলে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে বলতাম তোমাদের, কিন্তু আজ... এখানে আমিই স্রষ্টা, আমিই ঈশ্বর! মৃত্যুর জন্য তৈরি হও!'

'থামো, বাবা, প্লিজ!' ড্যানির কণ্ঠে আকুতি ফুটল। 'এ-কাজ কোরো না। আমি তোমার ছেলে... তোমার রক্ত!'

'কীসের ছেলে? কীসের রক্ত? তুমি একটা কীটেরও অধম, ড্যানি। আজ যা করলে, তা আমার ছেলে হলে পারতে না। মৃত্যুই তোমার প্রাপ্য। তোমার অভাব আমি কোনোদিন অনুভব করব না, কারণ আমার সত্যিকার সন্তান হবে আমারই বানানো সৈনিকেরা—নিষ্ঠুর, শক্তিশালী, নির্ভয়! ঠিক যেমনটা আমি চাই। ওরাই হবে আমার পরিবার, আমার উত্তরাধিকারী।'

রাইফেল তুললেন লর্ড, তাক করলেন ছেলের মাথায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল রানার, ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে উঠেছে প্রতিটা পেশি। লর্ডকে ট্রিগার চাপতে দেখলেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে ড্যানিকে, নিজেও ঝাঁপ দেবে মাটিতে। বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, কিন্তু চেষ্টা না করে হাল ছাড়তে রাজি নয় ও।

আর তখুনি চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। লেকের বুকে আলোড়ন উঠেছে, পানি তোলপাড় করে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে কী যেন। একযোগে সেদিকে মাথা ঘোরাল তিন জন—লর্ড গ্রিফিন, ড্যানি ার রানা। পরমুহূর্তে রকেটের মত পানির সারফেস ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি, উঠে এল ডাঙায়।

'এডগার!' বিস্মিত গলায় বললেন গ্রিফিন।

বড়, কালো দুই চোখ মেলে পরিস্থিতি যাচাই করল এডগার, তারপর এগোতে শুরু করল ভাইয়ের দিকে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, বেরিয়ে এসেছে ধারালো দাঁতের সারি। হাবভাবে পরিষ্কার হিংস্রতা।

'থামো, এডগার!' চেঁচালেন গ্রিফিন।

এই প্রথম তাঁকে ভয় পেতে দেখছে রানা। পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করেছেন। ব্রিজে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু থামল না এডগার। দু'হাত বাড়িয়ে ক্রমাগত এগোচ্ছে সে।

'থামো, গড ড্যাম ইট!'

কীসের থামাথামি, লর্ডের উপর হামলে পড়ল এডগার। উপায়ান্তর না দেখে ট্রিগার চাপলেন গ্রিফিন, দুই ব্যারেলই খালি করলেন ভাইয়ের বুকে-পেটে। সৃষ্টি হলো বড় বড় কতগুলো ক্ষতের। কাতর কোনও ধ্বনি বেরুল না এডগারের মুখ দিয়ে, তার বদলে বেরুল চাপা, হিংস্র গর্জন। ছুটে গিয়ে গ্রিফিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি। অমানুষিক শক্তি এডগারের গায়ে,

দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে লর্ড গ্রিফিনকে। বাঁধন থেকে ছাড়া পাবার জন্য শরীর মোচড়াচ্ছেন লর্ড। লড়তে লড়তে দু'জনে চলে গেল ব্রিজের কিনারে, তারপরেই তাল হারাল। রেলিং টপকে একসঙ্গে পড়ে গেল পানিতে। ব্রিজের উপর ছুটে গেল রানা আর ড্যানি, উঁকি দিল নিচে।

তলিয়ে গেছে যুদ্ধরত দুই ভাই, কী ঘটছে নিচে বোঝার উপায় নেই। একটু পর ভেসে উঠল দু'জনে, তখনও কেউ কাউকে ছাড়েনি। এমনিতে পারার কথা নয় গ্রিফিনের, কিন্তু গুলির আঘাতে মুমূর্ষু দশা এডগারের, তাই লড়াই হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে। এডগারকে তো নয়ই, লর্ডকেও আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না এখন—মাথার চুল ভিজে লেপ্টে রয়েছে খুলিতে, চোখে উন্মাদনা, সুদর্শন মুখটা বিকৃত হয়ে আছে প্রচণ্ড ক্রোধে।

প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে এডগার। পানি কালো হয়ে উঠছে তার ক্ষত থেকে বেরুনো রক্তে। ধীরে ধীরে আলোড়ন উঠছে ওখানে। রক্তের গন্ধ পেয়েছে খুনে ঈলেরা। আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে!

ধাক্কা দিয়ে লর্ডকে ঘুরে যেতে বাধ্য করল এডগার, পিছন থেকে পেঁচিয়ে ধরল গলা। বাতাসের অভাবে খাবি খেলেন তিনি, দু'জনে একসঙ্গে ডুবে গেলেন রাক্ষুসে ঈলের মাঝে। পরেরবার যখন ভেসে উঠলেন, ঈলেরা ধরে ফেলেছে তাঁকে। কিলবিল করছে লর্ডের মুখ ও শরীরের এখানে-সেখানে। কামড়ে ধরেছে উন্মুক্ত চামড়া, খুবলে নিতে চাইছে মাংস। চিৎকার করলেন লর্ড গ্রিফিন, থাবা দিয়ে ধরলেন একটা ঈল, টান দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। রক্ত বেরিয়ে এল কামড়ে ধরা জায়গাগুলো থেকে।

ড্যানিকে ঘুরিয়ে নিল রানা, চেপে ধরল বুকে। পিতার নৃশংস পরিণতি যেন দেখতে না হয় তাকে।

মৃত্যুপথযাত্রী এডগারের বাঁধন আলগা হয়ে এসেছে। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন লর্ড গ্রিফিন, পানিতে তলিয়ে গেল

ঈল-মানবের নিথর দেহ। পরক্ষণে ডুবে গেলেন লর্ডও। শেষবারের মত যখন ভাসলেন, তখন পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন জলচর ঘাতকদের কাছে। তাঁর পুরো শরীর পেঁচিয়ে ধরেছে হাজার হাজার ঈল, সরসর করে পিছলাচ্ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। রক্তমাংস নয়... মনে হলো তাঁর দেহটা পিচ্ছিল, জীবন্ত সরীসৃপ দিয়ে তৈরি এক কাঠামো। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, একটা হাত তুললেন উপরে, যেন কিছু আঁকড়ে ধরতে চান। পেলেন না কিছুই। হাত তোলা অবস্থাতেই স্থির হয়ে গেলেন। কেউ নেই যে সাহায্য করবে। ধীরে ধীরে তাঁকে পানির তলায় টেনে নিল ঘাতকেরা। প্রথমে দেহ, তারপর মাথা, সবশেষে উপরদিকে তোলা হাতটা অদৃশ্য হয়ে গেল লেকের বুকে। পানি তখন কালচে লাল হয়ে গেছে।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক থেকে। ড্যানিকে জড়িয়ে ধরে সরে এল ব্রিজের কিনার থেকে। হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। আশপাশে আর কেউ নেই। বিজ্ঞানী আর লর্ডের পোষা রক্ষীবাহিনী... বিপদ টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গেছে সবাই।

হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকাল রানা। বৃষ্টি থেমে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে সূর্য। অন্য দিনের তুলনায় যেন একটু বেশিই উজ্জ্বল। হঠাৎ করে সবকিছু বড় রঙিন লাগছে ওর। ভেজা প্রকৃতি যেন জলরঙে আঁকা কোনও ছবি।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনল ও। ওই তো, মার্টিনির পিঠে চেপে ছুটে আসছে পেনি। হাত নাড়তে চাইল মেয়েটার উদ্দেশে, কিন্তু পারল না। কেন যেন শক্তি পাচ্ছে না শরীরে। পা-দুটোর ওজন যেন দু'মণ, টানতে পারছে না আর। দপ দপ করছে মাথার ভিতরটা। এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল। ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের দৃষ্টি।

'রানা! রানা!!' কানের কাছে ড্যানির উদ্বিগ্ন ডাক শুনতে পেল

ও। সাড়া দিতে পারল না।

ক্লান্তি আর পরিশ্রমের কাছে অবশেষে হার মেনেছেমাসুদ রানার দেহ। জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও।

আটাশ

অচেনা এক সুর শুনে জেগে উঠছে রানা—ধীরে ধীরে। যেন অন্ধকার থেকে একটু একটু করে ফিরে আসছে আলোয়। মাঝখানে কতটা সময় বয়ে গেছে বলতে পারবে না। শরীরে আরামদায়ক অনুভূতি, পিঠের নিচে নরম তোষক, মাথার তলায় শিমুল তুলোর বালিশ। গায়ে সুতি চাদরের স্পর্শ। কানের কাছে বাজছে সেই অচেনা সুর।

না, সুর নয়। পাখির ডাক। চোখ মুদে পড়ে রইল রানা, উপভোগ করছে অচেনা পাখির গান। আস্তে আস্তে আরও শব্দ কানে এল ওর—বাতাসে গাছের পাতার সরসর, জানালার পর্দার পতপত, নদীর কুলকুল, আর দূর থেকে ভেসে আসা একটা কুকুরের ডাক।

গন্ধও পেল ও। খুব কাছ থেকে ভেসে আসছে ফুলের সুবাস। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে জুড়িয়ে যাচ্ছে দেহ-মন। আস্তে আস্তে চোখ মেলল ও। প্রথমেই চোখে পড়ল নাইটস্ট্যাণ্ডে রাখা ফুলদানিটা। অনেক ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওতে। জানালা খোলা, বাইরে হাসছে সকালের নরম রোদ। ফুপুর কটেজে, নিজের কামরার

বিছানায় শুয়ে আছে ও। পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু কীভাবে এল এখানে, কিচ্ছু মনে নেই।

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো রানা, সঙ্গে সঙ্গে বন বন করে ঘুরে উঠল মাথা, ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। এখনও খুব দুর্বল ও। তাড়াতাড়ি বালিশে মাথা ঠেকাল ফের। একটু পরেই পায়ের আওয়াজ শুনল। দরজা খুলে কামরায় ঢুকলেন ইসমাত ফুপু।

'রানা!' ওকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন তিনি। 'জেগে উঠেছ তুমি! কেমন লাগছে?'

'দুর্বল,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি এখানে এলাম কী করে? কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?'

'সবই বলব।' রানাকে উঠে বসতে সাহায্য করলেন ফুপু। হেডরেস্টের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসালেন, তারপর চট্ করে নিয়ে এলেন এক গ্লাস গরম দুধ। 'আগে এটা খাও। শক্তি ফিরুক।'

'কিন্তু...'

'কোনও কথা নয়। দুধ খাও। তুমি মরতে বসেছিলে, রানা। যমে-মানুষে টানাটানি গেছে গত কয়েকদিন।'

'কয়েকদিন!' অবাক হলো রানা। 'কী হয়েছিল?'

'জ্বর, ফুসফুসের ইনফেকশন, আরও হাজারটা কমপ্লিকেসি। তোমার শরীরে ড্রাগসও পাওয়া গেছে, রানা।'

'আ... আমি ড্রাগ নিইনি, ফুপু। বিশ্বাস করো।'

'জানি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ফুপু। 'সবই শুনেছি আমি। ও নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আগে দুধটুকু খেয়ে নাও।'

ঢক ঢক করে দুধের গ্লাস খালি করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'ক'দিন থেকে বিছানায় পড়ে আছি আমি?'

'দশ দিন। ইস্টারের উৎসব মিস করেছ তুমি।'

'দশ দিন!' চমকে উঠল রানা। এতগুলো দিন কেটে গেছে, ও কিছুই টের পায়নি। 'আমার তো ছুটি শেষ হয়ে গেছে। স্কুল...'

'ও নিয়ে ভেবো না,' ফুপু বললেন। 'অসুস্থতার কথা লিখে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। ক'দিন স্কুল মিস গেলে কিচ্ছু হবে না। সুস্থ হওয়াটা বেশি জরুরি।'

উঠে গিয়ে ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এলেন তিনি। রানার গালের ব্যাণ্ডেজ খুলে অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পরিষ্কার করলেন ক্ষতটা। লাগিয়ে দিলেন নতুন ব্যাণ্ডেজ।

'খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি,' বললেন তিনি। 'সেদিন তোমার বন্ধু রেড এসে জানাল, মহা বিপদে নাকি পড়েছ তুমি। পাগলের মত গাড়ি নিয়ে ছুটে গেলাম গ্রিফিন কাসলে। সেখানে গিয়ে দেখি নরক গুলজার। ধসে পড়েছে দুর্গ, আগুন জ্বলছে সবখানে। ছোটাছুটি করছে পুলিশ-দমকল, লর্ড গ্রিফিনকে খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। তোমাকে পেলাম অজ্ঞান অবস্থায়—পেনিলোপি ম্যাকিনটশ আর ড্যানি গ্রিফিন সেবা করছিল তোমার। অ্যাম্বুলেন্স ডাকার সময় ছিল না, গাড়িতে করেই তোমাকে নিয়ে এলাম কটেজে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিল তোমার, মনে হচ্ছিল কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছে তোমার শরীরের ভিতরে। ঘামছিলে ভীষণ। ডাক্তার ডাকলাম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি বললেন, অচেনা কোনও ড্রাগ-পয়জনিঙের শিকার হয়েছ তুমি। দেবার মত ওষুধ-পথ্য তেমন কিছু নেই, কপাল ভাল হলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ড্রাগটা শরীর থেকে বের হয়ে যাবে। নইলে...' একটু থামলেন ফুপু। 'ভাল কোনও হাসপাতালে নেয়া যায়নি তোমাকে, শরীরের ওই অবস্থায় জার্নি করলে পথেই কিছু ঘটে যেতে পারে বলে ভয় পাচ্ছিলেন ডাক্তার। শেষে শুধু জ্বর আর ফুসফুসের সংক্রমণের ওষুধ দিলেন। বাকিটা ছেড়ে দিতে হলো ভাগ্যের ওপর। পরের ক'টা দিন যে কীভাবে কেটেছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। রাত-দিন জ্বরে ছটফট করেছ তুমি, যখন-তখন খিঁচুনি উঠত, সামলানো যেত না। ডাক্তার তো ছিলেনই, তারপরেও রেড আর পেনিলোপি যদি রোজ

রোজ সাহায্য না করত, কিছুতেই একা পেরে উঠতাম না আমি। শেষ পর্যন্ত গতকাল জ্বর ছেড়েছে তোমার। প্রথমবারের মত শান্তিতে ঘুমিয়েছ পুরো একটা দিন। আল্লাহর অশেষ দয়া!'

ভেজা কাপড় দিয়ে রানার হাত-মুখ মুছে দিলেন ফুপু। ইতস্তত করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাগের ব্যাপারে কী জেনেছ তুমি?'

'সবই... মানে রেড আর পেনি যতটুকু জানে আর কী,' বললেন ফুপু। 'কাজটা ঠিক করোনি। ওভাবে ঝুঁকি নিতে গেলে... যদি লর্ড গ্রিফিনের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ হয়েই থাকে তো আমাদেরকে জানাতে পারতে।'

'অন্যায় হয়ে গেছে, না?'

একটু হাসলেন ফুপু। 'সে-কথা তো বলিনি। যা করেছ, সেটা ঠিকই আছে; কিন্তু যেভাবে করেছ, তাতেই আমার আপত্তি। ছোটদের এমন ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়। আরেকটু হলেই মারা যেতে পারতে। তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার? শরীর থেকে ড্রাগটাও পুরোপুরি দূর হয়েছে কি না কে জানে। ভবিষ্যতে এর প্রভাব থেকে যেতে পারে বলে ভয় হচ্ছে।'

'কী আর হবে?' হালকা গলায় বলল রানা। 'নাহয় সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বেশিই হবে আমার প্রাণশক্তি। ভাল সাঁতার কাটতে পারব; সহজে কাবু হব না... বিপদে পড়লে কাজে দেবে সেসব।'

'ফাজলামি হচ্ছে, না?' চোখ পাকালেন ফুপু। 'এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলার ভিতর আছ। পুলিশ এসেছিল, সুট-বুট পরা কয়েকজন লোকও তোমার খোঁজ নিয়েছে কয়েক বার, হাবভাবে সিক্রেট সার্ভিসের লোক মনে হয়েছে। অসুস্থতার কথা বলে তাড়িয়েছি ওদেরকে। এসবের মধ্যে জড়াবার প্রয়োজন নেই আর। কাউকে কিছু বলতে যেয়ো না। ড্যানিও বলেনি। ও শুধু বলেছে, দুর্গে যখন আগুন লাগল, তখন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে

তুমি... কীভাবে-কোত্থেকে লাগল আগুন, তার কিছুই জানা নেই ওর।'

'ড্যানির খবর কী? কোথায় ও?'

'পুলিশের জিম্মায় ছিল সপ্তাহখানেক। পরে আমেরিকা থেকে ওর মা এসে নিয়ে গেছে। তোমাকেও দেখতে এসেছিল। বলল, চিরতরে চলে যাচ্ছে; আর কোনোদিন ফিরবে না এই অভিশপ্ত এলাকায়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ড্যানির সঙ্গে দেখা হলে ভাল হতো, তাকে সামনাসামনি ধন্যবাদ জানানোউচিত ছিল।

দরজায় আওয়াজ হলো। কামরায় ঢুকল রেড আর পেনি। রেডের বগলের তলায় একটা ক্রাচ। রানাকে বসে থাকতে দেখে হাসি ফুটল ওদের মুখে।

'যাক, ঘুমকুমারের ঘুম ভেঙেছে,' বলল পেনি।

'তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমার দোস্ত একটা বাঘের বাচ্চা,' বড়াইয়ের সুরে বলল রেড। 'কিচ্ছু হবে না ওর। কেমন আছ তুমি, রানা?'

'ভাল লাগছে তোমাদের দেখে,' রানা বলল। 'থ্যাঙ্কস। শুনলাম অনেক সাহায্য করেছ ফুপুকে।'

'আরে দূর! তুমি যা করেছ, সে-তুলনায় কী-ই বা করতে পেরেছি? তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। এবার সত্যিকার ক্যাম্পিঙে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। আমাকে স্কুলে ফিরতে হবে।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো!' বিষণ্ন হয়ে গেল রেড।

'তোমার পায়ের কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'মাইনর ফ্র্যাকচার। সারতে সময় লাগবে না।'

'লর্ড গ্রিফিনের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল?'

'না,' বলল পেনি। 'তাকে অফিশিয়ালি নিখোঁজ ঘোষণা করা

হয়েছে। আমরাও কিছু বলতে যাইনি। মরে গেছে লোকটা। লাশটা উদ্ধার হলো কি হলো না, তাতে কিছু যায়-আসে না।'

'কিন্তু কিছু তো বলা দরকার,' রানা বলল। 'অন্তত লেকের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া দরকার সবাইকে। ভুল করে কেউ যদি পানিতে নামে...'

'আমার মনে হয় ওসব নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে,' রহস্যময় গলায় বলল পেনি। 'সরকারি লোকজন দখল নিয়েছে দুর্গ আর লেকের চারপাশের পুরো এলাকার। সম্ভবত পালিয়ে যাওয়া বিজ্ঞানীদের কাউকে ধরে জেনে নিয়েছে প্রজেক্ট সিলভারব্যাকের সমস্ত গোমর। দূর থেকে লেকে জাল ফেলতে দেখেছি আমি—ধরে নিয়ে যাচ্ছে সমস্ত রাক্ষুসে ঈল। যদি কিছু থেকেও যায়, বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে নির্ঘাত।'

'তারমানে সব ধামাচাপা পড়ে যাবে? এত বড় একটা ঘটনা?'

'সরকারি কাজের ধরনই এমন,' ফুপু বললেন। 'সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লুকানো হবে বড় বড় গোমর।'

'কিন্তু আমরা তো সব জানি। আমাদেরকে কীভাবে ঠেকাবে?'

'অনেক ধরনের কায়দা আছে, রানা। ভয়-ভীতি, গুম, খুন... তবে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। এরফান ওর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ম্যানেজ করে ফেলেছে। ওরা কথা দিয়েছে, বিরক্ত করা হবে না তোমাকে বা তোমার বন্ধুদেরকে... যদি তোমরা মুখ না খোলো।'

চাচার প্রসঙ্গ উঠতেই সচকিত হলো রানা। 'তাই তো! তোমরা সবাই এখানে... চাচা কোথায়? চাচাকে ডাকছ না কেন? আমি চাচার সঙ্গে কথা বলব।'

চোখের পলকে হাসিখুশি পরিবেশটা থমকে গেল। ফুপুর চেহারায় বিষাদের ছায়া নামতে দেখল রানা। রেড আর পেনিও চুপ হয়ে গেছে। যেন বুঝতে পারছে না কী বলবে।

'কথা বলছ না কেন, ফুপু?' বলল রানা। 'চাচা কোথায়?'

চোখে পানি টলটল করে উঠল ফুপুর। ধরা গলায় বললেন, 'ক্-কী বলব, রানা। তোমার চাচা... তোমার চাচা আর নেই। তিনদিন আগে মারা গেছে ও।'

'না!' বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে গেল রানা। 'কী করে... কী করে, ফুফু...'

'যতটা দেখেছ, তার চেয়ে ওর অবস্থা অনেক বেশি খারাপ ছিল, রানা। বুঝতে দেয়নি তোমাকে। ডাক্তার শেষকথা শুনিয়ে দিয়েছিল বহুদিন আগেই। এখানে ও আসলে এসেছিল শান্তিতে মরতে। তোমাকে শেষবার দেখতে চেয়েছিল, তাই ডেকে পাঠিয়েছিল ছুটিতে। আমাকে মানা করে দিয়েছিল কিছু বলতে। আমি সত্যিই দুঃখিত, রানা।'

'কেন আমাকে বললে না?' কেঁদে ফেলল রানা। 'আমি তা হলে কক্ষনো চাচাকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না। কাসল গ্রিফিনে তো নয়ই! ছায়ার মত সঙ্গ দিতাম ওঁকে।'

'সান্নিধ্যের চেয়েও বেশি কিছু দিয়েছ তুমি ওকে, রানা,' ওর মাথায় হাত বোলালেন ফুপু। 'তোমার কীর্তি দেখে গেছে ও, মারা গেছে বুকভরা গর্ব নিয়ে। আমাকে কী বলে গেছে, জানো? তোমার মত ভাতিজা পেয়ে ও সৌভাগ্যবান। ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছে, একদিন তুমি অনেক বড় হবে... মান রাখবে ওর। হয়ে উঠবে সত্য, সুন্দর আর ন্যায়ের প্রতীক। ধ্বংস করবে লর্ড গ্রিফিনের মতনরপিশাচগুলোকে। এরচেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে?'

কিছু বলতে পারল না রানা। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

উপসংহার

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কাহিনির শেষাংশ শুনছিল সোহানা আর রায়হান। ধ্যান ভাঙল কথা শেষ হয়ে যাওয়ায়। বিস্মিত চোখে দেখল ওরা, এতদিন পরেও চাচার স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় রানার চোখে পানি টলটল করছে। লুকাতে পারছে না নিজের আবেগ।

'সরি,' ওর হাতে হাত রেখে বলল সোহানা। 'তোমাকে ওসব করুণ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছি।'

'ইট্‌স ওকে,' জোর করে হাসল রানা। 'ক্ষমা চাইবার মত কিছু করোনি, বরং মনে করিয়ে দিয়েছ আমার শিকড়... আমার ভুলে যাওয়া অতীত। দরকার ছিল এই স্মৃতি রোমন্থনের।'

'কিন্তু তোমার বাবা-মাকে হারাবার ব্যথা, চাচাকে হারাবার ব্যথা যে জাগিয়ে তুললাম?'

'ফুপুকেও হারিয়েছি আমি, যদিও এ-ঘটনার বেশ অনেকদিন পর... তাই বলে কি তাঁর ব্যথা ঘুমিয়ে পড়েছে?' বলল রানা। 'শুধু আপনজন নয়, সোহানা, অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি আমি সারা জীবনে। কেউ স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে, কেউ দুর্ঘটনায়, কেউ বা আমার শত্রুদের হাতে... আমারই কারণে। তাদের সবার ব্যথাই জেগে আছে আমার হৃদয়ে, ভুলতে পারি না কখনও। বরং এই যে আজ তোমাদের কাছে নিজের অতীতের ছোট্ট একটা অংশ বলতে পারলাম, এটাই শান্তির পরশ বোলাচ্ছে মনে।'

'গল্পটা শেষ করুন, মাসুদ ভাই,' তাড়া দিল রায়হান। 'তারপর কী ঘটল?'

'তারপর?' ভ্রূকুটি করল রানা। 'তারপর তো বলবার মত কিছু নেই।'

'ড্যানি গ্রিফিনের কী হলো?'

'সে তো বলেইছি—মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। ওখানেই লেখাপড়া করে হাল ধরেছিল বাপের রেখে যাওয়া ব্যবসার। বেশ উন্নতিও করেছিল। ওর সঙ্গে আর কোনোদিন যোগাযোগ বা দেখা হয়নি আমার।'

'আর এঁরা? এঁরা কী করলেন?'

'সুস্থ হয়ে ইটনে ফিরে এলাম আমি। রেড চলে গেল লণ্ডনে, পেনি কিথলিতেই রয়ে গেল। প্রথম কিছুদিন চিঠি চালাচালি করেছি আমরা, ছুটিছাটায় লণ্ডনে বা কিথলিতে গেলে দেখাসাক্ষাৎও হয়েছেপরস্পরের সঙ্গে, কিন্তু আস্তে আস্তে কমে এল যোগাযোগ। দূরত্ব বাড়ল। একসময় যার যার জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, সেই থেকে আর দেখা হয়নি আমাদের কারও।'

'তারমানে এই নয় যে, আমরা ভুলে গেছি একে অপরকে, কিংবা বন্ধুত্ব টুটে গেছে আমাদের,' বলে উঠল রেড। 'আমার সত্যিকার দোস্ত একজনই—মাসুদ রানা।'

'আমি অবশ্য একমাত্র বলব না,' পেনি যোগ করল। 'তবে রানা যে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ও-ই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে কিথলির ছোট্ট গ্রাম থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য।'

'আর আপনি?' মিঙের দিকে ফিরল রায়হান। 'আপনি কিছু বলছেন না যে?'

'আমি অত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না,' বলল মিং। 'তা ছাড়া রানার সঙ্গে অতটা দূরত্বও সৃষ্টি হয়নি আমার। ওর ঘনিষ্ঠ

ছিলাম বলেই কিথলি থেকে ফিরে একমাত্র আমাকেই সব ঘটনা জানিয়েছিল ও। ওর সঙ্গে লণ্ডন আর কিথলিতে ছুটি কাটাতে গেছি আমি, পরিচিত হয়েছি রেড আর পেনির সঙ্গে। ইটনের শেষ দিন পর্যন্ত একসঙ্গে থেকেছি আমি আর রানা। কলেজে যাবার পরেও নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আমাদের। ইন ফ্যাক্ট, পড়াশোনা শেষে যখন আই.টি. ফার্ম খুললাম, রানা যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমাকে।'

'আচ্ছা বেরসিক মানুষ তো তুমি!' খোঁটা মারল রানা। 'এরা কতকিছু শুনবে বলে আশা করে বসে আছে, আর তুমি কিনা...'

'যা বলার তো বলেই দিয়েছি—ইটনে তোমার আর ড্যানি গ্রিফিনের টক্করের গল্প। এই আসরে তার বেশি কিছু বলা বোধহয় ঠিক হবে না। নাকি চাও তোমার আরও দু-একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শোনাই?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রানা। 'না, না! খবরদার!'

'আরও অ্যাডভেঞ্চার মানে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোহানা। 'এমন আরও কীর্তি আছে রানার ছোটবেলায়?'

মিটিমিটি হাসল মিং। 'থাকবে না? মানুষটা যখন মাসুদ রানা, আপনাদের কি ধারণা ওই একটা ঘটনা ছাড়া বাকি কৈশোর নিস্তরঙ্গ ছিল ওর?'

চোয়াল ঝুলে পড়েছে রায়হানের। 'বলছেন কী! ওসব কাহিনি শুনতে চাই আমরা। এক্ষুণি!'

রানার করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝি মায়া হলো মিঙের। বলল, 'না, থাক। ওগুলো ভবিষ্যতের কোনও অকেশনের জন্য তোলা রইল। তারপরেও... রানা যখন খোঁচা দিয়ে ফেলল, আজকের কাহিনির শেষটুকু আমিই বলে দিই। কেমন?'

কিথলি থেকে ফিরে আসার দিনদশেক পরের ঘটনা। বিকেল বেলা ইটনের মাঠে ফুটবল খেলে হাউসে ফিরছে রানা আর মিং।

জমজমাট খেলা হয়েছে সিনিয়র এক ক্লাসের সঙ্গে। রানা একাই দু'গোল দিয়ে জিতিয়েছে নিজের দলকে। সেটা নিয়েই আলোচনা করছিল দু'জনে, হঠাৎ পিছন থেকে রানার কাঁধে হাত রাখল কে যেন।

ঘুরল রানা। রাগী চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি গ্রিফিনের প্রাক্তন তিন সাগরেদ—ডেনিস, ন্যাট আর পারকার।

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে রানার জার্সির কলার মুঠো করে ধরল ডেনিস। বলল, 'কি, বাঙালির বাচ্চা, খুব মউজে আছ মনে হয়? দু'গোল দিয়ে নিজেকে মস্ত হিরো ভাবছ, না?'

'তাতে তোমার কোনও সমস্যা আছে, ডেনিস?' শান্ত গলায় বলল রানা।

'আছে,' দাঁতে দাঁত পিষল ডেনিস। 'অসম্মান করেছ তুমি আমাদের টিমের। অন্যায় করেছ আমাদের জালে গোল দিয়ে। এখন ক্ষমা চাইতে হবে তোমাকে।'

'কার কাছে ক্ষমা চাইব? তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ। ড্যানি চলে গেছে বলে ভেবো না তুমি বেঁচে গেছ। আমি এখন এ-স্কুলের রাজা। আমার চাকর হয়ে তোমাকে থাকতে হবে।'

রাগ হলো না রানার... কিছুই হলো না। বরং হাসি পেল। একে একে তাকাল তিন প্রতিপক্ষের দিকে। ওর চেয়ে বয়সে বড় সবাই, গায়ে-গতরেও। কিন্তু ভয় লাগছে না। সত্যিকার বিপদ মোকাবেলা করে এসেছে ও, মুখোমুখি হয়েছে প্রকৃত আতঙ্ক আর মৃত্যুর। সে-তুলনায় স্কুল-পড়ুয়া তিনজন বখাটে ছেলে কিছুই না। আর কোনোদিন এদেরকে বা আর কাউকে ভয় পাবে না ও।

ডেনিসের চোখে চোখ রাখল রানা। হুকুমের সুরে বলল, 'হাত সরাও।'

'কী?' থতমত খেয়ে গেল ডেনিস।

'হাত সরাতে বলেছি তোমাকে।' রানার কণ্ঠে মৃত্যুর

শীতলতা।

রানার চোখে কী যেন ফুটে উঠেছে, ভড়কে গেল ডেনিস। জার্সি ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল দু'পা। বুকের মধ্যে লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ড।

'আর যদি কোনোদিন আমার গায়ে হাত দিয়েছ,' বলল রানা, 'হাত ভেঙে দেব তোমাদের। বাড়াবাড়ি করলে উপড়ে নেব চোখ। ক্লিয়ার?'

ঢোক গিলল ডেনিস। 'হ্যাঁ। সরি, আমার ভুল হয়ে গেছে।'

ন্যাট আর পারকারও ভয় পেয়ে গেছে। ডেনিসের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ওরা। বুনো, খুনে দৃষ্টি দেখতে পেয়েছে ওরা রানার চোখে। বুঝতে পেরেছে, এই ছেলেকে ঘাঁটানো উচিত হবে না। হুমকিটা শুধু মুখে নয়, কাজেও পরিণত করবে ও।

ঘুরে গেল রানা। 'চলো, মিং।'

হাঁটতে শুরু করল ও।

ভবিষ্যতের পথে।

(শেষ)